সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যে বিচারব্যবস্থার উপাদান অনুসন্ধান

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাবিভাগের অধীনে

পিএইচ.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা-সন্দর্ভ

গবেষক – রূপা বিশ্বাস

নিবন্ধন ক্রম – A00SA1501118

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দেবদাস মণ্ডল

সংস্কৃতবিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃতবিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৪

Certified that the thesis entitled

‘সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যে বিচারব্যবস্থার উপাদান অনুসন্ধান’ Submitted by me, for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my own work carried out under the Supervision of **Dr. Debdas Mandal, Assistant Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University**, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

…….. ……..

Countersigned by
The Supervisor:
Dr. Debdas Mandal

Candidate:
Rupa Bswas

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণা নিবন্ধটি রচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেকের সহায়তা পেয়েছি। উপদেশ এবং মূল্যবান পরামর্শ লাভ করেছি অগণিত বিদ্বজ্জনের কাছ থেকে, তাঁদের প্রতি জ্ঞাপন করি আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। প্রথমেই বলতে হয় আমার এই গবেষণা কার্যের তত্ত্বাবধায়ক ড. দেবদাস মণ্ডল মহাশয়ের কথা। তাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতা ও নির্দেশনার ফলেই গবেষণাটি সুসম্পন্ন হয়েছে। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই ড. অশোক কুমার মাহাতো মহাশয়, ড. অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. শিউলি বসু মহাশয়াকে। গবেষণা সংক্রান্ত এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। এছাড়াও বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দ, অধ্যাপিকাগণকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রুতি মল্লিক ও নিমাই চন্দ্র সর্দার মহাশয়কে। যাঁরা আমাকে গবেষণার উপযোগী বিভিন্ন গ্রন্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছে। প্রমাণ জানাই আমার পিতা শ্রী কুমারেশ বিশ্বাস ও মাতা রিতা বিশ্বাসের প্রতি। তাদের উৎসাহ, সহযোগিতা ও প্রচেষ্টার কারণেই আমি গবেষণা করতে সক্ষম হয়েছি। চলার পথে যাঁর নিরন্তর সাহচর্য আমাকে অগ্রসর হতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে তিনি হলেন আমার স্বামী শ্রী দীপক গরাই। তার সহযোগিতাকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অসময়ে নানা প্রতিবন্ধকতায় যাদের শরণাপন্ন হয়েছি – আমার পরম বন্ধু সংযুক্তা সেনগুপ্ত ও হাসিনা, মল্লিকাদিদি, মনোরমাদিদি, মণিকাদিদি, ভাতৃসম হাবল ও বিমানের প্রতিও জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ধন্যবাদান্তে

রূপা বিশ্বাস

সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যে বিচারব্যবস্থার উপাদান অনুসন্ধান

বিষসূচী	পৃষ্ঠা
প্রাক্-কথন	i
শব্দসংকেত	I
ভূমিকা	**১-৭**
প্রথম অধ্যায়	
সংস্কৃত আখ্যান সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	**৮- ২৭**
১.আখ্যান কী ?	৮
২.উপাখ্যান কী ?	৮-৯
৩.বেদে আখ্যান প্রসঙ্গ	৯-১৩
৩.১.মন্ত্রভাগে উপলব্ধ আখ্যান	৯-১০
৩.২.ব্রাহ্মণভাগে প্রাসঙ্গিক আখ্যান	১০-১২
৩.৩.উপনিষদে প্রাপ্ত আখ্যান	১২-১৩
৪.রামায়ণে আখ্যান-উপাখ্যান	১৩- ১৪
৫.মহাভারতে আখ্যান প্রসঙ্গ	১৪-১৬
৬.পুরাণে আখ্যান সমূহ	১৬-১৮
৭.বৌদ্ধসাহিত্যে উপলব্ধ আখ্যান	১৮-১৯
৮. সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১৯-২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবহারমাতৃকা একটি সমীক্ষা ২৮-৬১

১.ব্যবহারের স্বরূপ নির্ণয় ২৯-৩০

২.ব্যবহারদর্শনের উদ্দেশ্য ও সময়কাল ৩০-৩১

৩.বিবাদপদের স্বরূপ ও প্রকার নিরূপণ ৩১-৩৫

৪.ব্যবহারদর্শনের নিমিত্ত রাজা ও তাঁর গুণাবলী ৩৫-৩৭

৫.ব্যবহারদর্শনে প্রাড্বিবাক ও তাঁর ভূমিকা ৩৭-৩৯

৬.বিচারদর্শনে সভ্যগণের ভূমিকা ও গুণাবলী ৩৯-৪২

৭.বিচারসভার স্বরূপ ও প্রকার ৪২-৪৭

৮.ব্যবহারদর্শন পদ্ধতি ৪৭-৫০

৯.ব্যবহারনির্ণয়ে প্রমাণপ্রসঙ্গ ৫১-৬১

৯.১.মনুষ্যপ্রমাণের স্বরূপ ও প্রকার ৫১-৫৭

৯.১.১.লিখিতপ্রমাণের স্বরূপ ৫২-৫৪

৯.১.২.ব্যবহারদর্শনে সাক্ষীপ্রমাণ প্রসঙ্গ ৫৪-৫৫

৯.১.৩.ব্যবহারনির্ণয়ে ভুক্তি প্রমাণের গুরুত্ব ৫৬-৫৭

৯.২.ব্যবহারদর্শনে দিব্যপ্রমাণসমূহ ৫৭-৬১

৯.২.১.অগ্নি-প্রমাণ ৫৮-৫৯

৯.২.২.জল-প্রমাণ ৫৯

৯.২.৩.বিষ-প্রমাণ ৫৯-৬০

৯.২.৪.কোশ-প্রমাণ ৬০

৯.২.৫.তুলা-প্রমাণ ৬০-৬১

তৃতীয় অধ্যায়

স্মৃতিসাহিত্য ও আখ্যানে বিচারপদ্ধতি ও বিচারক ৬২-১২০

১.আখ্যানে বিচারক ও সভ্যপ্রসঙ্গ ৬৪-৭০

২.অপরাধীর শারীরিক ও মানসিক বৈলক্ষণ—শাস্ত্রে ও সাহিত্যে ৭০-৭৪

৩.আখ্যানে উপলব্ধ বিচারপদ্ধতি ৭৪-৯৬

৩.১.চতুষ্পাদ ব্যবহারের স্বরূপ নিরূপণ বিচার ৭৬-৮১

৩.২.ভাষাপাদের স্বরূপ ও আখ্যানে তার বিচার ৮১-৮৮

৩.৩.উত্তরপাদের স্বরূপ বিচার ৮৯-৯৩

৩.৪.ক্রিয়াপাদের স্বরূপ বিচার ৯৩-৯৪

৩.৫.সাধ্যসিদ্ধিপাদের স্বরূপ বিচার ৯৪-৯৬

৪.আখ্যানে লেখ্যপ্রমাণ প্রসঙ্গ ৯৬-১০০

৫.সাক্ষী প্রমাণ ১০১-১১১

৬.ভুক্তি প্রমাণ ১১১-১১৬

৭.দিব্য প্রমাণ প্রসঙ্গ ১১৬-১১৮

৮.বিচারব্যবস্থায় শপথের গুরুত্ব ১১৮-১২০

চতুর্থ অধ্যায়

ধনমূলক ব্যবহারবিধি ও আখ্যানসাহিত্যে তার প্রয়োগ প্রসঙ্গ ১২১-১৬১

১.ঋণাদানের স্বরূপ ১২১-১২৮

১.১.আখ্যানে ঋণাদান ১২৩-১২৮

২.বিক্রীয়াসম্প্রদান ১২৮-১৩৩
২.১.সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে বিক্রীয়াসম্প্রদান প্রসঙ্গ ১৩০-১৩৩
৩.ক্রীতানুশয় ১৩৩-১৩৮
৩.১.আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে ক্রীতানুশয়ের দৃষ্টান্ত ১৩৫-১৩৮
৪.প্রণষ্টস্বামিকরিক্থ ও তার ব্যবহারবিধি ১৩৮-১৪২
৪.১.আখ্যানসাহিত্যে প্রণষ্টস্বামিকরিক্থ ১৩৯-১৪২
৫.স্মৃতিতে নিধির স্বরূপ ১৪২-১৪৬
৫.১.আখ্যানের আলোকে নিধি ১৪২-১৪৬
৬.স্মৃতিশাস্ত্রে স্বামিপালবিবাদবিধি ১৪৬-১৫১
৬.১.আখ্যানগুলিতে স্বামী ও পালকের বিবাদ প্রসঙ্গ ১৪৭-১৫১
৭.দত্তাপ্রদানিক বিধি ও নিষেধসমূহ ১৫১-১৫৬
৭.১.গল্পে গল্পে দত্ত-অদত্তের আলোচনা ১৫২-১৫৬
৮.একটি বিবাদপদরূপে নিক্ষেপ ১৫৬-১৬১
৮.১.আখ্যানে নিক্ষেপ প্রসঙ্গ ১৫৭-১৬১

পঞ্চম অধ্যায়

হিংসামূলক বিবাদপ্রসঙ্গ শাস্ত্র ও আখ্যানসাহিত্যে ১৬২-২৩৮
১.বাকপারুষ্য ১৬২-১৭৩
১.১.আখ্যানসাহিত্যে বাকপারুষ্য ১৬৯-১৭৩
২.দণ্ডপারুষ্য ১৭৩-২০০
২.১.আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে দণ্ডপারুষ্য ১৮১-২০০

৩.সাহস ২০১-২২০

৩.১.আখ্যানে সাহস অপরাধ ও তার শাস্তিবিধান প্রসঙ্গ ২০৮-২২০

৪.স্ত্রীসংগ্রহণ বিবাদবিধি ২২০-২২৮

৪.১.আখ্যানসাহিত্যে স্ত্রীসংগ্রহণ বিবাদ প্রসঙ্গ ২২১-২২৮

৫. একটি অপরাধরূপে স্তেয় ২২৯-২৩৮

৫.১ গল্পগুলিতে স্তেয় অপরাধের স্বরূপ ২২৯-২৩৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রকীর্ণ ব্যবহারবিধি ও আখ্যানসাহিত্যে প্রতিফলিত অপরাধ প্রবণতা ২৩৯-২৫৭

১.অতিথি সম্বন্ধিয় অপরাধ ২৪০-২৪৩

২.আখ্যানের আলোকে বিশ্বাসঘাতকতা ও মিত্রদ্রোহ ২৪৩-২৪৪

৩.পিতা-মাতা ও পরিবারের প্রতি কর্তব্য ও উপেক্ষাজনিত অপরাধ ২৪৪-২৪৮

৪.বেশ্যাদের অপরাধপ্রবণতা ২৪৮-২৫০

৫.আত্মহত্যা-মহাপাপ ২৫০-২৫২

৬.সাধু-সজ্জনদের দুরাচার ২৫২-২৫৩

৭.রাষ্ট্রদ্রোহ-অপরাধ প্রসঙ্গ ২৫৪

৮.একটি সামাজিক অপরাধরূপে দ্যূতাসক্তি ২৫৪-২৫৫

৯.নিরপরাধ স্ত্রীপরিত্যাগ ও অন্যায় আচরণ ২৫৫-২৫৭

উপসংহার ২৫৮-২৭১

গ্রন্থপঞ্জি ২৭২-২৭৮

প্রাক্-কথন

"সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে, তার জায়গায় অন্য শাসনতন্ত্র আসে, কিন্তু কারাগার ঠিক খাড়া থাকে। মানুষ যখন সমাজ গড়ে ছিল তখন কারাগারও গড়ে ছিল—যত দিন একটা আছে তত দিন অন্যটাও থাকবে।"

--শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *শরদিন্দু অমনিবাস*, পঞ্চম খণ্ড

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হল সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র। প্রাচীন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, সাহিত্যিক, শৈল্পিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতির সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে সংস্কৃত বাঙ্ময়ে। *রামায়ণ, মহাভারত* ও পুরাণে কিংবা ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, শূদ্রক, বিশাখদত্ত প্রমুখের রচনায় রাজা-রাজড়া ও তাঁদের শাসনব্যবস্থার পরিচয় মেলে। এছাড়াও প্রাচীন ভারতের ন্যায়ব্যবস্থা তথা বিচারব্যবস্থা সম্পর্কেও সম্যক্ ধারণা লাভ করা যায়। যেমন *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে ধনমিত্রের বৃত্তান্তটিতে একটি বিবাদে অন্তিম নির্ণয়ের জন্য রাজা দুষ্যন্তের কাছে তা পেশ করা হয়েছে। ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী রাজা বলেছেন ধনমিত্র নিঃসন্তান হলে তবেই তার মৃত্যু পরবর্তীতে, তার ধনসম্পদ রাজার হবে। গর্ভস্থ সন্তানও সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে।[১] মৃচ্ছকটিক প্রকরণটিতেও ন্যায়ব্যবস্থার একাধিক দৃশ্য চোখে পড়ে। সেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মনুর বিধানের অনুসরণ দেখা যায়। হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত চারুদত্ত ব্রাহ্মণ হওয়ায় তাকে প্রাণদণ্ড না দিয়ে দেশ নির্বাসনরূপ দণ্ড দেওয়া হয়েছে।[২] স্মৃতিশাস্ত্রেরও একটি বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে দণ্ডব্যবস্থা। স্মৃতিশাস্ত্রে সদাচারকে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকারী বলে স্বীকার করা হয়েছে। সদাচারের বিরোধী কার্যকে রোধ করাই রাজার সবচেয়ে মহান দায়িত্ব বলে বিবেচনা করা হয়েছে। রাজশাসনের অনিবার্য অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল

---

[১] *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*,৬

[২] অয়ং হি পাতকী বিপ্রো ন বধ্যো মনুরব্রীৎ। *মৃচ্ছকটিক*,৯.৩০

বিচারব্যবস্থা তথা দণ্ডব্যবস্থা। প্রজাদের মধ্যে সদাচার ও নৈতিকতা বজায় রাখায় ছিল প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। মনু বলেছেন, যে রাজার প্রতাপে রাজ্যে চোর, ব্যভিচারী, পরুষভাষী, সাহসকারী, দণ্ড দ্বারা প্রাণীহন্তা না থাকে সেই রাজা ইন্দ্রলোক লাভ করেন।[৩] ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় রাজার দ্বারা সদাচার স্থাপন করার ভাবনা সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বত্র প্রবলভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন সমাজ জীবনের প্রতিফলন দেখা যায় সংস্কৃত আখ্যান-উপাখ্যান গুলিতে। সেখানে গল্পের মাধ্যমে রাজনীতি, অর্থনীতির দুরহ তত্ত্বগুলি সহজবোধ্য করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গল্পগুলি নিখাদ চিত্ত বিনোদন কিংবা রাজকুমারদের শিক্ষাদানের জন্য রচিত হলেও সেখানে তৎকালীন ন্যায়ব্যবস্থার যে চিত্রটি মেলে তা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। ধর্মের বিরুদ্ধাচারীদেরকে সন্মার্গে চালিত করার তীব্র প্রচেষ্টা সংস্কৃত আখ্যানগ্রন্থ গুলিতে চোখে পড়ে। দণ্ডব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের শুদ্ধিকরণরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেখানে প্রশাসনের কর্তব্য হল প্রজাদের সদাচার পালন করানো এবং নৈতিক মূল্যের প্রতি প্রতিবদ্ধ রাখা। রাজার কর্তব্য হল যে ব্যক্তি নৈতিকতার বিরুদ্ধে কার্য করে এবং দুরাচারে প্রবৃত্ত হয় তাকে যথোচিত দণ্ড দেওয়া। তাকে দণ্ডিত করায় অন্যান্য ব্যক্তিরাও নৈতিক নিয়মের পালনে যত্নবান হয়। আখ্যানগুলিতে অপরাধ অনুসারে দণ্ডব্যবস্থাকে মৃদু বা কঠোর হতে দেখা যায়। সমাজের একপ্রকার চিকিৎসারূপে দণ্ডব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাতে রাজা বা বিচারককে চিকিৎসকের ন্যায় শুদ্ধ ও কল্যাণকারী হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মানুষ কিংবা মানবেতর প্রাণীদের নিয়ে রচিত গল্পগুলির বেশিরভাগ কাহিনীর মূলেই আছে কোনো না কোনো অপরাধমূলক কাজ – কখনো প্রত্যক্ষে, কখনো পরোক্ষে। আর তা দমনের জন্য দণ্ডের প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রজাপালনের পাশাপাশি দুষ্টের দণ্ডবিধানকেও রাজার অন্যতম কর্তব্য বলে

[৩] *মনুসংহিতা*,৮.৩৮৬

উল্লেখ করা হয়েছে। এই সকল গল্প-কাহিনির অন্দরে লুকিয়ে থাকা বিচারব্যবস্থা তথা দণ্ডব্যবস্থার স্বরূপটি তুলে ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

শব্দ সংকেত

অর্থ.=অর্থশাস্ত্র
আপ.য.প.=আপস্তম্ব যজ্ঞীয় পরিভাষা
আপ.শ্রৌ.সূ.=আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র
কথা.=কথাসরিৎসাগর
কাত্যা.=কাত্যায়নস্মৃতি
জাতক.=জাতককথা
থের.=থেরগাথা
দশ.=দশকুমারচরিত
নারদ.=নারদস্মৃতি
পদ্ম.সৃষ্টি.=পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিকাণ্ড
পঞ্চ.=পঞ্চতন্ত্র
পা.সূ.=পাণিনীয়সূত্র
পুরুষ.=পুরুষপরীক্ষা
ম.পু.=মৎসপুরাণ
মনু.=মনুসংহিতা
মনুভা.=মনুভাষ্য
মন্বর্থ.=মন্বর্থমুক্তবলী
মহা.=মহাভারত
মিতা.=মিতাক্ষরা
যাজ্ঞ.=যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা
রামা.=রামায়ণ
ব.শ.কো.=বঙ্গীয় শব্দকোষ
বি.ধ.সূ.=বিষ্ণুধর্মসূত্র
বিষ্ণু.=বিষ্ণুপুরাণ
বেতাল.=বেতালপঞ্চবিংশতি
বৃহ.=বৃহস্পতিস্মৃতি
বৃহদ্দে.=বৃহদ্দেবতা
শুক.=শুকসপ্ততিকথা
হিতো.=হিতোপদেশ
সা.দ.=সাহিত্যদর্পণ
সিংহাসন.=সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা
H.Dh.= History of *Dharmaśāstra*
H.I.L.= A History of Indian Literature
H.S.L. = A History of Sanskrit Literature
Pre.Hito. =Preface of *Hitopadeśa*
Sans.Dic. = Sanskrit English Dictionary

ভূমিকা

ভূমিকা

পৃথিবীর সর্বত্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে গল্প কাহিনির আকর্ষণ চিরন্তন কালের। রূপকথা ও গল্পের মায়াজালে মানুষের অতৃপ্ত বাসনা, অপূর্ণ ইচ্ছাশক্তি, অসাধ্য ক্ষমতা এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা সবই সার্থক হয়ে ওঠে। মানুষের মনে গল্প শোনার দুর্নিবার আকর্ষণ বিদ্যমান। মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তির দাবিতেই উদ্ভূত হয়েছে বিভিন্ন আখ্যান, উপাখ্যান, কথা, গল্প, গাথা, কাহিনির। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সাহিত্যেই লোকচিত্তহারী নানা আখ্যান-উপাখ্যান পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল রত্নভাণ্ডারে আখ্যান সাহিত্যের বিশেষ ভূমিকা বর্তমান। *বেদ-রামায়ণ-মহাভারত*-পুরাণে বিচিত্র কাহিনির সমাবেশ দেখা যায়। ভাস-ভবভূতি-কালিদাসাদি সাহিত্য সৃষ্টিকারগণের রচনাতেও বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যান পাওয়া যায়। কখনও কখনও একই আখ্যান ভিন্ন ভিন্ন রচনাকারের লেখনীস্পর্শে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিবেশিত হয়েছে। বর্ণনার নব নব ভঙ্গি, বৈচিত্র্য এবং মাধুর্য আখ্যানগুলিকে নিত্য নতুন রূপ দান করেছে। যেমন পুরুরবা-উর্বশীর আখ্যান *ঋগ্বেদে, শতপথব্রাহ্মণে, মহাভারতে,* পুরাণে আছে, আবার কালিদাসনাট্যেও রয়েছে। একই কাহিনি হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ বা বর্ণনার ভঙ্গিতে নতুনভাবে পরিবেশিত হয়েছে। চক্ষিঙ্ ধাতু থেকে আখ্যান শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। চক্ষিঙ্ ধাতুর খ্যান আদেশ হয় এবং সেখান থেকে 'খ্যা' রূপ আসে। 'খ্যা' ধাতুর অর্থ হল- কোনো কিছু বর্ণনা। উপাখ্যান শব্দটিরও উৎপত্তি একই ভাবে ঘটেছে। উভয়েরই অর্থ হল কোনো ঘটনার বর্ণনা। কোনো একটি ঘটনা বা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একাধিক ঘটনার বর্ণনাই হল আখ্যান এবং যা আখ্যানের অন্তর্গত এমন বৃত্তান্ত হল উপাখ্যান। *বিষ্ণুপুরাণের* তৃতীয় অংশে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঋষি পরাশরমুনি মৈত্রেয়ীর কাছে সামবেদের শাখা, আঠারোটি পুরাণ এবং চোদ্দটি বিদ্যার বিভাগের বর্ণনা করেছেন। সেখানেই আখ্যান এবং উপাখ্যানের উল্লেখ দেখা যায়। *মহাভারত*কে আখ্যান-উপাখ্যান-গাথার সমন্বয়ে রচিত বলে পুরাণসংহিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] সাধারণত, আখ্যান-উপাখ্যানের মধ্যে তেমন অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই। যে কোনো বর্ণনাত্মক বিবরণকেই আখ্যান বলা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে আখ্যান শব্দটির প্রয়োগ

[১] বিষ্ণু.৩.৬.১৬

থেকে এমন ধারণা হয়। *ঐতেরেয়ব্রাহ্মণে* শুনঃশেপপ্রসঙ্গে 'তদেতৎপর ঋক্-শতগাথাং শৌনঃশেপম্-আখ্যানম্' এরূপ বাক্যে আখ্যানের উল্লেখ আছে। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে সম্পূর্ণ রামের কাহিনিকে আখ্যান বলে অভিহিত করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশাল অংশজুড়ে আছে আখ্যানসাহিত্য। ভিন্ন স্বাদের একাধিক আখ্যানগুলিকে নিয়ে একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই সকল আখ্যানগুলি কখনো মানুষ কখনো মনুষ্যেতর প্রাণীদের আশ্রয় করে আবর্তিত হয়েছে। ড.গৌরীনাথ শাস্ত্রী এই আখ্যানগুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল – জনপ্রিয় কাহিনি, পশুপক্ষী সংক্রান্ত উপকথা ও রূপকথা। কীথ এই আখ্যানসাহিত্য বা উপকথাসাহিত্যকে দুটি ধারায় বিভক্ত করেছেন- Tale ও Fable। Tale-এর পাত্র-পাত্রী মানবসম্প্রদায়ভুক্ত হয় সুতরাং এটি মানবীয় আখ্যানসাহিত্য। Fable হল- মানবেতরধারার বা পশুপক্ষী তীর্যকপ্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কিত গল্পসমূহ।

সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যের উদ্ভবের পশ্চাতে তিনটি বিশেষ কারণ বা উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়ে থাকে- অবসর যাপন, নিছক চিত্তবিনোদন ও রাজকুমারদের শিক্ষাদান। রাজপুত্রদের সর্বতোভাবে অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে *পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশা*দি গ্রন্থগুলি রচিত হয়। কেবল রাজকুমারগণই নয় সর্বসাধারণ পাঠককুলের কাছেও এই সকল গ্রন্থগুলি শিক্ষালাভের অন্যতম মাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সকল আখ্যানগুলিতে অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতিশাস্ত্র, মানবধর্ম ইত্যাদির প্রতিফলন অনস্বীকার্য। মানবীয় সম্প্রদায়ভুক্ত পাত্রপাত্রী কিংবা মানবেতর সম্প্রদায়ভুক্ত পশুপক্ষী আদি প্রাণীদের নিয়ে সৃষ্ট সংস্কৃত আখ্যানগ্রন্থগুলির মধ্যে বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে *পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, বেতালপঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততিকথা, পুরুষপরীক্ষা, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা* এই গ্রন্থগুলিকে গবেষণার আকরগ্রন্থ হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়াও দণ্ডিরচিত *দশকুমারচরিত* গ্রন্থটিও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন আলংকারিকের রচনায়ও এই গ্রন্থটিতে আখ্যান গ্রন্থরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই আখ্যানসাহিত্য নিয়ে এতাবৎ যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাদের মধ্যে অবিস্মরণীয় হলেন P.Peterson; C.Lassen; J.Hertel; F.Edgerton; A.B.Keith; M.Wintertz প্রমুখ। *পঞ্চতন্ত্র* নিয়ে যাঁর গবেষণা সর্বজন প্রশংসিত তিনি হলে J.Hertel। তাঁর সম্পাদনায় *পঞ্চতন্ত্রের* অনবদ্য সমীক্ষাত্মক সংস্করণ – (Sanskrit Narative Literature and its Transmission)-এর (Vols-11-14) চারটি খণ্ডে *The Pañcatantra* নামে (1908-15) হাবার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ থেকে প্রকাশিত হয়। A.B.Keith মহাশয়, তাঁর *A History of Sanskrit Literature* (1928) গ্রন্থে The Didactic Fable শীর্ষক অধ্যায়ে নীতিমূলক গল্প হিসেবে *পঞ্চতন্ত্র* এবং *হিতোপদেশ, বেতালপঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততির* উল্লেখ করেছেন। উক্ত আলোচনায় বেদ-উপনিষদ-*মহাভারত* থেকে শুরু করে কিভাবে Fable এর উদ্ভব বিকাশ লাভ করে *পঞ্চতন্ত্র* বা *হিতোপদেশের* মতো রচনায় পরিণত হয়েছে তা একটা সুস্পষ্ট দিকদর্শন করা হয়েছে। কিথের মতে *হিতোপদেশ* হল *পঞ্চতন্ত্রের* বঙ্গীয় সংস্করণ।[২] *হিতোপদেশে পঞ্চতন্ত্র* ছাড়াও *কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র* ও *মহাভারতের* প্রভাবের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে *পঞ্চতন্ত্রের* সঙ্গে *অর্থশাস্ত্র* ও নীতিশাস্ত্রের সুগভীর সংযোগের ওপরেও আলোকপাত করা হয়েছে। M. Winternitz মহাশয় তাঁর *History of Indian Literature* (Vols.III.Part I, 1963) গ্রন্থে 'Narrative Literature' এর আলোচনায় Fable এর উদ্ভব ও বিশ্বব্যাপী *পঞ্চতন্ত্রের* বিস্তার প্রসঙ্গে T.Beanfey ও J.Hertel মহাশয়দের মতামতকেই সমর্থন জানিয়েছেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে *পঞ্চতন্ত্র* থেকে প্রাচীন ভারতের প্রশাসন পদ্ধতি এবং সার্বভৌম প্রশাসক হওয়ার জ্ঞান লাভ করা যায়।[৩] M.Winternitz মহাশয়ের মতে, *হিতোপদেশের* উৎস হল *পঞ্চতন্ত্র*। তিনি *হিতোপদেশের* সময়-কাল, বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ প্রভৃতির উপরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে এবং এটিকে একটি রাজনৈতিক বিষয়ক গ্রন্থ বলে বিবেচনা করেছেন। বিভিন্ন গল্পে কিভাবে *কামন্দকীয় নীতিসারে* নীতিসমূহ এবং *মহাভারতের* প্রভাব সংযুক্ত হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। *পঞ্চন্ত্র* বা *হিতোপদেশের* মতো *বেতালপঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততিকথাতেও* ধর্মশাস্ত্র-নীতিশাস্ত্র–কামশাস্ত্রের

[২] A.B.Keith,H.S.L., P.263

[৩] M.Winternitz H.I.L.,(Vol.III) P.339

উপাদান আছে বলে মনে করা হয়। P. Peterson মহাশয়ের *Hitopades´a*-এর সমীক্ষাত্মক সংস্করণ থেকে *হিতোপদেশের* রচয়িতা, রচনাকাল, উৎপত্তিস্থান এবং তাতে নীতিশাস্ত্রের প্রভাব সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য জানা যায়। *পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ* এবং *শুকসপ্ততিকথার* গল্পে মানবধর্মশাস্ত্র, চাণক্যনীতিশাস্ত্র এবং *মহাভারতের* উপাদান সমূহ যেভাবে অঙ্গীভূত হয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে L. Sternbach প্রণীত *Juridical Studies in Ancient Indian Law* (Part-II,1987) গ্রন্থে। উক্তগ্রন্থে মূলতঃ *পঞ্চতন্ত্র* ও *হিতোপদেশ* এই দুটি গল্পগ্রন্থের উপরে ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য গল্পগ্রন্থগুলিতে প্রাপ্ত অপরাধের নিদর্শন ও বিচারব্যবস্থার উপরে আলোকপাত করা হয়নি। তবে Sternbach মহাশয় তাঁর তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টিতে এই গ্রন্থদুটির আখ্যানগুলিকে আইনি ব্যবস্থার আঙ্গিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেছেন। বর্তমান গবেষণায় এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বিশেষ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, M.R.Kale এর *পঞ্চতন্ত্র* ও *হিতোপদেশের* টীকা, অধ্যাপক সত্যনারায়ণ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় *হিতোপদেশ ও তার প্রাসঙ্গিক আলোচনা,* ড.দেবদাস মণ্ডল মহাশয়ের *গল্পে গল্পে রাজনীতির হাতে খড়ি* ইত্যাদি গ্রন্থগুলি আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটিতে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় ড.পুরীপ্রিয়া কুণ্ডুর *চৌর্যসমীক্ষা* ও রোহিণী ধর্মপাল মহাশয়ার *অপরাধ ও অপরাধীর পুরোনতুন কাহিনী* এই দুটি পুস্তকের কথা। পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলিতে অধিকাংশ গবেষকগণ সাধারণভাবেই আখ্যানগুলিতে সমাজনীতি, রাজনীতি, নীতিশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ইত্যাদির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অধিকাংশ আলোচনা মূলতঃ *পঞ্চতন্ত্র* ও *হিতোপদেশ* এই গ্রন্থগুলিতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। তবে পুরীপ্রিয়া কুণ্ডুর *চৌর্যসমীক্ষা* গ্রন্থটিতে মূলতঃ *দশকুমারচরিত* ও *কথাসরিৎসাগরে* চৌর্যাপরাধের কথা আলোচনা করা হয়েছে তার দণ্ডব্যবস্থা কিংবা অন্যান্য অপরাধগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। রোহিণী ধর্মপাল মহাশয়া তাঁর পুস্তকটিতে পুরাণ, মহাকাব্য, বৌদ্ধকথার অপরাধ-বৃত্তি ও অপরাধমূলক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে কোথাও কোথাও বিভিন্ন আখ্যানের অপরাধের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেও আখ্যানগ্রন্থগুলি তাঁর আলোচনায় মুখ্যরূপে প্রতিভাত হয়নি। তবে গবেষণার বিষয় পর্যালোচনার ক্ষেত্রে উক্ত নিবন্ধ ও গ্রন্থগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

উল্লেখ্য, উক্তগ্রন্থগুলিতে স্বতন্ত্রভাবে বিচারব্যবস্থার উপাদান অনুসন্ধানে গবেষকগণ প্রবৃত্ত হয়নি। সেইদিক থেকে বর্তমান গবেষণাটিতে অভিনবত্বের দাবি রাখে। সংস্কৃত আখ্যানগুলিতে লুকিয়ে থাকা প্রাচীন ভারতে বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত তত্ত্ব অন্বেষণই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য। যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলি মাথায় রেখে বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভ প্রস্তুত হয়েছে সেগুলি হল-

১. আখ্যানগুলিতে প্রাপ্ত নানা প্রকার অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পিছনে কোন সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল – তা উপলব্ধি করা।

২. আখ্যানগুলির মাধ্যমে অপরাধীদের বিচারব্যবস্থা ও শাস্তিবিধান কেমন ছিল ?

৩. স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত বিচারব্যবস্থা-দণ্ডব্যবস্থার সাথে আখ্যান সাহিত্যে উপলব্ধ বিচারপদ্ধতি কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল ? সেবিষয়ে আলোকপাত করা।

৪. আখ্যানগুলিতে সংঘটিত জঘন্য অপরাধে অপরাধীদের কী স্মৃতিবিহিত দণ্ডপ্রদান হত না কী অভিনব পদ্ধতির উদ্ভব হয় - তা বিশ্লেষণ করা।

আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধটি ‘সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যে বিচারব্যবস্থার উপাদান অনুসন্ধান’ শীর্ষক হলেও সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল আখ্যান গ্রন্থসম্ভারকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। মূলতঃ *পঞ্চতন্ত্র*, *হিতোপদেশ*, *কথাসরিৎসাগর*, *পুরুষপরীক্ষা*, *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা*, *শুকসপ্ততিকথা* ও *দশকুমারচরিত* গ্রন্থগুলিকেই অবলম্বন করে গবেষণা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনায় *মনুসংহিতা*, *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*, *নারদস্মৃতি*, *বৃহস্পতিস্মৃতি*, *কাত্যায়নস্মৃতি* ও *বিষ্ণুধর্মসূত্রের* অনুসরণ করা হয়েছে। তবে *মনুসংহিতার মন্বর্থমুক্তাবলী* টীকা, মেথাতিথির *মনুভাষ্য* এবং *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার* প্রসিদ্ধ টীকা *মিতাক্ষরা* প্রভৃতিও আলোচনার প্রয়োজন অনুসারে গবেষণায় অঙ্গীভূত করা হয়েছে। স্মৃতিতে নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট দণ্ডব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অপরাধের মাত্রা ও প্রকার অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে, সাপ যেমন খোলসমুক্ত হয় তেমনি পাপ করে অনুতাপ করলে একই ভাবে পাপীও পাপমুক্ত হয়। পাপকারীর মন অনুতপ্ত হৃদয়ে যে পরিমাণে নিজ দুষ্কৃত আচরণের নিন্দা করতে

থাকে, তার মন সেই পরিমাণে মুক্তি পেতে থাকে।[৪] আখ্যানগুলিতে অন্যায় আচরণকে অপরাধ বলার পাশাপাশি কখনো কখনো পাপ বলেও সম্বোধিত করা হয়েছে, পারলৌকিক জগতে দণ্ড পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে অপরাধের দণ্ডব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনায় স্মৃতিশাস্ত্রে ঐ অপরাধের জন্য বিহিত দণ্ড কি ছিল কেবল সেটিকেই আলোচনার অঙ্গীভূত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট অপরাধটির জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাটিকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটি বোধসৌকর্যার্থে সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায় হল **সংস্কৃত আখ্যান সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ**। এই অধ্যায়ে বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে *রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ,* বৌদ্ধসাহিত্যের বিভিন্ন আখ্যানগ্রন্থগুলির উল্লেখপূর্বক সংস্কৃত আখ্যান সাহিত্যের ক্রমবিকাশ পর্বটি তুলে ধরা হয়েছে। নির্বাচিত আখ্যান গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে সেখানে উপস্থিত অপরাধ সম্পর্কিত কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি হল **স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবহারমাতৃকা একটি সমীক্ষা**। এই অধ্যায়ে নির্বাচিত স্মৃতিগ্রন্থগুলিকে ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে একটি আলোচনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়টি হল **স্মৃতিসাহিত্য ও আখ্যানে বিচারপদ্ধতি ও বিচারক**। আলোচ্য অধ্যায়টিতে আখ্যানে বিচারের যে পদ্ধতি দেখা যায়, বিচারক তথা বিচার সভায় উপস্থিত সভ্যগণের গুণাবলী, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রমাণাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও অপরাধী সনাক্তকরণের উপায়সমূহ, ন্যায়ালয়ের প্রকারভেদ, স্বরূপ ইত্যাদি সম্পর্কে গল্পের মাধ্যমে যে তথ্যাবলী পাওয়া যায় সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়টি হল **ধনমূলক ব্যবহারবিধি ও আখ্যানসাহিত্যে তার প্রয়োগ প্রসঙ্গ**। আলোচ্য অধ্যায়টিতে ধনমূলক বিবাদপদ যেমন ঋণাদান, বিক্রীয়াসম্প্রদান, ক্রীতানুশয়, প্রণষ্টস্বামিকরিক্থ (হারিয়ে যাওয়া ধনপ্রসঙ্গ), নিধি, স্বামিপালবিবাদ, দত্তাপ্রদানিক, নিক্ষেপ –

[৪] মনু.,১১.২২৯-২৩১

এগুলির আখ্যানে যে দৃষ্টান্ত রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আখ্যানে উক্ত বিবাদপদগুলির যে দৃষ্টান্তগুলি মেলে তার দ্বারা এই সকল বিবাদপদ সম্পর্কিত বিবাদে দণ্ডবিধি সম্পর্কেও জানা যায়। আলোচ্য অধ্যায়টিতে সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি স্মৃতিতে এই সকল বিবাদপদগুলির যে দণ্ডবিধি পাওয়া যায় তার সাথে একটি তুলনাত্মক আলোচনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়টি হল **হিংসামূলক বিবাদপ্রসঙ্গ শাস্ত্র ও আখ্যানসাহিত্যে**। অধ্যায়টিতে হিংসামূলক বিবাদপদ সাহস, বাকপারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, স্তেয়, স্ত্রীসংগ্রহণ এগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সকল বিবাদপদের দৃষ্টান্ত আখ্যানগুলিতে অধিক মাত্রায় দেখা যায় বলে অধ্যায়টি কলেবরে বৃহৎ হয়েছে। এই সকল বিষয় নিয়ে গল্পগুলিতে যে বিবাদগুলি সংঘটিত হয়েছে তার বিবাদ নিরসন বিধি কিরূপ ছিল, কিরূপ দণ্ড প্রণয়ন করা হয়েছে এবং স্মৃতিবিহিত দণ্ডবিধি কিরূপ ছিল তা উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়টি হল **প্রকীর্ণ ব্যবহারবিধি ও আখ্যানসাহিত্যে প্রতিফলিত অপরাধ প্রবণতা**। নির্দিষ্ট বিবাদপদের বাইরেও আখ্যানগুলিতে এমন কতগুলি ঘৃণ্য অপরাধের দৃষ্টান্ত মেলে যেগুলি আলোচনা করা আবশ্যক, আলোচ্য অধ্যায়টিতে সেই সকল অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে। এই সকল অপরাধের সামাজিক পটভূমি ও তার সম্ভাব্য শাস্তিসম্পর্কে আখ্যানগুলিতে কি বলা হয়েছে তাও আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

সংস্কৃত আখ্যান সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রথম অধ্যায়

সংস্কৃত আখ্যান সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

১.আখ্যান কী ?

ব্যুৎপত্তি অনুসারে আ-পূর্বক খ্যা-ধাতুর উত্তর ল্যুট্ (অন্) প্রত্যয় করে আখ্যান শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। অতএব আখ্যান বলতে সাধারণভাবে কোনো একটি ঘটনার কিংবা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একাধিক ঘটনার বর্ণনাকেই বোঝানো হয়। অভিধানে অবশ্য শব্দটির নির্দিষ্ট কতগুলি অর্থ বিহিত হয়েছে। আখ্যান শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল কথন, ভাষণ, বিজ্ঞাপন এবং কোনো ঘটনার ভাবার্থ করে তার সক্ষেপ বর্ণন।[১] *সাহিত্যদর্পণ*কার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে, পূর্বসংঘটিত বিষয়ের উক্তি বা বর্ণনই হল আখ্যান।[২]

২.উপাখ্যান কী ?

আখ্যান সম্পর্কিত আলোচনায় অপর যে শব্দটি অনন্তরই আসে তা হল উপাখ্যান। উপ-পূর্বক আ-পূর্বক খ্যা-ধাতুর উত্তর অন্-প্রত্যয় করে উপাখ্যান শব্দটি গঠিত হয়েছে। দুটি শব্দই খ্যা-ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ কিছু বর্ণনা বা বলা। উপ-এই উপসর্গটির অর্থ হল গৌণ বা অপ্রধান বা ক্ষুদ্র। অর্থাৎ যা আখ্যানের অন্তর্গত, প্রাসঙ্গিক এমন বৃত্তান্তই উপাখ্যান। অভিধানে এটিকে ক্লীবলিঙ্গবাচী শব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ পূর্ববৃত্ত কথন, পরম্পরাশ্রুত বিষয়ের কথন।[৩] সাধারণতঃ আখ্যান ও উপাখ্যানের তেমন কোনো বিষয়গত পার্থক্য দেখা যায় না। উভয় শব্দই যে কোনো কাহিনি, পূর্ববৃত্ত কথন এই অর্থেই প্রযুক্ত হয়। তবে, আচার্য শ্রীধর স্বামী তাঁর ভাষ্যে আখ্যান ও উপাখ্যানের দুটি ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ করা হয়েছে। সেখানে স্বয়ং

---

[১] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব.শ.কো.,পৃ.২৩৯

[২] আখ্যানং পূর্ববৃত্তোক্তিঃ। সা.দ.৬.২১১

[৩] ব.শ.কো.,পৃ.৪৩৭

দৃষ্ট বিষয়ের কথনকে আখ্যান বলা হয়েছে।[৪] এবং শ্রুত বিষয়ের কথন বা বর্ণনা হল উপাখ্যান- এরূপ বলা হয়েছে।[৫]

চিত্ত বিনোদনের জন্য গল্প শোনার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই আখ্যান, উপাখ্যান, বিভিন্ন কথা-গাথা ও গল্পসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষণগতভাবে শাস্ত্রকারগণ দ্বারা আখ্যান ও উপাখ্যানের নানাবিধ স্বরূপ প্রদত্ত হলেও, মূল কাহিনির বিশাল মহীরূহের নীচে বেড়ে ওঠা প্রাসঙ্গিক ছোট-ছোট গল্প বা কাহিনি, যা সুবিশাল আখ্যানটিকে পরিপূর্ণ করে তাই হল উপাখ্যান।

সংস্কৃত বাঙ্ময়ের সকলক্ষেত্রেই আখ্যান ও উপাখ্যানের পদচারণা দেখা যায়। কোথাও ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের একাধিক আখ্যান নিয়ে একটি গ্রন্থ গঠিত হয়েছে আবার কোথাও একটি আখ্যানের মধ্যে একাধিক ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে আখ্যান ও উপাখ্যানের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল-

৩.বেদে আখ্যান প্রসঙ্গ

৩.১.মন্ত্রভাগে উপলব্ধ আখ্যান

সংস্কৃত সাহিত্যের আদি নিদর্শন হল বেদ। বিষয়বস্তুগত দিক দিয়ে বেদকে দুইভাগে ভাগ করা হয়- মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক শব্দ রাশিকেই বেদ বলেছেন।[৬] *বেদের* মন্ত্রভাগটিতে মূলতঃ দেবতাদের মহিমা কীর্তন ও নিজ অভীষ্ট পূরণের জন্য প্রার্থনা- এরূপ বিষয়ই সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে *ঋগ্বেদসংহিতায়* এমন কিছু কিছু সূক্ত রয়েছে যেগুলি সে যুগের ধর্মীয় আবহাওয়ার মধ্যে কিছুটা অসাধারণত্বের দাবী করতে পারে। প্রথমতঃ, এগুলি দেবতাদের স্তুতিমূলক নয়। দ্বিতীয়তঃ, এগুলির রচনা ভঙ্গিও অন্যান্য সূক্তের তুলনায় ভিন্ন। *ঋক্-সংহিতায়* প্রাপ্ত পরস্পর কথপোকথনের আকারে রচিত এই মন্ত্রসমষ্টিগুলি সংবাদসূক্ত নামে

---

[৪] বিষ্ণু.পু.উদ্ধৃত.ব.শ.কো.,পৃ.২৩৯

[৫] তদেব, পৃ.৪৩৭

[৬] মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্। আপ.যজ্ঞ.,১.৩৪

প্রসিদ্ধ। যেমন- পুরূরবা-উর্বশী (১০.৯৫), যম-যমী (১০.১০), বিশ্বামিত্র-নদী (৩.৩৩), ইন্দ্র-অগস্ত্য সংলাপ (১.১৭০), অগস্ত্য-লোপামুদ্রা সংবাদ (১.১৭৯), সরমা-পণি (১০.১০৮), ইন্দ্র-বৃষাকপি (১০.৮৬), ইন্দ্র-মরুতের সংলাপ (১০.৬৫) প্রভৃতি। পরস্পর কথপোকথনের দ্বারা এই সূক্তগুলিতে এক-একটি গল্পকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই সংবাদ সূক্তগুলির স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণের একাধিক ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। তাদের মধ্যে কেউ এগুলির সাথে মহাকাব্যের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন আবার কেউ এগুলিকে নাটকের আদি উৎসরূপে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গ এই সংবাদসূক্তগুলিকে আখ্যানসূক্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, এগুলি গাথা জাতীয় রচনার আদি নিদর্শন। এগুলি গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছিল। কথপোকথন অংশটি রচিত হয়েছিল পদ্যাকারে আর গদ্যে রচিত বর্ণনার দ্বারা তাদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষিত হত। কিন্তু পরবর্তীকালে কেবল পদ্যের সংরক্ষণ হয়েছে, গদ্যাংশ লুপ্ত হয়ে গেছে। ওল্ডেনবার্গের এই মত অবশ্য সকল পণ্ডিতগণ কর্তৃক গৃহীত হয়নি। জার্মান পণ্ডিত মাক্সমুলার, ফরাসি পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি এই সূক্তগুলিকে নাটকের লক্ষণাক্রান্ত বলেছেন। হার্টেল, ম্যাক্ডোনেল প্রমুখ জনৈক পণ্ডিতগণও এই মতেরই সমর্থক। অধ্যাপক ভিন্টারনিৎস অবশ্য ওল্ডেনবার্গের মতকে আংশিক সমর্থন করেছেন। তিনি এই সংবাদসূক্তগুলিকে গাথা জাতীয় রচনা বলে মেনেছেন এবং এই গাথা জাতীয় রচনাগুলিকে মহাকাব্য ও নাটক উভয় প্রকার সাহিত্যকীর্তির উৎস বলে চিহ্নিত করেছেন কারণ এগুলির মধ্যে বর্ণনাত্মক ও নাটকীয় উভয় প্রকারের রচনাভঙ্গিই পরিলক্ষিত হয়।[৭]

৩.২.ব্রাহ্মণভাগে প্রাসঙ্গিক আখ্যান

মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক *বেদের* মন্ত্রব্যতিরিক্ত অপর অংশটি হল ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মন্-শব্দের উত্তর অন্-প্রত্যয় করে ব্রাহ্মণ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সংহিতা অংশে বিভিন্ন ঋষি দৃষ্ট মন্ত্রগুলিতে বহু কাহিনির বীজ সুপ্তভাবে ছিল। ব্রাহ্মণভাগে সেই সকল কাহিনির অনেকগুলিই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণসাহিত্যের বিষয় হল মন্ত্রের প্রয়োগ পদ্ধতি, তার বিষয়গত ব্যাখ্যা। যজ্ঞ তথা

[৭] This ancient ballad poetry is the source both of the epic and of the drama for these ballads consist of a narrative and of a dramatic element. M.Winternitz H.I.L.Vol.I, part I.P.90.

যাগের যাবতীয় ক্রিয়া পদ্ধতিও এখানে বর্ণিত হয়েছে। আপস্তম্ব ব্রাহ্মণের লক্ষণ করেছেন – 'কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি'।[৮] অর্থাৎ যেখানে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের চোদনা বা উপদেশ বা নির্দেশ পাওয়া যায় তা হল ব্রাহ্মণ। কর্মচোদনা পদটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি ব্রাহ্মণসাহিত্যের ছয়টি ভাগ উল্লেখ করেছেন – ১.বিধি, ২.অর্থবাদ, ৩.নিন্দা, ৪.প্রশংসা, ৫.পুরাকল্প, ৬.পরকৃতি এই ছয়টি বিষয়ের দ্বারা ব্রাহ্মণসাহিত্যের সামগ্রিক বিষয়টি বিবৃত হয়। বিধি অংশের দ্বারা বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ফললাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় কর্মানুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থবাদ অংশে মন্ত্রের অর্থ ও উদ্দেশ্য, ইতিহাস, আখ্যান-উপাখ্যান ও পুরাণের অবতারণা, দেবদেবীদের কাহিনি ও বীরপুরুষগণের কীর্তিসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এই অর্থবাদ অংশেই আখ্যান ও উপাখ্যানের স্বরূপ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন কাহিনিমূলক দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে বেদোক্ত বিধি সম্পাদন করানোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিই এর উদ্দেশ্য। যজ্ঞ বিরোধী মতের সমালোচনা ও তাদের যুক্তি খণ্ডন ও তা পরিহার হল নিন্দা, স্তুতির দ্বারা বেদবিহিত কর্মের অনুমোদন হল প্রশংসা। পুরাকালে দেবগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞের বৃত্তান্ত বা বিবরণ রয়েছে পুরাকল্প অংশে। পরের কৃতি বা কার্যকে বলা হয় পরকৃতি। পরকৃতিতে মূলতঃ বিশিষ্ট যাজ্ঞিক ঋত্বিকগণের, মহান নৃপতিগণের বিশিষ্ট কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণভাগের পুরাকল্প ও পরকৃতি অংশে বিভিন্ন রাজাদের নানান কাহিনি আখ্যান-উপাখ্যানাকারে বর্ণিত হয়েছে। যেমন *ঋগ্বেদের* ঐতরেয় ব্রাহ্মণের হরিশ্চন্দ্র, রহিতাশ্বকাহিনি (৩৩ অধ্যায়),শুনঃশেপ আখ্যান (৩.৩৩), কবষ-ঐলুষেরর উপাখ্যান (২.৪.১), নাভানেদিষ্ট মানবের উপাখ্যান (৫.২২.৯), পশুসম্বন্ধীয় উপাখ্যান (২.৬.৮) ইত্যাদি। অনুরূপভাবে *শুক্লযজুর্বেদের* শতপথ ব্রাহ্মণের মনুমৎসকথা (১.৮.১), ইন্দ্র-বিশ্বরূপ উপাখ্যান (২.৬.৩), শ্রম-তপ-শ্রদ্ধা বিষয়ক আখ্যান (১৪.১.১.১), সুপর্ণী-কদ্রুকাহিনি (২.৬.২), বাক্ ও মনের কাহিনি (৩.২.১), গন্ধর্ব কাহিনি (৩.২.৪), চ্যবনকাহিনি (৪.১৫) ইত্যাদি। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের সত্যকাম-জাবালের কাহিনি (৪.৪-৯), শ্বেতকেতু-প্রাবাহন কাহিনি (৫.৩), নারদ-সনৎকুমারের কাহিনি (সপ্তম অধ্যায়) ইত্যাদি একাধিক অসাধারণ উপাখ্যান। *কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে* রয়েছে ইন্দ্র-ভরদ্বাজের

[৮] আপ.শ্রৌত.২৪.১.৩২

উপাখ্যান (৩.১০), নচিকেতার কাহিনি (৩.১১)। এরকম বহু উপাখ্যান বৈদিকসাহিত্যে রয়েছে যা এই সাহিত্যকে আর বেশি সমৃদ্ধ করেছে।

৩.৩.উপনিষদে প্রাপ্ত আখ্যান

বেদের অন্তিমভাগ হল উপনিষদ। উপ-নি-পূর্বক সদ্-ধাতুর উত্তর ক্বিপ্-প্রত্যয় করে উপনিষদ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হল যা সত্বর, নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে নিয়ে যায় বা যে বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তন্নিষ্ঠ হয়ে নিঃসংশয়ে তার অনুশীলন করলে উক্তবিদ্যা অবিদ্যাদি সংসার বন্ধনকে শিথিল করে ও নিঃশেষে বিনাশ করে। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত ধর্ম-কর্ম রয়েছে, তার সবটাই আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন উপনিষদে। প্রতিটি *বেদের* সাথে যুক্ত একাধিক উপনিষদ রয়েছে। এই উপনিষদ সমূহের প্রতিপাদ্য বিষয় হল ব্রহ্মবিদ্যা। উপনিষদের ভাবনায় আলো-অন্ধকার, ক্ষুদ্র-বৃহত্তমের সংজ্ঞা, উচিত-অনুচিতের সীমানা নির্দিষ্ট হয়েছে এবং নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টের দিকে উত্তরণের মার্গ নির্দেশ করা হয়েছে। তাই-তো এখানে দেখতে পাওয়া যায় নানা সুন্দর উপমা, গল্প, আখ্যান-উপাখ্যান-যা পথভ্রষ্ট কোনো মানুষকে সঠিক আলো দেখাতে সক্ষম। যেমন *কঠোপনিষদে* যম-নচিকেতা উপাখ্যান, *কেনোপনিষদের* উমা-হৈমবতী উপাখ্যান। এছাড়াও *বৃহদারণ্যকোপনিষদের* জনক-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ (৩.১.১-১০), যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ (২.৪.১-১৪), বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদ (২.১.১-২০), দম-দান-দয়া সম্বন্ধীয় আখ্যান (৫.২.১-৩), *ছান্দোগ্যোপনিষদের* জানশ্রুতি ও রৈক্কের আখ্যান (৪.১-৩), শ্বেতকেতু-প্রবাহণ সংবাদ (৫.৩-১০), সত্যকাম-জাবালের আখ্যান (৪.৪-৯) ইত্যাদি একগুচ্ছ উপাখ্যান পাওয়া যায়।

এই আখ্যান উপাখ্যানগুলি কোথাও অতি সংক্ষিপ্ত, কোথাও কিছু বিস্তৃত, কোথাও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন যেমন বৈদিক কর্মের প্রতি- যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য বর্ণিত হলেও, এই আখ্যানগুলিকে তৎকালীন সামাজিক-ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি-অনুশাসন, শিক্ষা, নারীর সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির দর্পণ বলা চলে। শুধু তাই নয়, সমাজগঠনেও এগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ এই আখ্যানগুলিতে মানবমনের প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার আদর্শপন্থা

অনুসরণের শিক্ষা প্রদত্ত হয়েছে। ফলে শরীর ও মনের সুস্থতা বজায় ছিল এবং মানবচিত্তের সঙ্গে সঙ্গে সমাজচিত্রও ছিল সৎ, নিষ্কলুষ, জনকল্যাণীমূলক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য *বৃহদ্দেবতা*কার শৌণক বর্ণনা শৈলীর ভিত্তিতে মন্ত্রের যে বিভিন্ন বিভাগ করেছেন তা হল – স্তুতি, নিন্দা, প্রশংসা, উপদেশ, বিলাপ ইত্যাদি। তাদের মধ্যে পুরুরবা-উর্বশী (১০.৯৫)-কে আখ্যান বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল তাই নয় একে পবিত্রাখ্যানও বলা হয়েছে।[৯]

৪.রামায়ণে আখ্যান-উপাখ্যান

সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যে আদি কাব্য হল আদিকবি বাল্মীকি রচিত *রামায়ণ*। কিংবদন্তী অনুসারে বাল্মীকি ব্রহ্মার নির্দেশে রাম কথা অবলম্বনে রামায়ণ রচনা করেন। একদা তমসা নদী তীরে কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে জনৈক ব্যাধ তীরবিদ্ধ করে। এই শোণিতাক্ত নিহত ক্রৌঞ্চকে ঘিরে করুণ স্বরে রোদন করতে থাকে ক্রৌঞ্চী। মহর্ষি বাল্মীকি রোরুদ্যমানা ক্রৌঞ্চীর শোকে অভিভূত হয়ে ব্যাধকে লক্ষ করে শ্লোক ছন্দে বলেছিলেন-

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।[১০]

মহর্ষির হৃদয় বিদীর্ণ উদ্বেলিত শোক থেকেই এর জন্ম বলে অদ্যাবধি ইহা শ্লোক নামে পরিচিত (শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ- বালকাণ্ড,২.৪০), অতঃপর এই শ্লোকছন্দেই রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের পূণ্য জীবনচরিত রচনা করেন। রাম-অয়ন অর্থাৎ রামচরিত বা রামসম্পর্কিত কাহিনিই যে এই মহাকাব্যের মূল উপজীব্য বিষয় তা ইহার নামকরণ দ্বারাই কবি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

---

[৯] নিয়োগশ্চানুযোগশ্চ শ্লাঘাবিলোপিতং চ যৎ।

আচিখ্যাসাথ সংলাপঃ পবিত্যাখ্যানমেব চ।। বৃহদ্দে.,১.৩৬

[১০] বালকাণ্ড,২.১৫

তবে, মূলকাহিনির অন্তরালে রয়েছে একাধিক চিত্তাকর্ষক মনোজ্ঞ আখ্যান-উপাখ্যান। যেমন- ক্রৌঞ্চমিথুনের আখ্যান (বালকাণ্ড-২ সর্গ), ঋষ্যশৃঙ্গ আখ্যান (বালকাণ্ড-১০-২৫ সর্গ), তাড়কাখ্যান (বালকাণ্ড-২৪-২৫ সর্গ), গঙ্গাবতারণাখ্যান (বালকণ্ড-৩৫-৪৪ সর্গ), কার্তিকেয়াখ্যান (বালকাণ্ড-৩৬ সর্গ), অহল্যাখ্যান (বালকাণ্ড-৪৯ সর্গ), শুনঃশেপাখ্যান বা হরিশ্চান্দ্রোপাখ্যান (বালকাণ্ড-৬২ সর্গ), পুলস্ত্যাখ্যান (উত্তরকাণ্ড-২ সর্গ), রাক্ষসবংশোৎপত্তি আখ্যান (উত্তরকাণ্ড-৩-৯ সর্গ) ইত্যাদি। রামায়ণকার স্বয়ং তাঁর রচনাকে সংহিতা, পুরাবৃত্ত ইতিহাস ও কাব্য বলে উল্লেখ করার পাশাপাশি ইহাকে আখ্যান বলেও অভিহিত করেছেন। মূলকাহিনির সাথে সংযুক্ত এই আখ্যান-উপাখ্যানগুলি তৎকালীন সময়ের নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং পারিবারিক সম্পর্কের একটি প্রায় নিখুঁত ছবি অঙ্কন করেছে। যেখানে দেখা মেলে আদর্শ স্বামী, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ জনক-জননী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ সহচর, আদর্শ রাজা, আদর্শ প্রজা ও আদর্শ সমাজের প্রতিচ্ছবির। ইতিহাসের কিংবা সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে এই আখ্যান-উপাখ্যানগুলির অবস্থান যাই-হোক না কেন, এগুলির সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়।

৫.মহাভারতে আখ্যান প্রসঙ্গ

ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা করতে গেলে *রামায়ণ* ব্যতীত অপর যে মহাকাব্যের আলোচনা অনিবার্য তা হল *মহাভারত*। *মহাভারতে*র রচয়িতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। *রামায়ণকার* বাল্মীকি যেমন *রামায়ণে*র একটি চরিত্র এবং মূল ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তেমনি *মহাভারতকার* ব্যাসও *মহাভারতে* একটি অন্যতম চরিত্র। তিনি ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ড ও বিদুরের পিতা। ভারতবর্ষের সামগ্রিক ইতিহাসের মহৎ কাহিনি অথবা ভারত যুদ্ধের বর্ণনা *মহাভারত* নামে পরিচিত। গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে *মহাভারতে*ই বলা হয়েছে 'মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ *মহাভারত*মুচ্যতে'।[১১] বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, মূল *মহাভারত* থেকে বর্তমান

[১১] মহা.,আদি., ১.৩০০

মহাভারত পর্যন্ত পৃথক পৃথক তিনটি স্তরে সমগ্র রচনার ক্রমপরিণতি ঘটেছে। প্রথমপর্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস আপন শিষ্য বৈশম্পায়নকে ৮৮০০ শ্লোক সমন্বিত কাহিনি শোনান।[১২] দ্বিতীয়বারে বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নাগযজ্ঞে জনমেজয়কে পূর্বশ্রুত কাহিনি ২৪০০০ শ্লোকের সমন্বয়ে শোনান।[১৩] তৃতীয় তথা অন্তিম পর্বে লোমহর্ষণের পুত্র সৌতি শৌনকাদি ঋষিগণকে সেই কাহিনি এক লক্ষ শ্লোকে সুসংবদ্ধ করে শোনান।[১৪] এই তৃতীয় কাহিনিটিই লোকবিশ্রুত হয়। এটিই বর্তমানে প্রাপ্ত *মহাভারত*। আঠারোটি পর্বে বিধৃত এই মহাকাব্যের মূল আখ্যান কৌরব ও পাণ্ডবগণের বিরোধ ও যুদ্ধ হলেও এতে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা সন্নিবেশিত হয়েছে। যা এই মহাকাব্যটিকে আকারে এত সুবিশাল করেছে। উল্লেখযোগ্য উপাখ্যানগুলি হল – কচ-দেবযানী উপাখ্যান (১.৭৭-৭৮), দুষ্যন্ত-শকুন্তলা উপাখ্যান (২.৬২-৭০), সাবিত্রী-সত্যবান আখ্যান (৩.২৭৬-২৮৩), পুরূরবা-ঊর্বশী উপাখ্যান, যযাতির কাহিনি, ঋষ্যশৃঙ্গ আখ্যান (১.২০৯-২১২), কার্তিকেয় উপাখ্যান (৩.১৮৭-১৯০), নল ও দময়ন্তীর উপাখ্যান (৩.৫৩-৭৯), বিদুলার উপাখ্যান (৫.১৩৩-১৩৬), দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনের কাহিনি (১.১৭-১৯), রুরুর কাহিনি (১.৮-১২), রুরুর পিতা চ্যবনের কাহিনি (৩.১২২-১২৫) ইত্যাদি। এগুলি ছাড়াও *মহাভারতে*র বনপর্বে রামকাহিনি অবলম্বনে রচিত একটি সুবৃহৎ উপাখ্যান হল রামোপাখ্যান। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় মর্মাহত যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাদান করার জন্য মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এই উপাখ্যানটি যুধিষ্ঠিরকে শ্রবণ করান। এছাড়াও কিছু ছোট ছোট উপাখ্যান *মহাভারতে* রয়েছে। যেমন – জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ, বৈদিক প্লাবনকাহিনি মনুমৎস্যোপাখ্যান, অগস্ত্যের সমুদ্রশোষণকাহিনি ইত্যাদি। এই সকল উপাখ্যানগুলি কাহিনি বৈচিত্র্যে, ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্বমূলক তুলনায়, তৎকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের তথ্যমূলক বর্ণনায় অনবদ্য একথা সর্বজনস্বীকৃত। বস্তুতঃ, এগুলিই বহুকাল যাবৎ সংস্কৃত ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার কবি সাহিত্যিকদের রচনার রসদ জুগিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও যাবে। তাই *মহাভারত* হল

---

[১২] অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ।

অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি সঞ্জয়ো বেত্তি বা ন বা।। তদেব,১.৮১

[১৩] উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়মাদ্যং ভারতমুত্তমম্।

চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।। তদেব, ১.১০২

[১৪] একশতসহস্রন্তু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্।। তদেবে, ১.১০৭

একটি সামগ্রিক সাহিত্য। Winternitz এর মতে, Indeed in a certain sense, the Mahabharata is not one poetic production at all, but rather a whole literature.[১৫]

৬.পুরাণে আখ্যান সমূহ

পুরাকাল থেকে লোক পরম্পরায় যা ব্যক্ত হয়ে আসছে তারই নাম পুরাণ। পুরাণ শব্দের অর্থ হল-'পূর্ব্বতন বা প্রাচীন কাহিনি' । ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম একটি অঙ্গ হল পুরাণসমূহ। প্রাচীন সাহিত্যে সংহিতা, পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি শব্দগুলি বহুব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। তাই *মহাভারত*ও পুরাণ, *রামায়ণ*ও পুরাণ আবার ইতিহাসও পুরাণ। *মহাভারতে*র অনেক কাহিনি এবং সমগ্র হরিবংশ প্রকৃত বিচারে পুরাণের লক্ষণাক্রান্ত। সামগ্রিক দৃষ্টিতে বৈদিক সাহিত্য, ইতিহাস, *রামায়ণ, মহাভারত*, দর্শন, স্মৃতি, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র প্রভৃতির অজস্র উপাদান ও উপকরণ মিলে সমগ্র পুরাণসাহিত্য গঠিত। প্রাচীন পুরাণগুলিতে প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী পুরাণ হল পুরাকালের বিবরণ। যেহেতু পুরাকালে অর্থাৎ অতীতে এরূপ ঘটনা ঘটেছিল, তাই এর নাম পুরাণ। বৌদ্ধ সাহিত্যে, উপনিষদে, ইতিহাস ও পুরাণকে প্রায় সমার্থক বলা হয়েছে। আখ্যান, আখ্যায়িকা, উপাখ্যান, গাথা প্রভৃতি সবগুলিকেই অপরিশুদ্ধরূপে পুরাণ বা ইতিহাস বলা হয়েছে। ইতিহাস ও পুরাণ শব্দ অনেকস্থলেই সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরাণ শব্দের অর্থ পুরাকালীন আর ইতিহাস শব্দের অর্থ ইতি-হ-হাস যার অর্থ এইরূপই ছিল। ইতিহাস দ্বারা অতীত ঘটনাকে বোঝানো হয় আর পুরাণ বলতে বোঝানো হয়েছে সুদুর অতীতের ঘটনাকে। ব্যাসদেব *মহাভারতে* কোনো ইতিহাস বলার সময় পুরাণকে পুরাতন বলে আখ্যায়িত করেছেন। *বেদ* বিভাগ কর্তা ও *মহাভারত*কার ব্যাসই অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণের রচয়িতা। এই মতে কলির প্রারম্ভে *মহাভারত* ও পুরাণগুলি রচিত। ব্যাস শিষ্য লোমহর্ষণ গুরুর মুখ থেকে পুরাণগুলি শ্রবণ করেন এবং অন্যদের নিকট যথাশ্রুত বর্ণনা করেন। বৈদিক যুগের বহু কাহিনি, আখ্যান-উপাখ্যান, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি পুরাণের

[১৫] H.I.L,VOl-I, P.277

মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।[১৬] কেবল তাই নয় এইগুলি পুরাণের অন্যতম অবলম্বন। *বিষ্ণুপুরাণে* বলা হয়েছে, আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির সমন্বয়ে মহামতি ব্যাস একটি পুরাণ সংহিতা রচনা করেছেন। দৃষ্ট বিষয়ের কথন আখ্যান এবং শ্রুত বিষয়ের কথন উপাখ্যান। আর পিতৃপুরুষগণের কথা বা পুরাতন ঘটনা বা কোনো কিছুকে মনে রাখার জন্য লোকমুখে প্রচলিত শ্লোক নিবন্ধ রচনাই হল গাথা। পুরাণগুলি হল বহু আখ্যান-উপাখ্যানের আকর স্বরূপ। কারণ পুরাণগুলিতে নির্দিষ্ট আলোচনার ধারায় একাধিক আখ্যানকাহিনী ও উপাখ্যান এসে মিশেছে। যেমন *পদ্মপুরাণে* সৃষ্টিতত্ত্ব, বংশানুচরিত, ভূগোল পরিচয় ও তীর্থমাহাত্ম্য মুখ্যরূপে আলোচিত হলেও সেখানে রয়েছে প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তির কাহিনি, দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কাহিনি, ঋষ্যশৃঙ্গ আখ্যান, বশিষ্ঠ-দিলীপসংবাদ ও জালন্ধর উপাখ্যান। *ভাগবৎপুরাণে* ধ্রুব ও প্রহ্লাদের উপাখ্যান, পুরূরবা-ঊর্বশীর কাহিনি, জয়-বিজয় উপাখ্যান, শকুন্তলার কাহিনি রয়েছে। *বামনপুরাণে* রয়েছে মহিষাসুর ও দুর্গার আখ্যান, তারক উপাখ্যান। এছাড়াও *স্কন্দপুরাণের* সনৎকুমারীয়সংহিতায় মহাদেবের মহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বিবিধ আখ্যান ও উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এই পুরাণেরই অপর সংহিতা বৈষ্ণবীসংহিতায় বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রতিপাদনের জন্যও একাধিক উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে। *মৎস্যপুরাণে* রয়েছে – কচ-দেবযানীর কাহিনি, যযাতির কাহিনি, কার্ত্তিকেয়ের তারকাবধ উপাখ্যান প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। *গরুড়পুরাণে* লৌকিকধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিপাদক নানা আখ্যান রয়েছে। *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে* ব্রহ্মাকর্তৃক জগৎসৃষ্টির বিবরণ প্রসঙ্গে বিবিধ পুরাবৃত্ত ও উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। *মার্কণ্ডেয়পুরাণের* উল্লিখিত উপাখ্যানগুলির মধ্যে দানশীল রাজা হরিশ্চন্দ্র, রাজা বিপশ্চিৎ, দম, রাজ্ঞী মাদলসার কাহিনী, দুর্গাকর্তৃক মহিষাসুর, চণ্ড-মুণ্ড, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি বিশেষ জনপ্রিয়। *বায়ুপুরাণে* রয়েছে জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান কাহিনি, দক্ষযজ্ঞ, পৃথুচরিত, দেবাসুর যুদ্ধ প্রভৃতি নানা আখ্যান। এই আখ্যানগুলি ও উপাখ্যানগুলি জন-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এগুলি লোক মুখে প্রচারিত হত। কখনও কখনও কথকের কল্পনার রঙে রাঙিয়ে দিয়ে তা পরিবেশিত হত। এই আখ্যান-উপাখ্যানগুলির দ্বারা উপদেশমূলক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মানব মনের

---

[১৬] ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।

বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মামায়ং প্রতরিষ্যতি।। ম.পু.,১.১.২০৪

সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যকে সুচারুভাবে প্রকাশিত করা হয়েছে এবং এগুলি পরবর্তী প্রজন্মের আচরণ শিক্ষার জন্য একটি দৃষ্টান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেবল তাই নয় পুরাণে আলোচিত এই আখ্যানগুলি পরবর্তীকালের সৃষ্টিস্পর্শে কখনও মহাকাব্য, কখনও নাটক, কখনও কবিতা, কখনও সিনেমা, কখনও থিয়েটারের উৎস হয়েছে।

৭.বৌদ্ধসাহিত্যে উপলব্ধ আখ্যান

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতী অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মালম্বী ভক্তদের মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল যথাক্রমে রাজগৃহে, বৈশালীতে এবং পাটলীপুত্রে, মহাকাশ্যপ কালাশোক ও অশোকের পৃষ্ঠপোকতায়। এই তিনটি সম্মেলনে যেমন বৌদ্ধধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল, তেমনি কথিত হয়েছিল দুইশত চৌষট্টি জন মহাস্থবিরের ভাষিত তেরোশ ষাটটি গাথা। যার মধ্যে প্রায় আশিজন মহাশ্রাবকের গাথা রয়েছে। সেই সময়ের প্রধান স্থবিরগণের ভাষিত গাথাগুলিকে সজ্জিত করে গ্রন্থিত হয়েছে থেরগাথা, যাকে অনায়াসে আমরা বুদ্ধ অনুগামী নিবেদিতপ্রাণ শ্রমণদের জীবনী সম্পর্কিত একটি আকর গ্রন্থ বলে অভিহিত করতে পারি। এগুলিই বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন। অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় বৌদ্ধ সাহিত্যেও বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যানের সমাবেশ রয়েছে। যেগুলি চিত্তাকর্ষক ও সঠিক মার্গ নির্দেশক। যেমন- *থেরগাথার* ২৫৫ নং নিদানে বর্ণিত অঙ্গুলিমাল স্থবিরের অনবদ্য আখ্যান।[১৭] অঙ্গুলিমালের মতো এমন পাশবিক হিংস্র মানুষের আমূল পরিবর্তনের কাহিনিই এর মূল উপজীব্য বিষয়, দুষ্ট লিচ্ছবিকুমারের আখ্যান।[১৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আলোচ্য আখ্যানের সাথে পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা রচিত *পঞ্চতন্ত্রের* রচনা বিন্যাসের সাদৃশ্য মেলে। সেখানে মহিলারোপ্য নগরীর রাজা অমরশক্তির তিন অবাধ্য পুত্রদের মাত্র ছয় মাসে তিনি তার অপরূপ রচনা বিন্যাসের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানেও দুষ্ট লিচ্ছবিকুমারের স্বাভাব ছিল ক্রোধী, উগ্র, নিষ্ঠুর ও

[১৭] স্থবির (অনূদিত) থের., বৌদ্ধ মিশন প্রেস,পৃ.৪২৮-৪৩৮

[১৮] জাতককথা, ১৪৪তম কাহিনি

আক্রমণাত্মক। তার প্রকৃতি এতই কোপন ছিল যে কেউ তাকে শান্ত করতে পারতেন না। তাই তাকে তার পিতা-মাতা শান্তার কাছে নিয়ে গিয়েছিল, অবশেষে কুমারের স্বভাবের পরিবর্তন হল। তার দম্ভ ক্রোধ ও স্বার্থপরতার দমন হল। পালিভাষায় রচিত ভগবান বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত হল *জাতককাহিনি*। *জাতককাহিনির* পঞ্চম খণ্ডের ৫/৩ য় আখ্যান জয়দ্দিষ-আখ্যান।[১৯] *জাতককাহিনি*গুলি যেহেতু *মহাভারত* রচনার অনেক পরে রচিত হয়েছে তাই *মহাভারতের* বহু ঘটনার প্রায় হুবহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় জাতকের বিভিন্ন কাহিনিতে। এটি *জাতককাহিনির* চতুর্থ খণ্ডের ৪৪৪ তম কাহিনি। এছাড়াও খুল্লনারদ জাতক আখ্যান (৪র্থ খণ্ড, ৪৭৭ তম কাহিনি) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৮.সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নিম্নে গবেষণাপত্রে উল্লিখিত আখ্যানগ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সেখানে প্রাপ্ত বিবাদের তথা বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য উল্লিখিত হল -

পঞ্চতন্ত্র– পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা রচিত আখ্যানমূলক গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল *পঞ্চতন্ত্র*। হার্টেল এর মতে মূল পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থটি বর্তমানে লুপ্ত। তবে এর প্রায় ২৫০ টি সংস্করণের সন্ধান পাওয়া যায়। কাশ্মীরীয় সংস্করণ *তন্ত্রাখ্যায়িকা* হল প্রাচীনতম সংস্করণ। পূর্ণভদ্রকৃত সংস্করণটির নাম হল *পঞ্চাখ্যানক*। মূলগ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দ।[২০] মোট ৭৯টি নীতিমূলক গল্পের সমন্বয়ে গ্রন্থটি রচিত। গ্রন্থে মিত্রভেদ-মিত্রপ্রাপ্তি-কাকোলূকীয়ম্-লব্ধপ্রণাশ-অপরীক্ষিতকারক এই পাঁচটি তন্ত্রে গ্রন্থটি বিন্যস্ত। দাক্ষিণাত্যে মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির অনুরোধে তাঁরই পুত্রদের ছয় মাসে নীতিশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আখ্যানগুলি রচিত হয়। গ্রন্থের পরিশেষে জানা যায় গ্রন্থটির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ হয়েছিল অর্থাৎ রাজপুত্ররা যথার্থই নীতিশিক্ষা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল।

---

[১৯] ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতক., খণ্ড-৫ম, পৃ.১২-৩০

[২০] A.B.Keith,H.S.L., P.243

আলোচ্য গ্রন্থটির যে কাহিনিগুলিতে অপরাধ, অপরাধী ও বিচার সম্বন্ধিয় তথ্য মেলে সেগুলির কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল- কাকোলূকীয়মের তৃতীয় কথায় বিচারকের যোগ্যতা, গুণাবলী, কর্তব্য ও বিচারকালে অনুচিত নির্ণয়দান করলে তার শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। লব্ধপ্রণাশের 'ঘণ্টোষ্ট্রকথা'য় পশুপালকের বেতন ও তার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মিত্রভেদের চতুর্থকথা থেকে দণ্ডপারুষ্য ও তার দণ্ডবিধান সম্পর্কে আলোচনা এবং চতুষ্পাদ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মিত্রভেদের 'ধর্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধিকথা'য় কোন প্রমাণ কখন প্রযোজ্য সেবিষয়ে দিকনির্দেশ করা হয়েছে, এছাড়াও মিথ্যাসাক্ষী ও মিথ্যা অভিযোগের বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অপরীক্ষিতকারকের 'চন্দ্রভূপতিকথা'য় কটুভাষণ বা বাকপারুষ্যের কুপ্রভাব, বিবাদের পরিণতি সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে। মিত্রভেদের 'লৌহতুলা-বণিকপুত্রকথা'য় নিক্ষেপ নামক বিবাদপদ ও তার বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়।

হিতোপদেশ - রাজা ধবলচন্দ্রের সভাকবি নারায়ণ শর্মা *হিতোপদেশ* গ্রন্থটির রচয়িতা। হার্টেল মহাশয়ের মতে *হিতোপদেশ* হল *পঞ্চতন্ত্রের* দক্ষিণভারতীয় সংস্করণ।[২১] পিটারসনের মতে *হিতোপদেশে* প্রাচীন পুঁথিটি পাওয়া যায় নেপালে।[২২] গ্রন্থটিতে *পঞ্চতন্ত্রের* প্রভাব স্পষ্ট। ভাগীরথীতীরে পাটলিপুত্রনগরের রাজা সুদর্শনের পুত্রদের কথাচ্ছলে নীতিশিক্ষাদানের জন্য এই গ্রন্থটি রচনা করা হয়।[২৩] *পঞ্চতন্ত্র* এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আখ্যান সমন্বয়ে মোট ৪৩টি আখ্যান গ্রন্থে রয়েছে। আখ্যানগুলি মিত্রলাভ-সুহৃদ্ভেদ-বিগ্রহ-সন্ধি এই চারটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। নারায়ণশর্মা কর্তৃক রচিত হলেও গল্পের কথক এখানে নীতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ বিষ্ণুশর্মা। গ্রন্থটিতে মানুষ অপেক্ষা মনুষ্যেতর বিভিন্ন পশু-পাখি এবং তাদের নিজ নিজ প্রজাতির রাজা, বিবাদ ও বিবাদের নিরসনের কাহিনি রয়েছে। যা থেকে সমসাময়িক কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক বিচারব্যবস্থা ও অপরাধ সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

---

[২১] H.S.L., P.263

[২২] P.Peterson,Preface of Hito.,P.II

[২৩] কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে। হিতো.,(প্রস্তাবিকা) ৮

আলোচ্যগ্রন্থে মিত্রলাভের তৃতীয়কথায় বিচারকের গুণাবলী সম্পর্কে নানা আলোচনা মেলে এবং সেখানে বিশ্বাসঘাতকতাকে একটি অপরাধরূপে উল্লেখ করা হয়েছে ও তার জন্য শাস্তি অবশ্যম্ভাবী এরূপ বলা হয়েছে। সুহৃদ্ভেদের পঞ্চমকথায় অপরাধে সাহায্যকারী ব্যক্তিও দণ্ডার্হ এমনটা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, স্ত্রী-দের শাস্তির ধরণ কীরূপ ছিল তাও আলোচ্য কাহিনিটি থেকে জানা যায়। সন্ধির চতুর্থ কথায় ও বিগ্রহের নবম কথায় ভৃত্যের প্রতি প্রভুর কর্তব্য, ভৃত্য ও মালিকের গুণ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। বিগ্রহের সপ্তম কথায় বিচারসভায় কে বা কারা উপস্থিত থাকবেন সেবিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ কথায় দুর্জনের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুহৃদভেদের দ্বিতীয় কথায় বিচারসভায় উপস্থিত সভ্যগণের কর্তব্য সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে।

বেতালপঞ্চবিংশতি- শিবদাস রচিত এই আখ্যান গ্রন্থটি বেতালের নামে প্রচলিত ২৫টি আখ্যানের সংকলন। গ্রন্থটির আনুমানিক রচনাকাল ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী। বেতালকাহিনির উল্লেখ *বৃহৎকথামঞ্জরী* ও *কথাসরিৎসাগরে* আছে। বিবিধ কৌতূহলোদ্দীপক গল্পের শেষে বেতাল কর্তৃক রাজা বিক্রমসেন বা ত্রিবিক্রমসেনের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষাগ্রহণ এবং বেতালের পরামর্শে প্রতারক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কবল থেকে রাজা বিক্রমাদিত্যের আত্মরক্ষার কাহিনি হল এর প্রতিপাদ্য বিষয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিক্রমাদিত্যের নাম সুপ্রসিদ্ধ। পণ্ডিতদের মতে এই বিক্রমাদিত্য মগধের গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দ-৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি উজ্জয়িনী অঞ্চলের শক রাজত্ব ধ্বংস করে 'শকারি' উপাধি লাভ করেন। এখানে কাহিনিগুলি কল্পনাশ্রিত ও চিত্তাকর্ষক হলেও কাহিনিগুলিতে বিভিন্ন অপরাধ, অপরাধী ও তার বিবাদের নিরসন সম্পর্কীত ধারণা পাওয়া যায়। বেতালের গল্পগুলির শেষে রাজাকে করা প্রশ্নগুলির মাধ্যমে ও রাজার দেওয়া উত্তরের দ্বারাও বিবাদে সঠিক পক্ষ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।

আলোচ্যগ্রন্থটির প্রথম উপাখ্যানে সাহস অপরাধের দৃষ্টান্ত ও তার শাস্তি বিষয়ক আলোচনা চোখে পড়ে। চতুর্থ উপাখ্যানে স্ত্রীকে হত্যা এবং প্রাড্বিবাকের দ্বারা সাক্ষী প্রমাণের সহায়তায় বাদী-প্রতিবাদীর বিবাদের নিরসন এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পঞ্চম উপাখ্যানে কন্যাপহরণ

অপরাধের কথা ও পরিশেষে তার শাস্তি প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বাদশ উপাখ্যানে বিনা কারণে স্ত্রীকে তিরস্কার ও পরিত্যাগকারী ব্রাহ্মণের নিন্দা করা হয়েছে। পঞ্চদশ উপাখ্যানের যে কোনো প্রকার প্রাণী হিংসাকে পাপরূপে অভিহিত করা হয়েছে এবং তা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ষোড়শ উপাখ্যানে উচিত-অনুচিত দান প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে। উপসংহার অংশে আততায়ীর সংজ্ঞা ও তার দণ্ডসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা - এই আখ্যান গ্রন্থটির রচনাকাররূপে ক্ষেমঙ্কর, কালিদাস, রামচন্দ্র, সিদ্ধসেন, দিবাকর প্রভৃতি একাধিক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্যকে কেন্দ্র করে মোট ৩২টি কাহিনি সংকলন হল *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা* বা *বিক্রমাদিত্যচরিত* বা *বত্রিশসিংহাসন*। প্রাচীনতম মূল রচনাটি লুপ্ত। রচনাকাল আনুমানিক ১২০০ খ্রীঃ থেকে ১৩০০ খ্রীঃ। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসিংহাসনটি ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করে ধারাধিপতি ভোজ তাতে উপবেশন করতে গেলে সেখানে বত্রিশটি নারীরূপী পুতুল প্রত্যেকে রাজা বিক্রমাদিত্যের গুণ বর্ণনা করে এক-একটি গল্প শোনায়। কথিত আছে ঐ সিংহাসনটি দেবরাজ ইন্দ্র বিক্রমাদিত্যকে উপহার হিসাবে প্রদান করেন। গল্পগুলির সাহিত্যিক ঔৎকর্ষ তেমন কিছু না থাকলেও গ্রন্থটিতে রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচারসভা তথা বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে এক স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্যের একাধিক গুণাবলীর মধ্যে অপরাধীকে তার অপরাধানুসারে যথাবিধ শাস্তি প্রদানও একটি গুণরূপে উল্লিখিত হয়েছে।

এই গ্রন্থটির চতুর্থ উপাখ্যানের কাহিনি থেকে চতুষ্পাদ ব্যবহারের চিত্র মেলে, দোষী চিহ্নিতকরণের জন্য তার শারীরিক বিকার বা বৈলক্ষণ সম্পর্কেও জানা যায়। অষ্টম উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে ন্যায়াধীশ রূপে রাজার কর্তব্য সমূহ। দ্বাদশ উপাখ্যানে পরস্ত্রীকে আঘাত ও তার বিহিত দণ্ডবিধি বিধৃত হয়েছে। ত্রয়োদশ উপাখ্যানে বাকপারুষ্য অপরাধটি সম্পর্কে নানান তথ্য মেলে। অষ্টাদশ উপাখ্যানে বিনা দোষে স্ত্রীপরিত্যাগজনিত বিধিনিষেধ ও তার শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। একত্রিংশত উপাখ্যানে চতুষ্পাদ ব্যবহারবিধি ও বিচারকের গুণাবলী সম্পর্কে জানা যায়।

শুকসপ্ততিকথা - পণ্ডিত এ.বি.কীথের মতে *শুকসপ্ততিকথা* এই আখ্যান গ্রন্থটির সংকলনকার হলেন চিন্তামণি ভট্ট।[২৪] গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক ১০০০ খ্রীঃ থেকে ১৪০০ খ্রীঃ। আলংকারিক বৈয়াকরণ হেমচন্দ্র (১০৮৮ খ্রীঃ-১১৭২ খ্রীঃ) *শুকসপ্ততিকথা*র উল্লেখ করেছেন। বণিক মদন বিনোদ বাণিজ্য যাত্রায় গেলে তার পত্নী স্বামীর অনুপস্থিতিতে কুপথে গমনেচ্ছুক হয়। তার পত্নীকে নিবৃত্ত করবার জন্য ও সঠিক মার্গ দর্শনের জন্য নীতিশাস্ত্রে নিপুণ শুকের সত্তরটি উপদেশ সমন্বিত আখ্যানের সংকলন হল *শুকসপ্ততিকথা*। গ্রন্থটিতে প্রতিদিন রাতে শুক যে কাহিনিগুলি বণিক পত্নীকে বর্ণনা করেছেন সেখানে স্ত্রী জাতির ব্যভিচারিতা, অপরাধ প্রবণতা ও তার সম্ভাব্য দণ্ড সম্পর্কে জানা যায়।

*শুকসপ্ততিকথা*র সপ্তম কথায় ও পঞ্চদশ কথায় দিব্য প্রমাণ প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। একবিংশতিকথায় সাক্ষীর যোগ্যতা ও তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা পাওয়া যায়। নবমকথায় নারীর ব্যভিচারীতার শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে। সপ্তমকথায় চৌর্যাপরাধ ও তার দণ্ডব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। তৃতীয়কথায় চতুষ্পাদব্যবহার পদ্ধতি, বিচারকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের উৎকোচ গ্রহণ প্রবণতারূপ অপরাধ ও তার শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তপঞ্চাশৎ কথায় অপরাধীর মুখের ভাব পরিবর্তন, দেহ চাপল্যতা ও অন্যান্য লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পুরুষপরীক্ষা - দেবসিংহ রাজার পুত্র শিবসিংহ রাজার অনুরোধে বিদ্যাপতি *পুরুষপরীক্ষা* গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীঃ। অভিনব প্রজ্ঞা বিশিষ্ট বালকদের এবং কাম-কলা-কৌতূকবিশিষ্ট পুরস্ত্রীদের আনন্দ বিধানের জন্য গ্রন্থটি রচিত হয়।[২৫] গ্রন্থটিতে আখ্যানগুলি চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। গ্রন্থের রচয়িতা কবি বিদ্যাপতি জানিয়েছেন, প্রাচীন পণ্ডিতেরা দানবীর হরিশ্চন্দ্র, দয়াবীর শিবি, যুদ্ধবীর অর্জুন, সত্যবীর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরযুগের রাজা ও রাজবংশের বর্ণনা করলেও তার উদ্দেশ্য হল কলিকালের রাজসন্তানদের কথা

---

[২৪] H.S.L., P.291

[২৫] শিশূনাং সিদ্ধ্যর্থং নয়পরিচিতের্নূতনধিয়াং মুদে পৌরস্ত্রীণাং সকলকবিতাকৌতুকজুষাম্...।। ঝর্ণা ভট্টাচার্য, পুরুষ.,পৃ.৩

বর্ণনা করা। এই গ্রন্থটির কৃপণ কথা, চৌর কথা ইত্যাদি বিভাগগুলিতে অপরাধ ও বিচারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

কথাসরিৎসাগর - কাশ্মীরের মহারাজ অনন্তের সভাসদ্ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ সোমদেব ১০৬৩-১০৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে *বৃহৎকথা* অবলম্বনে রচনা করেন *কথাসরিৎসাগর* নামক এক বিশালকায় গ্রন্থ। কাশ্মীররাজ-মহিষী সূর্যমতীর চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে সোমদেব এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলা জানা যায়। গ্রন্থখানি ১৮টি লম্বকে, ১২৪ তরঙ্গে এবং ২৪০০০ (মতান্তরে ২২০০০) শ্লোকে বিন্যস্ত। এর প্রথম অধ্যায়ে কথাপীঠে বিবৃত হয়েছে গুণাঢ্যের ইতিহাস।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রাচীনতম গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে *কথাসরিৎসাগর* বৃহদায়তনের এক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের মধ্যেও স্থান পেয়েছে *পঞ্চতন্ত্রের* কিছু কাহিনি। সোমদেবের *কথাসরিৎসাগরে* বৃহৎকথার যথাসম্ভব অনুসৃতি ঘটেছে। কাহিনিগুলিকে সহজে বোঝার জন্য সোমদেব সবিশেষ প্রয়াস করেছেন। সোমদেব স্বয়ং জানিয়েছেন তার রচনায় মূলগ্রন্থের তাৎপর্য ও পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয়েছে। *কথাসরিৎসাগর* বস্তুতঃ সাগরসদৃশ বিশাল। এর ১৮টি লম্বকে রয়েছে গুণাঢ্যের কাহিনি, উদয়নকথা এবং বিস্তারিতভাবে স্থান পেয়েছে গ্রন্থের নায়ক নরবাহনদত্তের উপাখ্যান। এর মধ্যে দেখা যায় *জাতক*কাহিনি, *বেতালপঞ্চবিংশতি* ও বিক্রমাদিত্যের কাহিনিও।

কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গে গুপ্ত ঘাতক নিয়োগ দ্বারা হত্যার চেষ্টারূপ অপরাধ, চিহ্নাঙ্কনের দ্বারা অপরাধী সনাক্তকরণের কৌশল বর্ণিত হয়েছে। এই লম্বকেরই চতুর্থ তরঙ্গে গচ্ছিত ধন রাখার নিয়মবিধি ও তা প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে জাত অপরাধ ও তার বিচার সম্পর্কে জানা যায় এবং ব্যবহারের চারটি পাদ বা ধাপ অনুযায়ী বিচারের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। লাবাণক লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গে 'সুন্দরকের কাহিনি'তে অস্বামীবিক্রয় বিবাদপদ ও তার বিচার, স্ত্রীর অপরাধ প্রবণতা, দোষীর দেহভঙ্গী দ্বারা দুষ্ট ব্যক্তি নির্ণয় কৌশল বর্ণিত হয়েছে। নরবাহনদত্ত জনন - চতুর্থ লম্বকের 'দেবদত্তের কাহিনি'তে স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতা সম্বন্ধীয় অপরাধ ও পতি কর্তৃক তার শাস্তির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। রত্নপ্রভালম্বকের সপ্তমতরঙ্গে 'বিলাসশীল ও বৈদ্যের কাহিনি'তে

বৈদ্য বা চিকিৎসকের ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল চিকিৎসার দ্বারা রোগী নিধন রূপ অপরাধের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এবং এরূপ কর্মকারী ব্যক্তির নিন্দাও আলোচ্য আখ্যানটিতে দেখা যায়।

দশকুমারচরিত – দৃশ্য-শ্রব্যভেদে কাব্য দুই প্রকার। শ্রব্যকাব্যকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়- গদ্য, পদ্য ও মিশ্র (চম্পূ)। পদ্যকাব্য হল যা শ্লোকে গ্রথিত যেমন মহাকাব্য ইত্যাদি। গদ্য বলতে বোঝায় যা শ্লোকে নিবদ্ধ নয় – অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্ (কাব্যাদর্শ-১/২৩)। অলংকারশাস্ত্রের নিয়মানুসারে, গদ্যভাষায় লেখা কবিকর্মের দুটি ভাগ, একটি কথা ও অন্যটি আখ্যায়িকা। প্রসিদ্ধ আলংকারিক ভামহ আখ্যায়িকা প্রসঙ্গে বলেছেন – প্রসিদ্ধ ঘটনা নায়ক নিজেই বলবেন, সুন্দর গদ্যে বিষয়টি নিবদ্ধ হবে, পরিচ্ছেদের নাম হবে উচ্ছ্বাস, বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দে শ্লোক রচিত হবে। কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিগ্রহ, অভ্যুদয় প্রভৃতির বর্ণনা থাকবে।

অপরদিকে কথায় কোনো উচ্ছ্বাস থাকবে না, বক্ত্র বা অপরবক্ত্রছন্দে শ্লোক থাকবে না, সংস্কৃত এবং অপভ্রংশ উভয় ভাষায় রচিত হবে, কাল্পনিক কাহিনি বিবৃত হবে এবং নায়ক ভিন্ন অন্যকেও বক্তা হবেন।

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে বিশিষ্ট রচনাকার দণ্ডীর বিশিষ্ট সৃষ্টি হল *দশকুমারচরিত*। দণ্ডিরচিত এই গ্রন্থটি আখ্যায়িকা নামেই প্রসিদ্ধ। অখ্যায়িকার সকল লক্ষণগুলি এখানে দৃষ্ট না হলেও একাধিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন আখ্যায়িকার নিয়মে অধ্যায় বিভাজনে উচ্ছ্বাস নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও বর্ণনীয় বিষয়ের দিক দিয়ে বিচার করলে এটিকে আখ্যায়িকা বলেই মনে হয়।

দশসংখ্যকাঃ কুমারাঃ ইতি দশকুমারাঃ (মধ্যপদলোপীকর্মধারয়)। দশকুমারাণাং চরিতম্ ইতি ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। দশকুমারচরিতম্ অধিকৃত্য কৃতং গ্রন্থম্ ইতি *দশকুমারচরিতম্*। অথবা দশকুমারাণাং চরিতানি ইতি *দশকুমারচরিতম্* (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। অর্থাৎ নামকরণের বিচারে *দশকুমারচরিত* হল দশজন কুমারের কাহিনি। পরস্পর সম্পর্কিত হলেও এখানে দশকুমারের পৃথক পৃথক আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। তারা নিজ মুখে তাদের চিত্তাকর্ষক নানা অভিজ্ঞতার

কাহিনীগুলি বর্ণনা করেছেন। এই সকল কাহিনিগুলি নানা দুর্বৃত্তের গল্প, চৌর্যাপরাধ, দুর্নীতিপরায়ণতা ও নানাবিধ রোমাঞ্চকর ঘটনায় সমৃদ্ধ। চিত্তাকর্ষক ভিন্ন ভিন্ন আখ্যানগুলিতে অপরাধ, অন্যায়, কন্যাহরণ, অপরাধে প্ররোচনা ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই কাব্য তত্ত্বের বিচারে *দশকুমারচরিত* যে বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন, চিত্তাকর্ষক ঘটনাবহুল কাহিনিসমৃদ্ধ হওয়ায় *দশকুমারচরিত*কে একটি আখ্যানগ্রন্থরূপেই গ্রহণ করা হয়েছে- যার প্রত্যেক পদে পদে নানা অপরাধের চিত্র ধরা পড়ে। বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায়ও একে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন- অনেক সাহিত্যিক- ঐতিহাসিকরা একে আখ্যান, উপাখ্যান, কথাকাহিনী বলেও অভিহিত করেছেন। Dr.S.K.De একে দুর্নীতি পরায়ণতার আখ্যান বলে অভিহিত করেছেন। Winternitz এর মতে এটি Tale Fiction অর্থাৎ কল্পিতকাহিনিমূলক আখ্যান। Keith এর মতে এটির গল্পগুলি লোককথা (Folk-tales) থেকে গৃহীত। *দশকুমারচরিতে*র গল্পগুলির কাঠামো কথাসাহিত্যের মতো। কারণ ইহার কাব্য কলেবর বিভিন্ন রসের দ্বারা প্লাবিত হলেও কাহিনিগুলিতে আখ্যান-উপাখ্যানের ন্যায় অদ্ভূত চরিত্র, অদ্ভূত কার্যাবলী, অদ্ভূত রসের সমাবেশও চোখে পড়ে।

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে বিশিষ্ট রচনাকার দণ্ডীর বিশিষ্ট সৃষ্টি হল *দশকুমারচরিত*। ওয়েবারের মতে, *দশকুমারচরিতে*র রচনাকাল আনুমানিক ৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। আখ্যায়িকাশ্রেণির এই রচনাটি গদ্যকাব্যরূপেই সুপ্রসিদ্ধ। এই কাব্যটি পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা নামক দুটি অংশে বিভক্ত। পূর্বপীঠিকায় পাঁচটি উচ্ছ্বাস ও উত্তরপীঠিকায় আটটি উচ্ছ্বাস আছে। সবকটি উচ্ছ্বাস সমেত সমগ্র *দশকুমারচরিত* দণ্ডীর রচনা কিনা সেবিষয়ে মতভেদ বর্তমান। *দশকুমারচরিতে*র দশজন কুমার হলেন, মগধরাজ রাজহংসের পুত্র রাজবাহন, মিথিলাধিপতি প্রহারবর্মার পুত্র উপহারবর্মা, অপহারবর্মা, মগধরাজমন্ত্রী ধর্মপালের পৌত্র মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, অর্থপাল, মগধরাজের দ্বিতীয়মন্ত্রী পদ্মোদ্ভবের পৌত্র বিশ্রুত ও পুষ্পোদ্ভব এবং মগধরাজের তৃতীয়মন্ত্রী সিতবর্মার পৌত্র প্রমিতি ও সোমদত্ত। রাজবাহনের অন্বেষণে তার সহচর কুমারগণ চতুর্দিকে বহির্গত হন। নানা দুঃসাহসিক অভিযানের শেষে দৈবক্রমে দশকুমার পুনরায় মিলিত হন এবং প্রত্যেকে তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনি বিবৃত করেন। ঐ সমস্ত অভিজ্ঞতার বিচিত্রকাহিনিই হল *দশকুমারচরিতে*র বিষয়বস্তু।

*দশকুমারচরিতে*র কাহিনিসমূহের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে জুয়াখেলা, জুয়াচুরি, চুরি, হিংসাজনক নানাবিধ অসৎকর্মাদি, হত্যা ও বিবিধ দুর্বৃত্ততার কথা। J.J.Meyer- এটিকে দুর্বৃত্তদের উপন্যাস (Knave fiction) বলে আখ্যায়িত করেছেন। আলোচ্যগ্রন্থের কুমারোৎপত্তিনামক প্রথমোচ্ছ্বাসে অপহরণ, শিশুহত্যার চেষ্টা ইত্যাদি অপরাধের উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিজোপকৃতি নামক দ্বিতীয়োচ্ছ্বাসে ব্রহ্মহত্যারূপ অপরাধ ও তার দণ্ড এবং মৃত্যুর পর ইহলোকে কৃত অপরাধের জন্য নরকযন্ত্রণার একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্য পরিবেশিত হয়েছে। সোমদত্তচরিত- এই তৃতীয়োচ্ছ্বাসে চৌর্যাপরাধ ও তার দণ্ডব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। চতুর্থ উচ্ছ্বাস পুষ্পোদ্ভবচরিতে পরস্ত্রীস্পর্শ, বলপূর্বক পরস্ত্রীগ্রহণ, পরদ্রব্য অপহরণ ইত্যাদি দুষ্কর্মের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এমন অপরাধীর উপযুক্ত দণ্ডও বিহিত হয়েছে। উত্তরপীঠিকার দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস অপহারবর্মাচরিত-এ গণিকাদের অপরাধ প্রবণতা ও অসদুপায়ে কিংবা মিথ্যা অভিযোগ দ্বারা নাগরিকদের থেকে অর্থ আদায়রূপ নানা অপরাধের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও এই উচ্ছ্বাসে চতুষ্পাদব্যবহার রীতি, পাশা খেলার আসরে সংঘটিত নানা অন্যায় অপরাধের বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যের ইতিহাসে যে সকল গ্রন্থের গুরুত্ব অনস্বীকার্য তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সাত লক্ষ শ্লোকে পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত *বৃহৎকথা*। এছাড়াও ক্ষেমেন্দ্রের *বৃহৎকথামঞ্জরী*, বুদ্ধস্বামীর *বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ*, শিবদাস রচিত *কথার্ণব*, হরিষেণের *কথাকোষ*, মেরুতুঙ্গের *প্রবোধচিন্তামণি*, রাজেশেখরের *প্রবন্ধকোষ* ইত্যাদি গ্রন্থগুলি সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের কলেবরকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবহারমাতৃকা একটি সমীক্ষা

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবহারমাতৃকা-একটি সমীক্ষা

ধর্মশাস্ত্রকার স্বয়ং মনুর মতে- এই জগতে স্বভাব শুদ্ধ মানুষ বিরল।[১] মানুষ মাত্রই যেন কাম-ক্রোধ-লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যের দ্রব্য-সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে তৎপর। এই হেন পরস্থিতিতে সমাজে অহঃরহ নানা অঘটন প্রায়শই ঘটতে থাকে। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে মানুষের জীবন-জীবিকার ঘোর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সমাজে সৃষ্টি হয় নানা বিশৃঙ্খলা। অতএব, সমাজের স্থিতি তথা রক্ষার স্বার্থে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন একান্ত অনিবার্য। আর কে দুষ্ট ও কে শিষ্ট তা জানা যায়-ব্যবহারদর্শনের মাধ্যমে। স্মৃতিশাস্ত্রের বিস্তৃত অংশ জুড়ে ব্যবহার অর্থাৎ বিচার-বিষয়ক আলোচনা এবং নানাধরণের বিবাদপদের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন যুগে নানা অপরাধমূলক কাজকর্ম হত এবং তার বিচারও হত, অন্ততঃ বিচারব্যবস্থার খুঁটিনাটি বর্ণনা থেকে সে কথাই অনুমিত হয়। কখন এবং কি পরিস্থিতিতে এই বিচারব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল তা জানা যায় শাস্ত্রকারগণের বক্তব্য থেকেই।

স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে – আগে যখন মানুষ ধর্মপরায়ণ ও সত্যবাদী ছিল তখন ব্যবহার ছিল না, দ্বেষ-মাৎসর্যও ছিল না।[২] কিন্তু কালক্রমে মানুষের সেই সাধারণ ধর্মবোধ লোপ পেলে ব্যবহার বা বিচারের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং রাজার উপরে সেই দায়িত্বভার অর্পিত হয়।[৩] রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রশাসনিক প্রধানরূপে বিচারের ভার মূলতঃ রাজার উপরেই ন্যস্ত ছিল। রাজার অবর্তমানে প্রাড্বিবাক (প্রধান বিচারক) সেই দায়িত্ব পালন করতেন, রাজার সঙ্গে

---

[১] সর্ব দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্নরঃ। মনু.৭.২২

[২] ধর্মৈকতানাঃ পুরুষা যদাসন সত্যবাদিনঃ।
তদা ন ব্যবহারোঽভূন্ন দ্বেষো নাপি মৎসরঃ।। নারদ.,১.১

[৩] নষ্টে ধর্মে মনুষ্যেষু ব্যবহারঃ প্রবর্ততে।
দ্রষ্টা চ ব্যবহারাণাং রাজা দণ্ডধরঃ স্মৃতঃ।। তদেব, ১.২

বিচারকার্যে অংশগ্রহণ করতেন সভ্যবৃন্দ, গণক, লেখক প্রভৃতি ব্যক্তি।[৪] কিন্তু দণ্ডদানাধিকারী ছিলেন একমাত্র রাজা। শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে তিনি অপরাধীকে সাজা ঘোষণা করতেন।

প্রাচীন ভারতীয় বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলা প্রয়োজন । কে বিচার করবেন, কাদের সাহচর্যে তিনি তা করবেন, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে কী করণীয় ? বিচারালয়ে সভ্যবৃন্দ এবং তাদের বাঞ্ছনীয় গুণাবলী ইত্যাদি থেকে শুরু করে অপরাধ কত রকমের হত এবং দণ্ড-ই বা কেমন ছিল ? এই সব কিছুই স্মৃতিশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রমতে, রাজার প্রধান ধর্ম হল প্রজাপালন এবং শাস্ত্রে সেই প্রজাপালনরূপ ধর্মরক্ষার্থেই রাজাকে প্রত্যহ ব্যবহারদর্শন বা বিচার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

১.ব্যবহারের স্বরূপ নির্ণয়

ব্যবহ্রিয়তে অনেন এই ব্যুৎপত্তিতে বি-অব পূর্বক হৃধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঘঞপ্রত্যয় করে ব্যবহার শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার* টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য বলেছেন, শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন ব্যতীত প্রজাপালন সম্ভব নয়। দুষ্টের দমন করতে হলে আগে দুষ্ট কে তা জানা প্রয়োজন। আর বিচারদর্শন ছাড়া দুষ্টের চিহ্নিতকরণ এবং তার শাস্তিবিধান সম্ভব নয়। একারণেই প্রত্যহ বিচারদর্শন রাজার পক্ষে আবশ্যিক। রাজার পক্ষে ব্যবহারদর্শনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে গিয়ে ভাষ্যকার মেধাতিথি বলেছেন – রাজার কাজ প্রজাপালন। পালন বলতে বোঝায় পীড়া-নিবারণ। প্রজারা দ্বেষ, মাৎসর্য ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে কুপথে চালিত হলে রাজ্যের নাশ হয়। কারণ প্রজারাই রাজ্যের ঐশ্বর্য স্বরূপ, তারা বিনষ্ট হলে রাজ্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই রাজার উচিত ব্যবহারদর্শনের মাধ্যমে শাস্ত্রবিহিত দণ্ড এমনভাবে প্রণয়ন করা

[৪] রাজা সপুরুষঃ সভ্যাঃ শাস্ত্রং গণকলেখকৌ। তদেব, ১.১৫

যাতে দণ্ডপ্রাপ্তির ভয়ে প্রজারা নিজ নিজ ধর্ম থেকে বিচ্যুত না হয়। রাজ্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে তাই রাজার ব্যবহারদর্শন কর্তব্য।[৫]

আধুনিককালে ব্যবহার-শব্দটির দ্বারা পারস্পরিক আচার-আচরণকে বোঝানো হলেও স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবহার শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আচার্য বিজ্ঞানেশ্বর ব্যবহারের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন – অন্যের উক্তির বিরোধিতা করে কোনো বস্তুকে নিজের সম্বন্ধে দাবি করাই হল ব্যবহার। একটি উদাহরণ সহযোগে তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন- একটি জমি এক ব্যক্তি নিজের বলে ঘোষণা করার পর অপর কোনো ব্যক্তি যদি সেটা তার নিজের বলে দাবি করে তবে তা ব্যবহার বলে গণ্য হবে।[৬] এই অর্থে ব্যবহারশব্দটি কিন্তু বিবাদ অর্থে প্রযুক্ত, কেননা এখানে বিচার শুরু হয়নি, এমনকি বিচারের আশায় আবেদনও জানানো হয়নি। কাত্যায়নের মতে, বি-এই উপসর্গের অর্থ নানা, অব-উপসর্গের অর্থ হল সন্দেহ। হার শব্দের হরণ। নানা সন্দেহ নিরসন করা হয় যে পদ্ধতির দ্বারা তাই হল ব্যবহার।[৭]

২.ব্যবহারদর্শনের উদ্দেশ্য ও সময়কাল

ব্যবহারময়ূখ গ্রন্থে ব্যবহারদর্শনের কাল প্রসঙ্গে কাত্যায়নের যে বচন নীলকণ্ঠ উদ্ধৃত করেছেন সেখানে বলা হয়েছে- রাজা শাস্ত্রানুসারে পূর্বাহ্নে ব্যবহারদর্শন করবেন। পূর্বাহ্নের কোনো সময়টি ব্যবহারদর্শনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কাত্যায়ন বলেছেন- একটি দিনের সময়কে আট

---

[৫] তুলঃ পরিপালনং চ পীড়াপহারঃ। ... প্রজা হি দ্বেষমৎসরাদিভিরিতরেতরমযথাবদাচরন্তি... অতশ্চ রাজ্যনাশঃ। প্রজৈশ্বর্যং হি রাজ্যমুচ্যতে। তাসু বিনশ্যন্তীষু কস্য রাজ্যং স্যাত্। ব্যবহারাদয়োঽতঃ শাস্ত্রদণ্ডেন ব্যবস্থাপ্যমানা ন ভয়াত্ পৃথক্ প্রচলন্তি তথা চোভয়থাঽপি রক্ষিতা ভবন্তি। ... অতো রাজ্যস্থিত্যর্থং ব্যবহারদর্শনং কর্তব্যম্ । মনুভা., ৮.১

[৬] অন্যবিরোধেন সাত্মসম্বন্ধিতয়া কথনং ব্যবহারঃ। যথা কশ্চিত্ ইদং ক্ষেত্রং মদীয়ম্ ইতি কথয়তি, অন্যোঽপি তদ্বিরোধেন মদীয়ম্- ইতি। মিতা, ২.১

[৭] বিনানার্থেবসন্দেহে হরণং হার উচ্যতে।
নানাসন্দেহহরণাত্ ব্যবহার ইতি স্মৃতঃ।। কাত্যা.,২৬

ভাগে ভাগ করে অষ্টম ভাগটি ছেড়ে পরবর্তী তিনটি ভাগ হল ব্যবহারদর্শনের জন্য শ্রেষ্ঠ সময়।[৮] নীলকণ্ঠ বলেছেন, প্রথম যামটি ছেড়ে মধ্যাহ্নের পূর্ববর্তী তিনটি যাম বিচারদর্শনের পক্ষে শ্রেয়ঃ।[৯] মনুর মতে, রাজা রাত্রির শেষভাগে শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করে শুদ্ধদেহ হয়ে অগ্নিহোত্রাদি হোম সম্পাদন করে ব্রাহ্মণগণকে সম্মান প্রদর্শন করে বিচারসভায় প্রবেশ করবেন।[১০] *মহাভারতে*র বনপর্বে (৩৩.৪০) রাজাকে তার নিত্যকর্মের মধ্যে প্রাতঃকালে ধর্ম অর্থাৎ ন্যায়সম্বন্ধি কার্য দেখতে বলেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য আচার অধ্যায়ের রাজধর্ম প্রকরণের রাজার বিচারদর্শনের সময় নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, রাজা প্রত্যহ প্রাতঃকালে সজ্জা ত্যাগ করে আয়-ব্যায়ের হিসাব পরিদর্শন করে ব্যবহার দর্শন করবেন। তারপর স্নান করে যথাকালে ইচ্ছানুসারে আহার গ্রহণ করবেন।[১১] শাস্ত্রভেদে রাজার ব্যবহারদর্শনের জন্য পৃথক পৃথক সময়ের উল্লেখ করা হলেও সকলেই রাজাকে প্রত্যহ অবশ্যই বিচারদর্শন করতে বলেছেন।

৩.বিবাদপদের স্বরূপ ও প্রকার নিরূপণ

ব্যবহারপদ কথার অর্থ হল বিবাদের বিষয়। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ ন্যায়ালয়ে বিচার্য বিবাদের সমুচিত বিভাগ করেছেন। বৈদিকসাহিত্যে পাপ এবং অপরাধের উল্লেখ থাকলেও, অপরাধ গুলির ক্রমবদ্ধভাবে সূচী করা হয়নি। পরবর্তী সাহিত্যে, বিশেষতঃ সূত্রসাহিত্যে যখন সামাজিক আইনের প্রণয়ন হয়েছিল তখন পাপ এবং অপরাধের ক্রমবদ্ধ সূচীর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া

---

[৮] সভাস্থানে তু পূর্বাহ্নে কার্যাণাং নির্ণয়ং নৃপঃ।
কুর্যাচ্ছাস্ত্রপ্রণীতেন মার্গেণামিত্রকর্শনঃ।।
দিবসস্যাষ্টমং ভাগং ভুক্ত্বা ভাগত্রয়ং তু যতঃ।
স কালো ব্যবহারাণাং শাস্ত্রদৃষ্টঃ পরঃ স্মৃতঃ।। তদেব,৬০-৬১

[৯] তদেব,৬২

[১০] উত্থায় পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণাংশ্চার্চ্য প্রবিশেত্ স শুভাং সভাম্।। মনু.,৭.১৪৫

[১১] কৃতরক্ষঃ সমুত্থায় পশ্যেদায়ব্যায়ৌ স্বয়ম্।
ব্যবহারাংস্ততো দৃষ্ট্বা স্নাত্বা ভুঞ্জীত কামতঃ।। যাজ্ঞ.১.৩২৭

হয়েছে। বিশেষতঃ, ধর্মসূত্রগুলিতে তার নিদর্শন মেলে। তবে স্মৃতিগ্রন্থগুলিতেই অপরাধগুলির বিষয়ে সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। স্মৃতিগ্রন্থে বিবিধ প্রকারের বিধিসমূহ, অপরাধ এবং তদনুসারে দণ্ডের উপর স্মৃতিকারগণ গভীর আলোচনা ও তার শ্রেণীবিভাগ করেছেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, নারদ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ন্যায়বিদ্ অপরাধ, তাদের সংশোধন এবং দণ্ডব্যবস্থা সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা করেছেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, স্মৃতিশাস্ত্র ও আচার এই উভয়ের বিরুদ্ধ পথে অপরের দ্বারা পীড়িত হয়ে যদি কেউ উক্ত পীড়াবিষয়ে আবেদন জানায়, তাহলে সেই আবেদ্যমান বস্তুটি ব্যবহারের বিষয় বা বিবাদপদ বলে বিবেচিত হয়।[১২] বিবাদপদের লক্ষণ সম্পর্কে কিছু না বললেও বিবাদপদের শ্রেণিবিভাগ সর্বপ্রথম *মনুসংহিতায়* দেখা যায়। মহামতি মনু বিচারকার্যের সুবিধার্থে সমস্ত বিবাদকে আঠারোটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। সেগুলি হল- ঋণাদান(non payments of debts), নিক্ষেপ(deposit and pledge), অস্বামিবিক্রয়(sale without ownership), সম্ভূয় সমুত্থান(concerns among partners), দত্তবস্তুর অনপকর্ম(resumption of gifts), বেতনাদান(non-payment of wages), ক্রয়-বিক্রয়ানুশয়(rescission of sale and purchase), স্বামিপালবিবাদ(disputs between the owner of cattle and his servants), সীমাবিবাদ(disputs regarding boundaries), দণ্ডপারুষ্য(assault), বাকপারুষ্য(defamation), স্তেয়(theft), সাহস(robbery and violence), স্ত্রীসংগ্রহণ(adultery), স্ত্রী-পুংধর্ম(duties of man and wife), বিভাগ(partition of inheritance), দ্যূত ও আহ্বয়(gambling and betting)- এই আঠারোটিকে বিবাদের পদ বলে ধরা হয়েছে এবং এগুলি 'ব্যবহার' প্রযোজক (eighteen topics which give rise to lawsuits) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩] অর্থাৎ সমাজে সংঘটিত বিবাদগুলিকে মোটামুটিভাবে

---

[১২] স্মৃত্যাচারব্যপতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্ রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তত্।। তদেব,২.৫

[১৩] তেষামাদ্যমৃণাদানং নিঃক্ষেপোঽস্বামিবিক্রয়ঃ।
সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপাকর্ম চ।।

অষ্টাদশ প্রকারে ভাগ করা হয়। তবে, তিনি অষ্টাদশ এই সংখ্যাটিকে কোনো আদর্শ সংখ্যা বলেননি। মেধাতিথির মতে, এই অষ্টাদশ বিষয়েই মানুষের খুব বেশি বিবাদ হয়।[১৪] এই বক্তব্যটির অর্থ আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় কুল্লূক ভট্টের টীকায়। তাঁর মতে, ঋণাদানাদি বিষয়গুলিতে বিবাদের বাহুল্যতা থাকে, রাজা ধর্মানুসরণপূর্বক এই সকল বিষয়ে কার্যনির্ণয় করবেন। শ্লোকস্থিত 'ভূয়িষ্ঠ' পদটির দ্বারা অন্যান্য বিষয়েও বিবাদ হতে পারে এমনটা বুঝতে হবে।[১৫]

মনু বিবাদের অন্য অনেক প্রকারের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের অধিকতর সম্বন্ধ বাদী ও প্রতিবাদীর সাথে না হয়ে প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কোনো বিষয়ে বিবাদ হলে, রাজাকে স্বয়ং সে সকল বিবাদের নির্ণয় করতে বলা হয়েছে। যেমন, চুরি করা, নিষিদ্ধ বস্তুর বাণিজ্য করা, নিষিদ্ধ বর্ণাশ্রমের উল্লঙ্ঘন, মাতাপিতাকে উপেক্ষা বা অপমান করা, গুরুর অপমান করা ইত্যাদি। এই সকল ক্ষেত্রে রাজা কারো অভিযোগের অপেক্ষা করবেন না, নিজেই দোষীকে দণ্ড দিতে তৎপর হবেন। অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থগুলিতেও বিবাদপদের শ্রেণিবিভাগ দেখা যায়, তবে সে ক্ষেত্রে স্মৃতিকারদের মতের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

নারদ বিবাদকে আঠারো প্রকারে ভাগ করলেও মনুর বিভাগ থেকে কিছু ভিন্নভাবে চিন্তা করেছেন। তিনি ক্রয়-বিক্রয়ানুশয়কে একটি ভাগ না করে দুটি স্বতন্ত্র বিবাদপদ রূপে বিভাগ করেছেন। তিনি স্বামিপালবিবাদ, স্তেয় ও স্ত্রীসংগ্রহণকে আঠারোটিতে অন্তর্গত করেননি। তিনি অন্যভাবে আঠারো প্রকারের গণনা করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ানুশয়কে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে

বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ।।
সীমাবিবাদধর্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ডবাচিকে।
স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রণমেব চ।।
স্ত্রীপুংধর্মো বিভাবগশ্চ দ্যূতমাহ্বয় এব চ।
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ।। মনু.,৮.৪-৭

[১৪] এষু স্থানেষু ভূয়িষ্ঠং বিবাদং চরতাং নৃণাম্। তদেব,৮.৮

[১৫] ঋণাদানাদিষু ব্যবহারস্থানেষু বাহুল্যেন...ধর্মমবলম্ব্য কার্যনির্ণয়ং কুর্যাত্। ভূয়িষ্ঠশব্দেনান্যন্যাপি বিবাদপদানি সন্তীতি সূচয়তি। মন্বর্থ.,৮.৮

অভ্যুপেত্যাশুশ্রুষা ও প্রকীর্ণক এই দুটি শ্রেণির গণনা করে আঠারো প্রকারের শ্রেণি পূর্ণ করা হয়েছে। দ্যূতসমাহ্বয় পর্যন্ত পূর্বে যে বিষয় অন্তর্গত করা হয়নি তাদেরকে প্রকীর্ণকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।[১৬] যাজ্ঞবল্ক্যকৃত ব্যবহারপদের তালিকাটি আবার মনু ও নারদ উভয়ের থেকে ভিন্ন। যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রী-পুং ধর্মকে অষ্টাদশ বিবাদপদের অন্তর্গত করেননি, অভ্যুপেত্যাশুশ্রুষাকে প্রকীর্ণকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ানুশয়কে দুটি পৃথক্ বিবাদপদ করে তিনি মোট কুড়িটি বিবাদপদের উল্লেখ করেছেন। পি.ভি.কাণে *হিস্ট্রি অফ্ ধর্মশাস্ত্র* গ্রন্থে বলেছেন, *বৃহস্পতিস্মৃতি*তে উনবিংশ প্রকার বিবাদপদের উল্লেখ আছে।[১৭]

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট যে, মনু কথিত অষ্টাদশ বিবাদ প্রায় সকল স্মৃতিকার মেনে নিয়েছেন। অন্যান্য বহু বিবাদ ন্যায়ালয়ে মীমাংসিত হত, তবে এই অষ্টাদশ বিবাদপদের ভেদ ও উপভেদের অন্তর্গত ছিল। মনু 'ব্যবহার' পদের পারিভাষিক অর্থ দেননি। পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ 'ব্যবহার' এই পদের লক্ষণ নির্ণয়ের পাশাপাশি বিবাদপদগুলিকে দুটি বর্গে বিভক্ত করেছেন।

বৃহস্পতি বিবাদপদগুলির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ধনমূলক ও হিংসামূলক ভেদে ব্যবহার দ্বিবিধ বলে স্বীকার করেছেন, যার মধ্যে ধন-মূলক চৌদ্দ প্রকার এবং হিংসামূলক চার প্রকার।[১৮]

---

[১৬] ঋণাদানং হ্যপনিধিঃ সম্ভূয়োত্থানমেব চ।
দত্তস্য পুনরাদানমশুশ্রুষাভ্যুপেত্য চ।।
বেতনস্যানপকর্ম তথৈবাস্বামিবিক্রয়ঃ।
বিক্রয়াসম্প্রদানং চ ক্রীত্বানুশয় এব চ।।
সময়স্যানপকর্ম বিবাদঃ ক্ষেত্রজস্তথা।
স্ত্রীপুংসয়োশ্চ সম্বন্ধো দায়ভাগোঽথ সাহসম্।।
বাক্পারুষ্যং তথৈবোক্তং দণ্ডপারুষ্যমেব চ।
দ্যূতং প্রকীর্ণকং চৈবেত্যষ্টাদশপদঃ স্মৃতঃ।। নারদ,১.১৬-১৯

[১৭] P.V.Kane,Hist.Dh.,P-248

[১৮] দ্বিপদো ব্যবহারঃ স্যাদ্ধনহিংসাসমুদ্ভবঃ।
দ্বিসপ্তকোঽর্থমূলস্তু হিংসামূলশ্চতুর্বিধঃ।। বৃহ.,৯

ঋণাদান থেকে শুরু করে দায়ভাগ পর্যন্ত বিবাদপদগুলি ধনমূলক এবং সাহস, বাক্পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, স্তেয় ও স্ত্রীসংগ্রহণ এইগুলি হিংসামূলক বিবাদপদ বলে বিবেচিত হয়েছে।[১৯] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বর্তমানযুগেও ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় দেওয়ানী (civil) ও ফৌজদারী (Criminal) এই দুই ধরণের ভেদ প্রচলিত আছে।

৪.ব্যবহারদর্শনের নিমিত্ত রাজা ও তাঁর গুণাবলী

স্মৃতিশাস্ত্রমতে ব্যবহারদর্শন করা এবং প্রজাদের ন্যায় দ্বারা সন্তুষ্ট করা রাজার কর্তব্য। শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয়েছে যে, বিচার করা রাজার ধর্ম।[২০] মনু বলেছেন, ব্যবহার পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক রাজা মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রীদের সাথে সকল প্রকার চাপল্যতা পরিহার করে অর্থাৎ বিনীতভাবে ধর্মাধিকরণ-সভায় প্রবেশ করবেন।[২১] টীকাকার কুল্লূক ভট্টের মতে, রাজা যদি অবিনীত হন তবে বিচারদর্শনে ব্যাঘাত ঘটে।[২২] বাদী ও বিবাদীর বিবাদের বিষয়ে নানা ধরণের সন্দেহের বিনাশক অনুষ্ঠানের নাম হল ব্যবহার। রাজা ব্যবহার কিভাবে দেখবেন তার নিয়ম অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। ব্যবহারদর্শন করতে ইচ্ছুক রাজা ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রজ্ঞ অমাত্যগণের সাথে বিনীতভাবে ন্যায়ালয়ে প্রবেশ করবেন।[২৩] যাজ্ঞবল্ক্যও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।[২৪] ন্যায়ালয়ে

---

[১৯] পারুষ্যে দ্বে সাহসঞ্চৈব পরস্ত্রীসংগ্রহস্তথা।
হিংসোদ্ভবপদান্যেবং চত্বার্যাহ বৃহস্পতিঃ।। তদেব,১৪

[২০] প্রজানাং রক্ষণং নিত্যং কণ্টকানাং শোধনম্। কাত্যা.,১৫

[২১] ব্যবহারান্ দিদৃক্ষস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রজ্ঞৈর্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেত্ সভাম্।। মনু.,৮.১
তুল. ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্ বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ধর্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধলোভবিবর্জিতঃ।। যাজ্ঞ.,২.১

[২২] অবিনীতে হি নৃপে বাদিপ্রতিবাদিনাং প্রতিভাক্ষয়াদসম্যগভিধানে তত্ত্বনির্ণয়ো ন স্যাত্। মন্বর্থ.,৮.১

[২৩] ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রজ্ঞৈর্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাম্।। মনু.৮.১

উপস্থিত হয়ে তিনি ধর্মাসনে বসবেন। তিনি নিজের শরীরকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে একাগ্রচিত্তে লোকপাল দেবতাদেরকে প্রণাম করে বিচারকার্য আরম্ভ করবেন।[২৫]

বিচারকার্য নির্বাহ করার সময় রাজা বিশেষ প্রকারের বৃত্তিধারণ করবেন। নারদ বলেছেন যে, রাজা বৈবস্বত ব্রত ধারণ করবেন।[২৬] 'বিবস্বতো যমস্য ইদম্', অর্থাৎ বিবস্বানের (যমের) সম্বন্ধী এই অর্থে অণ্ প্রত্যয়ে বৈবস্বত পদটি সিদ্ধ। যেরূপ যমদেবতা প্রিয় এবং দ্বেষ্য উভয় ভাবকে সমাপ্ত করেছেন সেরূপ রাজা ভেদভাবরহিত হয়ে বিচারকালে সমস্ত প্রজাজনের উপর সমভাব ধারণ করবেন।[২৭] ন্যায়াসনে উপবেশন করে রাজা রাগ-দ্বেষ, প্রিয়-অপ্রিয় প্রভৃতি ভাবনা ত্যাগ করে বস্তুস্থিতিকে অন্তঃস্থলে প্রাপ্ত করে নিজের প্রিয় ব্যক্তির বা পুত্রের অপরাধও ক্ষমা করবেন না।[২৮]

যদি রাজা ব্যক্তিগত ভাবনায় অভিভূত হয়ে ন্যায় ত্যাগ করেন তবে তার নির্ণয় কোনো অবস্থায় নিষ্পক্ষ হবে না। সেকারণে মনু অধর্মযুক্ত বিচারের বিভীষিকার কথা সবিস্তার বলেছেন। যে বিচারসভায় অধর্ম ধর্মকে পরাভূত করে এবং অধর্মকে ছেদন করা যায় না সেই সভার সভাসদরা বিদ্ধ হন। বিচারসভায় অনুমতি ভিন্ন কেউ প্রবেশ করবে না। যদি প্রবেশ করে তবে সত্য বলবে। যদি অন্যায় হতে দেখে নিরব থাকে বা ন্যায়বিরুদ্ধ বলে তবে সেই ব্যক্তি পাপী

---

[২৪] ব্যবহারান্নৃপঃ পশ্যেদ্বিদ্বদ্ভির্বাক্ষণৈঃ সহ। যাজ্ঞ.,২.১

[২৫] ধর্মাসনমধিষ্ঠায় সংবীতাঙ্গঃ সমাহিতঃ।
প্রণম্য লোকপালেভ্যঃ কার্যদর্শনমারভেৎ।। মনু.,৮.২৩

[২৬] তস্মাদ্ ধর্মাসনং প্রাপ্য রাজা বিগতমৎসরঃ।
সমঃ স্যাৎ সর্বভূতেষু বিভ্রদ্ বৈবস্বতং ব্রতম্।। নারদ.,১.৩৪

[২৭] যথা যমঃ প্রিয়দ্বেষৌ প্রাপ্তে কালে নিয়চ্ছতি।
তদা রাজা নিয়ন্তব্যাঃ প্রজাস্তদ্ধি যমব্রতম্।। বৃহ.,১.১১০

[২৮] পুত্রস্যাপি ন মৃশ্যেচ্চ স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে। মহা.শান্তি.,১.১১০
পাপমাচরতো যস্য কর্মণা ব্যবহৃতেন চ।
প্রিয়স্যাপি ন মুচ্যতে স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে।। মহা.শান্তি.,৯১.৩৫

হবে। অধর্মের দ্বারা ধর্মকে এবং অসত্যের দ্বারা সত্যকে নষ্ট হতে দেখে বিচারকগণ নির্বিকার থাকলে তারা মহাপাপে লিপ্ত হবেন। অতএব ধর্মকে বিনাশ করা উচিত নয়। ধর্মই সুখের কারণ। যে ধর্ম লোপ করে সে হল নীচ। তাই রাজা ধর্মের লোপ করবেন না (মনু.৭.১৩-১৭)। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, রাজা ক্রোধ ও লোভ বর্জন করে ধর্মশাস্ত্র অনুসারে নানাশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত ব্যবহারদর্শন করবেন। *মিতাক্ষরা*কার বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য বলেছেন অভিষেকাদিগুণযুক্ত রাজার প্রজাপালনই পরম ধর্ম। ব্যবহার পরিচালনা ঐ প্রজাপালনেরই অঙ্গ। 'অভিষেকাদি'শব্দে আদি পদটির দ্বারা রাজার কতকগুলি গুণের কথা বলা হয়েছে যেগুলির দ্বারা ভূষিত ক্ষত্রিয়কে রাজ্যাভিষিক্ত করা হত। আচার অধ্যায়ে রাজধর্মের বর্ণনার প্রারম্ভে এই গুণাবলী সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে মহোৎসাহ, স্থূললক্ষ, কৃতজ্ঞ, বৃদ্ধসেবক, বিনীত, সত্ত্বসম্পন্ন, কুলীন, সত্যবাক্ শুচি, অদীর্ঘসূত্র, স্মৃতিমান, অক্ষুদ্র, অপরুষ, ধার্মিক, অব্যসন, প্রাজ্ঞ, শূর, রহস্যবিৎ, সরন্ধ্রগোপ্তা, আন্বীক্ষিকী-দণ্ডনীতি-বার্তা-ত্রয়ী এই সকল বিদ্যায় প্রবীন- এই সব প্রকার নানা গুণান্বিত নরপতি রাজ্যে অভিষিক্ত হবেন (যাজ্ঞ.১.৩০৯-৩১১)। এই ব্যবহারদর্শন বা বিচারদর্শন কেবল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়, কিন্তু প্রজাপালনে অধিকারী অন্যজাতীয় রাজারও এটিই ধর্ম। তাই শ্লোকে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন 'নৃপঃ পশ্যেৎ'। বিচারদর্শন অবশ্যই রাজার কর্তব্য, তবে এই কাজ রাজা একা করবেন না। বেদ, ব্যাকরণ ও ধর্মশাস্ত্রে নিষ্ণাত ব্রাহ্মণগণের সহিত করবেন। রাজার ন্যায়ালয়ই ছিল সর্বোচ্চ। এই ন্যায়ালয়কে কোনো কোনো স্মৃতিগ্রন্থে ধর্মাধিকরণও বলা হয়েছে।

৫.ব্যবহারদর্শনে প্রাড্বিবাক ও তাঁর ভূমিকা

রাজা কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকাই যদি স্বয়ং ব্যবহারদর্শন না করতে পারেন তবে তিনি সভ্যগণের সহিত একজন ব্রাহ্মণকে ঐ কার্যে নিযুক্ত করবেন। দণ্ডবিধান ব্যতীত প্রজারক্ষণ সম্ভব নয়। তাই প্রত্যহ বিচারদর্শন রাজার কর্তব্য, কিন্তু তিনি যদি কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকেন। বিচারকার্যে যাতে ছেদ না পড়ে সেই কারণে তিনি প্রাড্বিবাক নিয়োগ করবেন। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে, যদি

রাজা স্বয়ং বিচারদর্শন করতে না পারেন তবে তিনি উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে এ কাজে নিয়োগ করবেন।[২৯] তবে, যদি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ না মেলে সেক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী এমন ক্ষত্রিয় কিংবা তার অপ্রাপ্তিতে বৈশ্যকে ন্যায়াধীশরূপে নিয়োগ করা যেতে পারে।

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের অপ্রাপ্তিতে ন্যায়াধীশ কে হবেন, সে বিষয়ে স্মৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন বিধান পাওয়া গেলেও প্রায় সর্বত্র শূদ্রের বিচারব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মনু বলেছেন, অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তবুও ন্যায়াধ্যক্ষ হতে পারেন, কিন্তু শূদ্র কখনই নয়। যদি কোনো রাজা এমন করেন তবে সেই রাজ্য পাপে নিমজ্জিত হয়।[৩০] কাত্যায়নও একইভাবে বিচারকাসনে শূদ্রের নিষেধ করেছেন। এই ন্যায়াধীশকে কোথাও ধর্মাধ্যক্ষ, কোথাও প্রাড্বিবাক, কোথাও ধর্মপ্রবক্তা আবার কোথাও ধর্মাধিকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মনুর বর্ণনায় জানা যায় যে, বাদী ও প্রতিবাদীর সম্মুখে সভায় আগত সাক্ষীদের সান্ত্বনাপূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ করায় প্রাড্বিবাক নামটি প্রসিদ্ধ হয়েছে।[৩১] *মিতাক্ষরা*কার প্রাড্বিবাক পদটির ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন যে, অর্থী ও প্রত্যর্থীকে যিনি কিছু জিজ্ঞাসা করেন তিনি প্রাট্, উভয়ের বাক্যবিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ তা সভ্যদের সাথে বিবেচনা করেন বলে তাকে বিবাক বলা হয়। যিনি বিবাদবিষয়ক সবকিছু জিজ্ঞাসা করে সভ্যদের সঙ্গে সযত্নে বিচার করেন তিনি প্রাড্বিবাক।[৩২] *মিতাক্ষরা*কার বিচারসভায় প্রাড্বিবাকের গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে নারদ, বৃহস্পতি প্রমুখ স্মৃতিশাস্ত্রকারদের বচন উল্লেখ করেছেন।

---

[২৯] তুল.,যাজ্ঞ.,২.৩, মনু., ৮.৯

[৩০] জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাদ্ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্মপ্রবক্তা নৃপতের্ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন।। মনু,৮.২০
তুল., ব্রাহ্মণো যত্র ন স্যাত্তু ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জয়েৎ।। কাত্যা.,৬৭

[৩১] সভ্যান্তঃ সাক্ষিনঃ প্রাপ্তানর্থিপ্রত্যর্থিসন্নিধৌ।
প্রাড্-বিবাকোঽনুযুঞ্জীত বিধিনানেন সান্ত্বয়ন্।। মনু.,৮.৭০

[৩২] অর্থিপ্রত্যর্থিনৌ পৃচ্ছতীতি প্রাট্, তয়োর্বচনং বিরুদ্ধম্ অবিরুদ্ধঞ্চ সভ্যৈঃ সহ বিবেচয়তি ইতি বিবাকঃ। - মিতা.,২.৩

ন্যায়ালয়ে প্রাড্বিবাকের প্রয়োজনীয়তা সকল স্মৃতিকারগণই স্বীকার করেছেন। তবে, প্রাড্বিবাক সম্পর্কে তাদের উক্তিগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাড্বিবাকের সঠিক স্থান ন্যায়ালয়ে কি তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। বৃহস্পতিস্মৃতি অনুযায়ী প্রাড্বিবাক ন্যায়ালয়ের প্রধান আধিকারিক। যিনি অর্থী-প্রত্যর্থীকে একাধিক প্রশ্ন করেন এবং নীতিপূর্বক কথা বলেন তিনি প্রাড্বিবাক।[৩৩] আবার *নারদস্মৃতি*তে প্রাড্বিবাকের সম্বন্ধে যে আলোচনা রয়েছে তাতে মনে হয় প্রাচীন কালের প্রাড্বিবাক বর্তমান কালের জুরিদের অনুরূপ ছিলেন। বিচারক যেমন নির্ণয়দান কালে জুরিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের বিশেষ গুরুত্ব দেন তেমনি রাজাও প্রাড্বিবাকের মত অনুসারে বিচার করবেন। নারদের মতে, রাজা ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী, প্রাড্বিবাকের মতের উপর ভিত্তি করে সমাহিত চিত্তে ব্যবহারদর্শন করবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, *মিতাক্ষরা*কার নারদোক্ত প্রাড্বিবাক সম্বন্ধীয় আলোচ্য শ্লোকটি টীকায় উল্লেখ করেছেন এবং 'প্রাড্বিবাকমতে স্থিতঃ' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি প্রাড্বিবাককে চরের সাথে তুলনা করেছেন। রাজা যেমন চরের চোখ দিয়ে পরসৈন্য দর্শন করেন তেমনি বিচারদর্শনকালে প্রাড্বিবাকের মত অনুসারে সিদ্ধান্ত নেবেন।[৩৪] পরিশেষে এ কথা বলা যায়, রাজা কার্যবশতঃ বিচারদর্শনে অসমর্থ হলে শাস্ত্রে পারদর্শী যে ব্রাহ্মণকে বিচার করার জন্য নিয়োগ করেন তিনি প্রাড্বিবাক। তিনি রাজার অবর্তমানে বিচারদর্শন করেন। স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী ন্যায়ালয়ে অপর একজন বিশিষ্ট আধিকারিক হলেন প্রাড্বিবাক। সম্ভবতঃ তার স্থান এবং মহত্ত্ব ছিল বিচারকেরই ন্যায়।

৬.বিচারদর্শনে সভ্যগণের ভূমিকা ও গুণাবলী

স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী বিবাদের নির্ণয় করার জন্য ন্যায়ালয় স্থাপন করা হত। সেখানে বিচারক ব্যাতীত বিচার সম্বন্ধীয় নানা কার্যের জন্য বিভিন্ন কর্মচারী নিয়োগ করা হত। বিবাদের

---

[৩৩] বিবাদে পৃচ্ছতি প্রশ্নং প্রতিপ্রশ্নং তথৈব চ।
প্রিয়পূর্বং প্রাগ্বদতি প্রাড্বিবাকস্ততঃ স্মৃতঃ।। বৃহ.,৬৯

[৩৪] ...প্রাড্বিবাকমতে স্থিতো ন স্বমতে স্থিতো রাজা চারচক্ষুষা পরসৈন্যং পশ্যতীতিবত্। মিতা.,২.৩

নির্ণয় ন্যায়াধীশ করলেও বিবিধ কার্যে সহকারীরূপে বহু কর্মচারীর প্রয়োজন হত। ন্যায় প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে, বিচারের বিষয়টি লিখিত আকারে সংশোধন করতে, বাদী-প্রতিবাদীকে আহ্বান করতে, সাক্ষীকে ডাকতে, বিচারসভার নির্ণয় পালন করানোর জন্য আদালতে বিভিন্ন কর্মচারী নিযুক্ত করা হত।

ব্রাহ্মণই মুখ্যতঃ সভ্যরূপে নিযুক্ত হতেন। মনু ও বৃহস্পতির মতে যে সভায় মুখ্য ন্যায়াধীশের সহিত বেদপারঙ্গম তিন জন ব্রাহ্মণ অবস্থান করেন সেই সভা ব্রহ্মসভা বা যজ্ঞসভার সমান।[৩৫] সভ্যসম্বন্ধীয় এই উক্তিদ্বারা বোঝা যায় যে সভ্যরূপে ব্রাহ্মণকেই তারা নিযুক্ত করতে চেয়েছেন। অন্যবর্ণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সভ্যগণ একমত হয়ে বিচারে নির্ণয়দান করবেন। তবেই বিচারপ্রার্থীদের মনে কোনো শঙ্কা থাকে না।

এছাড়াও বিচারব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকতেন যারা তা হল – প্রাড্বিবাক, গণক, লেখক, ধর্মস্থ, প্রতিভূ, পুরোহিত, কালপাশিক, দণ্ডপাশিক, ঘাতক প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এপ্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, বিচারসভায় কারা উপস্থিত থাকবেন সে বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রকারের ভিন্ন ভিন্ন মতামত দেখা যায়। বৃহস্পতি রাজার ন্যায়সভার দশটি অঙ্গের মধ্যে লেখক ও গণকের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৬] নারদ ব্যবহারের আট অঙ্গের উল্লেখ করেছন। রাজা, সভ্যগণের পাশাপাশি গণক, লেখকেরও ব্যবহার কার্যে প্রয়োজন তা নারদের উক্তি থেকে সহজেই বোঝা যায় (না.স্মৃ.,১.১৫)।

কাত্যায়ন রাজাকে মামলার নির্ণয় করতে নীতিশাস্ত্রের পণ্ডিত, ন্যায়াধীশ, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, দান্তো, কুলিন, মধ্যস্থ, অনুদ্বেগকর ও স্থির এই পঞ্চ গুণযুক্ত ব্যক্তির সহায়তা নেওয়ার

---

[৩৫] যস্মিন্ দেশে নিষীদন্তি বিপ্রা বেদবিদস্ত্রয়ঃ।
রাজশ্চাধিকৃতো বিদ্বান্ ব্রহ্মণস্তাং সভাং বিদুঃ।। মনু.,৮.১১
তুল. লোকবেদাঙ্গধর্মজ্ঞাঃ সপ্ত পঞ্চ ত্রয়োঽপি বা।
যত্রোপবিষ্টা বিপ্রাগ্যাঃ সা যজ্ঞসদৃশী সভা।। বৃহ.,৪৯

[৩৬] নৃপোঽধিকৃতসভ্যাশ্চ স্মৃতির্গণকলেখকৌ।
হেমাগ্ন্যমুখপুরুষাঃ সাধনাঙ্গানি বৈ দশ।। বৃহ.,৮৭

পরামর্শ দিয়েছেন।[৩৭] রাজা রাজসভায় কাদের সহায়তা নিয়ে বিচার করবেন, তা বলার পাশাপাশি এই সভ্যগণের আবশ্যিক গুণাবলীরও উল্লেখ করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, রাজা ন্যায়সভায় ধর্মজ্ঞ, সত্যবাদী, বেদ-মীমাংসা-ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, শত্রুমিত্রে সমদৃষ্টিবান্ কয়েকজন ব্রাহ্মণকে সভাসদরূপে নিয়োগ করবেন।[৩৮] বিচারসভার সভ্যবৃন্দ কেমন হবেন তা এই শ্লোকে যাজ্ঞবল্ক্য আলোচনা করেছেন। শ্রুত ও অধ্যয়ন এই দুটি শব্দের অর্থ হল মীমাংসাব্যাকরণাদিশাস্ত্র শ্রবণ ও বেদাধ্যয়ন। সুতরাং শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না শব্দের অর্থ হল যারা বেদ, ব্যাকরণ, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে নিষ্ণাত। ধর্মজ্ঞশব্দের অর্থ হল ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ। সত্যকথা বলাই যাদের স্বভাব। শত্রুমিত্রে যারা সমান অর্থাৎ যারা রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি দোষরহিত। এইরূপ সভাসদগণ যাতে সভায় উপবেশন করেন তার জন্য রাজা সচেষ্ট হবেন। কারণ সভাসদশব্দের অর্থ হল সভায়াং সীদন্তি উপবিশন্তি। মূলশ্লোকে সভাসদগণ কোন জাতীয় হবেন তা উল্লেখ না করা হলেও এখানে ব্রাহ্মণগণকেই বুঝতে হবে। ধর্মজ্ঞব্যক্তি নিযুক্তই হন বা অনিযুক্ত হন তিনি বিচারবিষয়ে কথা বলার অধিকারী। এই সভাসদগণ যেহেতু বিচারকার্যে রাজাকর্তৃক নিযুক্ত হন তাই রাজা যদি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে তাহলে রাজাকে নিবারণ করবেন। নাহলে তাঁদেরই দোষ হবে। অন্যায়পথগামী রাজাকে যে সভাসদগণ অনুগমন করেন তারা সেই রাজার পাপের ভাগী হন। সুতরাং রাজাকে সৎবুদ্ধি দান করা তাদের কর্তব্য। বিচারসভায় অনিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ যদি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ভুল পরামর্শ দেন তাহলে তাদের দোষ গণ্য হবে। কিন্তু রাজাকে নিবারণ না করলে তাদের দোষ হবে না। বৃহস্পতির মতে, যে ব্যক্তি লোকব্যবহার জানে এবং বেদবেদাঙ্গ ও ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত তাকে সভ্যপদে নিযুক্ত করতে হবে। এইরূপ সাত, পাঁচ বা তিন জন সভ্য নিয়োগ কর্তব্য।[৩৯]

---

[৩৭] কাত্যা.,৫৫-৫৭

[৩৮] শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না ধর্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্যা রিপৌ মিত্রে চ যে সমাঃ।। যাজ্ঞ., ২.২

[৩৯] লোকবেদাঙ্গধর্মজ্ঞাঃ সপ্ত পঞ্চ ত্রযোঽপি বা।
যত্রোপবিষ্টা বিপ্রাদ্যাঃ সা যজ্ঞসদৃশী সভা।। বৃহ., ৫৯

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য তাঁর *মিতাক্ষরা*টীকায় রাজার বিচার সভায় সভাসদরূপে কারা উপস্থিত থাকবেন, যাজ্ঞবল্ক্যের এই সম্বন্ধীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সভায় কিছু বণিক সভাসদকেও রাখার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, আলোচ্য শ্লোকের (যাজ্ঞ.স্মৃ.-২.২) 'রিপৌ মিত্রে চ' এই অংশে 'চ'কারের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে রাজা লোকগণের সন্তুষ্টির জন্য সভায় কিছু বণিক সভাসদও রাখবেন। টীকাকার এ প্রসঙ্গে কাত্যায়নের বচন উদ্ধৃত করেছেন। বিচারসভায় বংশ, চরিত্র, বয়স, ভালো জীবিকা এবং ধন আছে যাদের এমন মাৎসর্যহীন বণিকগণ অধিষ্ঠিত থাকবেন এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪০]

৭.বিচারসভার স্বরূপ ও প্রকার

যেখানে রাজা, ধর্মাধিকারিকারীগণ একত্রে বসে ধর্মশাস্ত্রানুসারে ছল দূর করে ন্যায় বা সত্য উদ্ধার করেন সেই স্থানকে ধর্মাধিকরণ বা ন্যায়ালয় বলা হয়। বৈদিক সংহিতায় বিচার করার জন্য সভার বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক মন্ত্র হতে জানা যায় যে, সভা বিশেষতঃ ন্যায়সম্বন্ধী কাজ করত। সভা ন্যায় বিধান করে, পাপের নাশ করে। 'ধর্মায় সভাচরম্' (যজু.৩০.৬) – *যজুর্বেদের* এই মন্ত্রাংশে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সভার সদস্য ধর্ম স্থাপনের জন্য বলি দেয়। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে ও স্মৃতিতে সভার বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে। প্রাচীন গ্রন্থগুলির অনুশীলনে ন্যায়সভা বিষয়ে জানা যায়। *বৌধায়নধর্মসূত্রে* (১.১.৮) ব্যবহার পরিষদের উল্লেখ আছে, যা প্রকৃতপক্ষে ন্যায়সভা। *রামায়ণ, মহাভারতের* সময়েও সভার উল্লেখ পাওয়া যায়। অযোধ্যায় রাজসভা ন্যায়সভারূপে বর্ণিত হয়েছে। এই সভার অধ্যক্ষ হতেন রাজা।[৪১] *মহাভারতের* শান্তিপর্বে গ্রামণীর নির্বাচন বর্ণিত হয়েছে। তিনি গ্রামের প্রশাসন এবং ন্যায় উভয় বিভাগেরই দেখা শোনা করতেন। এই দৃষ্টিতে পদটি ছিল বহু মহত্বপূর্ণ।[৪২] ন্যায়ালয়ে একজন ন্যায়াধীশের সাথে অনেক

---

[৪০] রিপৌ মিত্রে চ ইতি চকারাত্ লোকরঞ্জনার্থং কতিপয়ৈঃ বণিগ্ভিঃ অপি অধিষ্ঠিতং সদঃ কর্তব্যং, যথাহ কাত্যায়নঃ - কুলশীলবয়োবৃত্তবিত্তবদ্ভিরমৎসরৈঃ। বণিগ্ভিঃ স্যাত্ কতিপয়ৈঃ কুলভূতৈরধিষ্ঠিতম্ ইতি। মিতা.,২.২

[৪১] রামা.,৭.৫৯.১,৭.৫৩.৩

[৪২] মহা.শান্তি.,২১.১

ধর্মবিৎ থাকত। বেদের এবং ধর্মশাস্ত্রের দশজন বিদ্বান্ ও তিনজন ধার্মিক পণ্ডিত তাতে সম্মিলিত থাকত। তাদের সকলের সম্মতিতে ন্যায়বিচার করা হত (শান্তি.৩৬.২০.৬)। এ থেকে স্পষ্ট যে, ঐতিহাসিক মহাকাব্যের যুগেও ন্যায়সভার বিকাশ হয়েছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে ন্যায়ালয়ের সংগঠনের বিস্তৃত বর্ণনা দেখা যায়। রাজার ন্যায়ালয় ছিল সর্বোচ্চ। তাকে সভা, ধর্মসভা বা ধর্মাধিকরণ বলা হত। কাত্যায়ন বলেন ধর্মশাস্ত্র বিচার করে তার মূলানুসারে যেখানে ন্যায় বিবেচনা করা হয় সেই স্থানই ধর্মাধিকরণ।[৪৩]

ন্যায়ালয়ের নাম ছিল সভা। বৃহস্পতি রাজ্যে স্থিত এই সভাকে তাদের স্বরূপ ও অবস্থানের দিক দিয়ে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন- প্রতিষ্ঠিত, অপ্রতিষ্ঠিত, মুদ্রিত, শাসিত।[৪৪] কোনো গ্রাম বা নগরে স্থাপিত ন্যায়ালয় হল প্রতিষ্ঠিত ন্যায়ালয়। নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত নয়, এমন বিচারসভা প্রয়োজনানুযায়ী যার স্থান পরিবর্তিত করা হয় তা অপ্রতিষ্ঠিত ন্যায়ালয়। যে বিচারসভার বিচারক রাজার দ্বারা নিযুক্ত এবং যিনি রাজার সীলমোহর ব্যবহার করতে পারেন তাকে বলা হয় মুদ্রিত ন্যায়ালয়। যে বিচারসভায় রাজা স্বয়ং বিচার করেন তাকে বলা হয় শাসিত ন্যায়ালয়।[৪৫]

যে ন্যায়ালয়ে রাজা স্বয়ং বিচার করেন কিংবা রাজানিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বিচার করেন তাকেই সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় বলা হলেও স্মৃতিতে অন্য কিছু বিচারসভার উল্লেখও পাওয়া যায়। যেখানে গ্রামসভার সদস্যগণ মিলিতভাবে গ্রামের কোনো বিবাদের নিষ্পত্তি করতে পারতেন, এছাড়াও বণিকগণ, শিল্পীগণ নিজেদের যে কোনো বিবাদের বিচার করতে সক্ষম ছিলেন। কৃষক, ব্যাপারী, পশুপালক, শিল্পী প্রভৃতির সঙ্ঘ প্রাচীন ভারতে ছিল এবং তাদের নিজস্ব আইনও ছিল। সেই নিয়ম অনুসারেই সঙ্ঘের সদস্যদের বিবাদের নিরসন করা হত।

---

[৪৩] ধর্মশাস্ত্রবিচারেণ মূলসারবিবেচনম্।
যত্রাধিক্রিয়তে স্থানং ধর্মাধিকরণং হি তৎ।। কাত্যা.৫২

[৪৪] প্রতিষ্ঠিতাপ্রতিষ্ঠা চ মুদ্রিতা শাসিতা তথা।
চতুর্বিধা সভা প্রোক্তা সভ্যাশ্চৈব তথাবিধাঃ।। বৃহ.১.৫৭

[৪৫] Hist.Dh., Vol.-3,P.277

গৌতম বলেছেন কৃষক, ব্যবসায়ী, মহাজন, পশুপালক, শিল্পী প্রভৃতি ব্যক্তিরা নিজ নিজ বর্গে বিবাদের সম্বন্ধে অধিকারী হবেন।[৪৬] তাঁরা তাঁদের রীতি ও ঐতিহ্য অনুসারে বিবাদের নির্ণয় নিজ নিজ বর্গের মধ্যে করতে পারতেন। নিজবর্গের মধ্যে ধর্মকে সাক্ষী করে নিজ নিজ বিবাদের বিচার করলে, তা তাঁদের পক্ষেই শ্রেয়। কারণ নির্দিষ্টজাতি বা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও সকল নিয়ম অন্য সম্প্রদায়ের কারোর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে জানা সম্ভব নয়। তাই তাদের বিবাদের নির্ণয় অন্যসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির দ্বারা করা সম্ভব নয়। বরং ঐ জাতির ঐতিহ্য জানে এমন ব্যক্তির দ্বারাই তা নির্ণয় করা উচিত। স্মৃতিশাস্ত্রে কুল, শ্রেণী এবং গণ বা পূগ- এই তিন প্রকার বিচারসভার উল্লেখ রয়েছে। কুল, শ্রেণী, গণ, রাজার দ্বারা মকদ্দমা নিরীক্ষণে নিযুক্ত পুরুষ এবং স্বয়ং রাজা – এই হল ব্যবহার নির্ণয়ের স্থান। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, রাজার দ্বারা ব্যবহারদর্শনে নিযুক্ত ভিন্নজাতির ও ভিন্নবৃত্তির একস্থানবাসী বিচারকগণ (পূগ) ভিন্নজাতির অথচ সমানবৃত্তির বিচারকগণ (শ্রেণী), এবং জ্ঞাতিসম্বন্ধি-বন্ধুবর্গের সমষ্টি (কুল) এই প্রকার বিচারকগণের মধ্যে ব্যবহারদর্শন কার্যে পূর্বে পূর্বে পঠিত বিচারকগণ বলবান বলে জানতে হবে।[৪৭] এবিষয়ে *নারদস্মৃতিতে*ও একই উক্তি মেলে। নারদ বলেছেন – কুল, শ্রেণী, গণ, রাজার দ্বারা অবস্থাপিত অধিকারী পুরুষ এবং স্বয়ং রাজা ব্যবহারের নির্ণয় করতে পারেন। এদের মধ্যে পরবর্তী পূর্ববর্তী অপেক্ষা প্রবল।[৪৮]

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, ব্যবহার নিরীক্ষণের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে চারটি স্তর হল- রাজার দ্বারা নিযুক্ত ন্যায়াধীশ, পূগ, শ্রেণী, কুল। *মিতাক্ষরা*কার পূগ, শ্রেণী ও কুল বলতে কি বোঝায় তা টীকায় যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন। পূগ হল ভিন্নজাতীয় ভিন্নবৃত্তি একস্থানবাসী মনুষসমূহ- একগ্রামবাসী বা একনগরবাসী। শ্রেণী হল নানাজাতীয় বা একজাতীয় এককার্যকারী ব্যক্তিসমূহ। যেমন-হেডাবুক- যারা অন্যদেশে গিয়ে অশ্ব বিক্রয় করে, তাম্বুলিক-যারা পান বিক্রয়

---

[৪৬] কর্ষকবণিক্পশুপালককুসীদককারবঃ স্বে স্বে বর্গে। গৌ.ধ.সূ.,২.২.২১

[৪৭] নৃপেণাধিকৃতা পূগাঃ শ্রেণযোঽথ কুলানি চ।
পূর্বং পূর্বং গুরু জ্ঞেয়ং ব্যবহারবিধৌ নৃণাম্।। যাজ্ঞ.,২.৩০

[৪৮] কুলানি শ্রেণযশ্চৈব গণাশ্চাধিকৃতো নৃপঃ।
প্রতিষ্ঠা ব্যবহারাণাং পূর্বেভ্যস্তূত্তরোত্তরম্।। নারদ.,১.৭

করে, কুবিন্দ-যারা তন্তুবায়, চর্মকার- যারা চামড়ার ব্যবসা করে। কুল হল জ্ঞাতিসম্বন্ধি ও বন্ধুগণের সমূহ।[৪৯] অর্থাৎ গ্রাম বা নগর বা জনপদে সকল প্রকারের ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন বৃত্তির প্রতিনিধিরা থাকতেন। তাদের সমস্ত ছোট ছোট বিবাদের নিষ্পত্তি করার অধিকার থাকতো। জাতিগত শ্রেণী ও ব্যবসাগত শ্রেণী সম্বন্ধিয় বিবাদের নিষ্পত্তি সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর প্রতিনিধি করতেন। একান্নবর্তী পরিবারের বিবাদকে কুলের বৃদ্ধ প্রতিনিধি নিষ্পত্তি করতেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য কুল প্রভৃতির বিচারে বাদী বা প্রতিবাদী সন্তুষ্ট না হলে সেই নির্ণয়ের বিরুদ্ধে পুনর্বিচারের জন্য আবেদন করার ব্যবস্থা স্মৃতিতে বিহিত হয়েছে। শ্রেণীর বিচারসভায় বিবাদের নির্ণয়ে সন্তুষ্ট না হলে তিনি পূগে পুনর্বিচারের জন্য আবেদন করতে পারতেন। পূগ বা জনপদের নির্ণয়ে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিকর্তৃক বিষয়টিকে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আনা যেত। তবে বিপরীত ক্রমে ব্যবহারদর্শনরূপ কার্যে অধিকৃত সভাসদগণ যে ব্যবহারটি নিষ্পত্তি করেছেন সেই বিচারে যদি পরাজিত ব্যক্তির অসন্তোষ হয় তবে সে পূগ, শ্রেণী প্রভৃতির কাছে পুনর্ব্যবহারের আবেদন করতে পারতেন না।[৫০]

কুল, শ্রেণী, পূগ এগুলির সংজ্ঞা স্মৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রায় সকল স্মৃতিতেই উচ্চ-নিম্নভেদে ন্যায়ালয়ের এই সংগঠনের কথা বলা হয়েছে। মনু গ্রামে সংঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তি গ্রামাধিপতিকে করতে বলেছেন। তিনি তা না পারলে দশগ্রামাধিপতির কাছে নিবেদন করতে হবে। দশগ্রামাধিপতি প্রয়োজন হলে সেগুলি বিংশতিগ্রামাধিপতির কাছে, প্রয়োজনে তিনি শত গ্রামাধিপতির কাছে এবং তিনিও সহস্রগ্রামাধিপতির কাছে বিবাদের বিষয়টি জানাতে পারতেন। মনুও স্থানীয় অঞ্চলেই বিবাদের নিষ্পত্তির ওপরে সবিশেষ জোর দিয়েছেন।[৫১] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য,

---

[৪৯] পূগাঃ সমূহাঃ ভিন্নজাতীনাং ভিন্নবৃত্তীনামেকস্থানবাসীনাং যথা গ্রামনগরাদয়ঃ,...কুলানি জ্ঞাতিসম্বন্ধিবন্ধূনাং সমূহাঃ। মিতা.,২.৩০

[৫০] নিপাধিকৃতৈর্নির্ণীতে ব্যবহারে পরাজিতস্য যদ্যপ্যসন্তোষঃ... ন পূগাদিষু পুনর্ব্যবহারো ভবতি। এবং পূগনির্ণীতেঽপি ন শ্রেণ্যাদিগমনম্। তথা শ্রেণিনির্ণীতে কূলগমনং ন ভবতি।–মিতা.,২.৩০

তুল., নারদ.,১.৭

[৫১] মনু.,৭.১৬-১১৭

এই গ্রামাধিপতিগণের বেতন কিরূপ হবে সে বিষয়ে মনুর যে উক্তি মেলে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টীকাকার কুল্লূকভট্ট 'কুল' কথাটির সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি লক্ষণ করেছেন। তাঁর মতে দুটি হলযুক্ত চারটি গরুর দ্বারা যত ভূমিকর্ষণ করা যেতে পারে তাকে কুল বলে। কাত্যায়নও কুলবিষয়ে ভিন্ন মত দিয়েছেন।[৫২]

বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে ন্যায়ালয়ের স্থানীয় সংগঠনকে স্মৃতিতে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও এই সকল ন্যায়ালয়গুলিও কিন্তু বিচারের ঊর্ধ্বে ছিল না। স্থানীয় এই ন্যায়ালয়গুলির নির্ণয় ও নিয়মগুলি রাজ্যবাসী দ্বারা মেনে নেওয়া হত। তবে কোনো সংগঠন নিজ নিয়ম পালন না করলে, কর্তব্যের ত্রুটি করলে, অযোগ্যতা বা ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করলে কুল, জ্ঞাতি, শ্রেণি, গণ, জানপদ-এর প্রতিনিধিদের রাজা সঠিক পথে স্থাপন করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ রাজা স্বধর্ম থেকে স্খলিত সদস্যদের যথাবিধি দণ্ড দিয়ে স্বধর্মের পথে স্থাপন করতেন।[৫৩] স্মৃতিতে কুল, শ্রেণী, পূগ এই স্থানীয় ন্যায়ালয়গুলিকে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। নিজস্ব নিয়মে নিজগোষ্ঠীর বা সংগঠনের বিবাদের মীমাংসা করার অধিকার এই সকল ন্যায়ালয়গুলির ছিল। ন্যায়ালয়গুলির সদস্যগণ ধর্মের মাধ্যমেই সঠিক নির্ণয় দান করতেন কারণ তারাও বিচারের ঊর্ধ্বে ছিলেন না এবং তাদের নির্ণয়ও পুনর্বিচারের ঊর্ধ্বে ছিল না। কুলাদি এই ন্যায়ালয়গুলির অপর একটি সীমাবদ্ধতার উল্লেখও স্মৃতিতে মেলে। তা হল, নিম্ন এই ন্যায়ালয়গুলিতে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ন্যায় সকল বিবাদের নিষ্পত্তি করার অধিকার ছিল না।[৫৪]

সুবিশাল রাজ্যে প্রজাগণের প্রভূত বিবাদের মীমাংসা একটিমাত্র সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে সম্ভব ছিল না। তাই সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা স্থাপনে এই সকল ন্যায়ালয়গুলির ভূমিকা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এই ন্যায়ালয়গুলি সঠিক নির্ণয় দানের মাধ্যমেই রাজ্যের বিচারব্যবস্থা ধীর তথা স্থির হয়ে যেত না। স্মৃতিতে বর্ণিত ন্যায়ালয়ের এই ভেদকে বর্তমানকালের জেলা আদালত, হাইকোর্ট,

---

[৫২] Hist.Dh.,Vol.3,P.283

[৫৩] কুলানি জ্ঞাতীঃ শ্রেণিশ্চ গণান্ জানপদাংস্তথা।
স্বধর্মচলিতান্ রাজা বিনীয় স্থাপয়েত্ পথি।। যাজ্ঞ.,১.৩৬১

[৫৪] Hist.Dh.,vol.3,P.281

সুপ্রিমকোর্ট- বিচারব্যবস্থার এই স্তরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতের বিচারব্যবস্থার স্তর সম্পর্কে অল্টেকার বলেছেন, বিচারব্যবস্থার এই সংগঠন, গ্রামের লোকপ্রিয় কোর্ট এই গুলির যথেষ্ট সামাজিক গুরুত্ব ছিল। এইগুলি অরাজনৈতিক ছিল এবং জনতার মধ্যে তা অধিক লোকপ্রিয় ও স্বীকৃত ছিল।[৫৫]

৮.ব্যবহারদর্শন পদ্ধতি

মানুষ যখন ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং সত্য কথা বলতেন, তখন কারো মনে কোনো হিংসা বা দ্বেষ বা ঈর্ষ্যা ছিল না। ফলে ব্যবহারদর্শনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মানুষ মিথ্যে বলতে থাকলে কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষ্যা করতে থাকলে ধর্ম নষ্ট হওয়ায় ব্যবহারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাজা ছিলেন ধর্মের রক্ষাকর্তা। প্রজারা ন্যায়ার্থী হয়ে নিজের আবেদন বিচারালয়ের সমক্ষে জানাতেন, তারপর বাদী-প্রতিবাদী উভয়কে বিচারসভায় আহ্বান করে তাদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে, প্রমাণাদি প্রদর্শনের দ্বারা অপরাধীকে চিহ্নিত করে তাকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করা হত। এই সম্পূর্ণ কার্যটি রাজা অথবা বিচারকাসনে আসীন ব্যক্তি (প্রাড্বিবাক) ধর্মশাস্ত্রানুসারে সম্পন্ন করতেন।

স্মৃতিশাস্ত্রমতে রাজা বস্ত্রাদির দ্বারা শরীর আবৃত করে ধর্মাসনে উপবেশন করে একাগ্রচিত্তে লোকপালগণকে প্রণাম করে কার্যদর্শনের অর্থাৎ অর্থী-প্রত্যর্থীর ঋণাদানাদিবিষয়ক বিচারের উপক্রম করবেন।[৫৬] একই সাথে অনেকে বিচারপ্রার্থী হলে এবং যদি সকলেরই অসুবিধা বা পীড়ার পরিমাণ সমান হয় তবে রাজা বর্ণক্রমের অনুসরণ করবেন। ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ তাই রাজা ব্রাহ্মণের বিবাদের মীমাংসা পূর্বে করবেন।[৫৭] কিন্তু *মনুসংহিতার* প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লূকভট্ট

---

[৫৫] A.S.Altekar,State and government in ancient India.,P.138

[৫৬] ধর্মাসনমধিষ্ঠায় সংবিতাঙ্গঃ সমাহিতঃ।
প্রণম্য লোকপালেভ্যঃ কার্যদর্শনমারভেত্।। মনু.,৮.২৩

[৫৭] বর্ণক্রমেণ সর্বাণি পশ্যেত্ কার্যাণি কার্যিণাম্।। মনু.,৮.২৪

*মন্বর্থমুক্তাবলী*টীকায় কেবল তখনই বর্ণক্রমে বিচার নির্ণয় করতে বলেছেন যখন বিচারপ্রার্থীরা সকলেই সমপীড়ায় পীড়িত। কিন্তু যখন কেউ অধিক পীড়ায় পীড়িত হয়ে বিচারের আবেদন করে তখন রাজা বর্ণক্রম অনুসরণ করবেন না। তাঁর মতে, অনেক লোক একসময় নালিশ জানাতে এসেছে এরকম পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে তাঁদের মোকদ্দমা নিতে হবে। তবে বর্ণক্রমে মোকদ্দমা গ্রহণ করাটা তখনই উচিত যখন তাতে অসুবিধা বা কষ্ট সকলকে তুল্যভাবে ভোগ করতে হয়। কিন্তু একজন শূদ্রের নালিশ যদি জরুরী হয়, বিলম্ব হলে যদি গুরুতর অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে অথবা শূদ্রের মোকদ্দমা যদি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে নিয়ম অনুসারে অধিক পীড়ার মামলাটিকেই প্রথমে গ্রহণ করতে হবে, সেখানে উচ্চবর্ণাদিক্রমের প্রাধান্য থাকবে না।[৫৮]

বিচারব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হল রাজ্য রক্ষা, আর্তব্যক্তি যথা সময়ে বিচার না পেলে বিচারব্যবস্থার সেই উদ্দেশ্যটি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা হয়ে পড়ে, তাই টীকাকার এমন ব্যবস্থার কথা বলেছেন। এবিষয়ে কাত্যায়নও একই কথা বলেছেন। কাত্যায়নের মতে- বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে কার আবেদন পূর্বে গ্রহণ করা হবে সেবিষয়ে বর্ণক্রম অনুসরণ বাঞ্ছনীয় নয়। তিনিও বিচারপ্রার্থীর ক্ষতির গুরুত্বের উপরে ভিত্তি করে ব্যবহার নির্ণয় করতে বলছেন। তাঁর মতে, কোনো ব্যক্তি পূর্বে আবেদন করলেও যদি তার পরে আসা ব্যক্তির নালিশের বিষয়টি গুরুতর হয় তবে বিচারক পশ্চাতে আগত ব্যক্তির আবেদনটি পূর্বে গ্রহণ করবেন।[৫৯] বিচারের বিলম্বের কারণে সম্পদের কিংবা শরীরের ক্ষতির আশঙ্কা হয়ে পড়ে তাই পশ্চাতে আসলেও গুরুতর নালিশ নিয়ে আসা ব্যক্তির আবেদেনটি পূর্বে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

ব্যবহারপ্রক্রিয়াটি একটি নির্দিষ্ট ক্রমে সংঘটিত হয়। সর্বপ্রথমে বাদী বা অর্থী নিজের অভিযোগ বা আবেদন পেশ করেন, প্রত্যর্থী উত্তর প্রদান করেন, উভয়ে নিজের বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণাদি পেশ করে, সর্বশেষে বিচারালয়ের সদস্যগণ বিচার-বিমর্শ করে নির্ণয় দান করেন। এই

---

[৫৮] ...ধর্মাধর্মৌ কেবলাবরুনুরুধ্য যথা বিরোধো ভবতি তথা কার্যার্থিনাং কার্যাণি পশ্যেত্। বহুবর্ণমেলনে তু ব্রাহ্মণাদিক্রমেণ পশ্যেত্। মন্বর্থ.,৮.২৪

[৫৯] যস্য স্যাদধিকা পীড়া কার্যং বাপ্যধিকং ভবেৎ।
পূর্বপক্ষো ভবেত্তস্য ন যঃ পূর্বং নিবেদয়েত্।। কাত্যা.,১২২

চারটি ক্রমকে চতুষ্পাদ ব্যবহার বলা হয়। যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি এই পাদগুলিকে যথাক্রমে ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, ক্রিয়াপাদ ও সাধ্যসিদ্ধিপাদ বলে উল্লেখ করেছেন। কাত্যায়ন চতুষ্পাদ ব্যবহারের পাদগুলিকে যথাক্রমে পূর্বপক্ষ, উত্তর, প্রত্যাকলিত এবং ক্রিয়া বলে উল্লেখ করেছেন।[৬০] এখানে ব্যবহারের চারপাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত নামগুলি অনুসরণ করা হয়েছে।

নারদ ও বৃহস্পতি ভিন্নরূপ চারটি পাদের উল্লেখ করেছেন। নারদের মতে, ধর্ম, ব্যবহার, চরিত্র ও রাজশাসন এগুলি হল ব্যবহারের চারটি অংশ। এদের মধ্যে ধর্ম হতে ব্যবহার, ব্যবহার হতে চরিত্র এবং চরিত্র অপেক্ষা রাজাজ্ঞা শ্রেষ্ট।[৬১] ধর্মশব্দের অর্থ হল সত্য বা সত্যের সপক্ষে শপথ। ব্যবহারের তাৎপর্য হল প্রমাণ। প্রমাণের অভিপ্রায় হল সাক্ষী প্রভৃতির কথা বিচার করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা। ধর্ম ও ব্যবহারের মধ্যে সন্দেহে ব্যবহারকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে ব্যবহার ও চরিত্রের বিরোধে চরিত্রকে অধিক মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

জয়পত্রে যথাযথভাবে সাধ্যবস্তুর উপস্থাপনাযুক্ত উত্তরক্রিয়া ও প্রমাণ উল্লেখ করতে হয়। বাদীর প্রমাণ সিদ্ধ হলে তাকে প্রাড্বিবাকের হস্তাঙ্কমুদ্রিত এবং রাজমুদ্রাচিহ্নিত জয়পত্র দেওয়া হয়। যেখানে সকল সভ্য কোনো সিদ্ধান্তকে সাধু বলে মনে করেন সেখানে বিবাদটি নিষ্কন্টক হয়। বিচারক, সভ্যগণ সন্দেহরহিত হয়ে যার পক্ষে রায়দান করেন সেই জয়ী হয়। সাধ্যবস্তুটি চতুষ্পাদ ব্যবহারের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হলে রাজমুদ্রাঙ্কিত জয়পত্র দেওয়া হয়। যেখানে হীনতা থাকে সেক্ষেত্রে জয়পত্র দেওয়া হয়না।

বৃহস্পতি চরিত্র বা চরিতকে দুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন- প্রথমটি হল, যা অনুমানের দ্বারা নির্ণীত হয় এবং দ্বিতীয়টি হল, যা দেশ ও কালকে ভিত্তি করে নির্দিষ্ট করা হয় তাই হল

---

[৬০] পূর্বপক্ষশ্চোত্তরং চ প্রত্যাকলিতমেব চ।
ক্রিয়াপাদশ্চ তেনায়ং চতুষ্পাদঃ সমুদাহৃতঃ।। কাত্যা.,৩১

[৬১] ধর্মশ্চ ব্যবহারশ্চ চরিত্রং রাজশাসনম্।
চতুষ্পাদ্ব্যবহারোঽয়মুত্তরঃ পূর্বাবাধকঃ।। নারদ.,১.১০

চরিত্র বা চরিত।[৬২] কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ কোনো স্থানে প্রচলিত পরম্পরা হল লোকাচার। যা দেশ ও কাল ভেদে আবার ভিন্ন ভিন্নও হয়ে থাকে। ব্যবহার অপেক্ষা লোকাচারের অধিক শ্রেষ্ঠতা ধর্মশাস্ত্রে প্রদান করা হয়েছে। কারণ লোকপরম্পরার প্রভাব সামাজিক জীবনে অধিক। পরম্পরা সমাজের দৃষ্টিকোণকে স্পষ্ট করে এবং লিখিত আইনের মতো এতে জটিলতা আসে না।

চরিত্র অপেক্ষা আবার রাজাজ্ঞা বা রাজশাসনকে অধিক মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এই রাজাজ্ঞা লোকাচার এবং লোকপরম্পরা হতে অধিক প্রভাবসম্পন্ন ছিল। তবে রাজারা লোকপরম্পরাকে উপেক্ষা করতে পারতেন না। রাজা বা ন্যায়াধীশ ধর্ম, ব্যবহার এবং চরিত্রকে প্রমাণরূপে স্বীকার করে নিষ্পক্ষ ও ন্যায়পূর্ণ নির্ণয় করবেন। শাস্ত্রকারগণের মতে, নির্ণয়ের পর বিজয়ীপক্ষকে জয়পত্র দিলে তবেই সে বিজয়ী বলে ঘোষিত হয়। ন্যায়প্রক্রিয়ার এই চতুর্থচরণ হল নির্ণয়পাদ বা সাধ্যসিদ্ধিপাদ। এই পাদের পরেই ন্যায়প্রক্রিয়া পূর্ণ হয়। কাত্যায়ন বলেছেন, রাজা স্বয়ং মকদ্দমা দেখে কিংবা প্রাড্বিবাকের কাছে শুনে পরিজ্ঞানের জন্য জয়পত্র দেবেন।[৬৩]

তবে সকল বিচারের ক্ষেত্রেই যে বিচারক্রিয়া চার পাদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এমন নয়। যে ক্ষেত্রে অর্থীর অভিযোগ প্রত্যর্থী মেনে নিত সেক্ষেত্রে বিবাদের নিষ্পত্তি সেখানেই হয়ে যেত। যেমন অর্থী যখন বলে এই ব্যক্তি আমার থেকে একশত টাকা ধার নিয়েছে, তখন প্রত্যর্থী বলে সত্যই ধার নিয়েছি। সাধ্যের সত্যতা স্বীকার করে যে উত্তর দেওয়া হয় তা হল সত্য উত্তর। একে সম্প্রতিপত্তি বলা হয়। সম্প্রতিপত্তি উত্তরে সাধন বা প্রমাণ নির্দেশ হয় না এবং ভাষার বিষয়টি অসাধ্য হওয়ায় সাধ্যসিদ্ধিনামক চতুর্থপাদটিও থাকে না তাই এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় দ্বিপাদ। অর্থাৎ দুটি পাদের মধ্যেই বিচারক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

---

[৬২] অনুমানেন নির্ণীতং চারিত্রমিতি কথ্যতে।
দেশস্থিত্যা তৃতীয়স্তু শাস্ত্রবিদ্ভিরুদাহৃতঃ।। বৃহ.,৯.৬

[৬৩] ব্যাবহারান্ স্বয়ং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা বা প্রাড্বিবাকতঃ।
জয়পত্রং ততো দদ্যাত্ পরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ।। কাত্যা.,৪৭৬

৯.ব্যবহারনির্ণয়ে প্রমাণপ্রসঙ্গ

'প্রমীয়তে পরিচ্ছিদ্যতে অনেন' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে যা কোনো কিছুকে পরিচ্ছিন্ন করে বুঝিয়ে দেয় তাকে বলে প্রমাণ। বিচার্যবিষয়ে উভয় পক্ষের মত শ্রবণ করে রাজা সভ্যবৃন্দের সহিত সযত্নে প্রমাণ পর্যবেক্ষণ করবেন। বিচারে সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রমাণ হল একমাত্র অবলম্বন। অর্থীর অভিযোগ শ্রবণ করে প্রত্যর্থী- অর্থীর সম্মুখেই নিজের উত্তর লেখাবে। অর্থী তখনই প্রতিজ্ঞাত অভিযোগে সপক্ষে প্রমাণ প্রদর্শন করে তা লিপিবদ্ধ করাবে।

ধর্মশাস্ত্রকারগণ ন্যায়ব্যবস্থায় দুই প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেছেন- মনুষ্য প্রমাণ ও দৈব প্রমাণ। মানুষ প্রমাণ ত্রিবিধ- লিখিত বা লেখ্য (দলিল প্রভৃতি), ভুক্তি (ভোগদখল) ও সাক্ষী। এই তিন প্রকার মানুষ প্রমাণ যদি না পাওয়া যায় তাহলে দৈবিক বা দিব্যপ্রমাণ অবলম্বন করে বিবাদের নিষ্পত্তি করা হয়।[৬৪] কিন্তু সকল স্মৃতিশাস্ত্রকারই দিব্যপ্রমাণ অপেক্ষা মানুষ প্রমাণের উৎকর্ষ ঘোষণা করেছেন। আচার্য কাত্যায়ন বলেন একপক্ষ যদি মানুষ প্রমাণ দেখায় ও অপরপক্ষ দিব্যপ্রমাণ দেখায় তবে মানুষপ্রমাণ প্রদর্শনকারী পক্ষের প্রমাণই গ্রাহ্য হবে। এমনকি মানুষপ্রমাণের দ্বারা যদি অভিযোগের একাংশও প্রমাণিত হয় তাহলেও তা দৈবপ্রমাণের থেকে বলবত্ বলে গৃহীত হবে। ত্রিবিধ মানুষপ্রমাণের মধ্যে পূর্বের পূর্বেরটি পরের পরেরটি থেকে বেশি প্রধান্য পাবে। লিখিতপ্রমাণ ভুক্তির থেকেও বলবত্ ও ভুক্তি সাক্ষির থেকেও বলবত্ বলে গণ্য হবে। এখন লেখ্য, ভুক্তি ও সাক্ষি ও দৈবপ্রমাণ বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রে যে রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে তা আলোচনা করা হল-

৯.১.মনুষ্যপ্রমাণের স্বরূপ ও প্রকার-

তিন প্রকার মনুষ্য প্রমাণ হল- লিখিত প্রমাণ, ভুক্তি প্রমাণ ও সাক্ষী প্রমাণ। নিম্নে এই তিন প্রকার মনুষ্য প্রমাণের নিয়মবিধি ও স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

---

[৬৪] প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতম্।
এষামন্যতমাভাবে দিব্যতমমুচ্যতে।। যাজ্ঞ.,২.২২
দ্র. লিখিতং সাক্ষিণো ভুক্তিঃ প্রমাণং ত্রিবিধং স্মৃতম্।। কাত্যা.,২২৩

৯.১.১.লিখিতপ্রমাণের স্বরূপ

দান, ঋণদান ইত্যাদি বিবাদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য লেখ্যপত্র রচনা করা হয়। বিষ্ণু, রাজসাক্ষিক, স্বসাক্ষিক এবং অসাক্ষিক ভেদে লিখিত প্রমাণকে তিন প্রকার বলেছেন। যে শাসনের দ্বারা স্বীকৃত কায়স্থের বা ন্যায়ালয়ের মাধ্যমে মুদ্রাযুক্ত করা হয় তাকে রাজসাক্ষিক লেখ বলে। কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষি রেখে পরস্পর ব্যবহারের জন্য লিখিত লেখকে বলা হয় সসাক্ষিক লেখ। এই লেখে সাক্ষির হস্তাক্ষর থাকে। নিজের হাতে লিখিত লেখে সাক্ষি না থাকায় তাকে অসাক্ষিক লেখ বলে।[৬৫] যাজ্ঞবল্ক্যের মতে অধমর্ণের নিজের হস্তে লিখিত লেখ্যপত্রটি অসাক্ষিক হলেও তা প্রমাণ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু স্বহস্তলিখিত হলেও কেউ যদি অধমর্ণকে দিয়ে লেখ্য রচনা করায় অথবা লেখ্য রচনার পেছনে যদি ছল, লোভ, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি থাকে তবে সেই লেখ্য প্রমাণ বলে গণ্য হবে না। লেখ্য মার্জিত ভাষায় রচিত হবে- এর পাশাপাশি নিজ নিজ দেশের প্রচলিত ভাষাতেও লিখিত হতে পারে। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার* আচারঅধ্যায়ে গ্রন্থকার দুই প্রকার লিখিত প্রমাণের কথা বলেছেন- শাসনলেখ্য ও জানপদ বা চীরক।

শাসনলেখ্য- *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির* আচারাধ্যায়ে শাসনলেখ্য সম্পর্কিত আলোচনায় রাজা কখন কখন লেখ্য রচনা করবেন, লেখ্যপত্রে কি কি তথ্য সন্নিবেশিত করবেন, লেখ্যপত্রটি কিরূপ দ্রব্যে লিখিত হবে, লেখের নানা প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৬৬] এবিষয়ে আচারাধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, ভূমিদান প্রভৃতি কোনো বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার সময়ে রাজা পরবর্তী রাজাদের অবগতির জন্য লেখ্য রচনা করাবেন। কার্পাসপটে অথবা তাম্রফলকে রাজা নিজবংশীয় পিতা প্রভৃতি তিনপুরুষের নাম, নিজের নাম, গ্রহীতার নাম, দাতব্যবস্তুর পরিমাণ, গ্রামক্ষেত্রাদির

---

[৬৫] তত্র লেখ্যং ত্রিবিধং রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ। রাজাধিকরণে সদিনমুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্ । যত্ ক্বচন যেন কেনচিদ্ অলক্ষিতং সাক্ষিভিঃ স্বহস্তচিহ্নিতং সাক্ষিকম্। স্বহস্তলিখিতমসাক্ষিকম্। বি.ধ.সূ.,৭.১-৫

[৬৬] দত্ত্বা ভুমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যং তু কারয়েৎ।

...

স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েত্ স্থিরম্।। যাজ্ঞ.,২.৩১৮-৩২০

চতুঃসীমা ও পরিমাণ লেখাবেন। ঐ দানপত্রে সন, তারিখের উল্লেখ থাকবে ও রাজা নিজে স্বাক্ষর করে নিজমুদ্রা চিহ্নিত করাবেন। এইভাবে শাসনরূপলেখ্য রচিত হয়। শাসনলেখ্য কেবল রাজার দ্বারাই রচিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যদিও দানের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহীতা দানের ফললাভ করে তথাপি শাসনলেখ্য রচনার প্রয়োজন হল যাতে দাতার অবর্তমানেও গ্রহীতা বা তৎপুত্রাদি ঐ দানের ফল ভোগ করতে পারে।

জানপদলেখ্য- জনপদবাসী বা সাধারণ দেশবাসী ঋণাদান প্রভৃতিক্ষেত্রে যে লেখ্য রচনা করে তাকে জানপদ বা চীরক লেখ্য বলে। এই জানপদলেখ্য সাক্ষীরহিত স্বহস্তকৃত হতে পারে আবার সাক্ষীসহিত অন্যকৃত হতে পারে। ঋণাদির ক্ষেত্রে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ পরস্পরের ইচ্ছা অনুসারে যে লেখ্যপত্র রচনা করে তাকে জানপদলেখ্য বলে। ঋণের ক্ষেত্রে উত্রমর্ণ ঐ দলিলে নিজের নাম, গোত্র, পিতা ও পিতামহের নাম, জাতি, বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন, বেদশাখার নাম ইত্যাদি তথ্যসমূহের উল্লেখ করবে। ঋণবিষয়ক সব কথা লেখা হলে অধমর্ণ লিখবে – আমি অমুকের পুত্র, উপরের লিখিত তথ্য আমার সম্মত। তারপর সাক্ষীগণ ঐ দলিলে নিজ নিজ সম্মতি জানিয়ে সাক্ষর করবে ও পিতৃনাম উল্লেখ করবে। উভয়পক্ষের সাক্ষীগণ সংখ্যায় ও গুণে সমান হবে। সাক্ষীদের স্বাক্ষর হয়ে গেলে লেখক স্বাক্ষর করবেন। দেশাচার অনুসারে জানপদলেখ্যপত্রের ভাষা হয়ে থাকে। সাধুভাষা ছাড়া নিজ নিজ দেশে প্রচলিত ভাষাতে তা রচিত হতে পারে। লেখ্যপত্রে বিদেশস্থিত, অস্পষ্টাক্ষরযুক্ত, নষ্ট হলে দগ্ধ বা ছিন্ন হলে অন্যপত্র রচনা করতে হয়। দলিলের হস্তাক্ষর, সন্, তারিখ ইত্যাদির দ্বারা দলিলবিষয়ে সন্দেহ দূর করা সম্ভব হয়। বলাৎকার, লোভ বা ক্রোধপূর্বক লিখিত, মত্ত, স্ত্রীলোক, নাবালক ইত্যাদির দ্বারা লিখিত দলিল প্রমাণ বলে গণ্য হবে না। ঋণপত্র সাক্ষীসহিত হলে তা সাক্ষীর সম্মুখেই শোধ্য। অধমর্ণ ঋণের কথা স্বীকার না করলে রাজা দলিল পরীক্ষা করবেন এবং তা শুদ্ধ বলে গণ্য হলে অধমর্ণকে দণ্ড দেবেন। কেবল ঋণাদান নয় অন্যান্য সকল বিবাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহারনির্ণয়ে এই লেখ্যপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

কূটলেখ- ধর্মশাস্ত্রকারগণ লেখ্যপ্রমাণের প্রসঙ্গে কূটলেখ বা কপটদলিলের কথাও উল্লেখ করেছেন। লেখকে জাল বলে সাধন করা হলে তার প্রমাণিকতা থাকে না। যে লেখ ছল করে লেখানো

হয়েছে, অন্য কোনো ব্যক্তির হস্তাক্ষর করা হয়েছে, কোনো সাক্ষী নেই তাকেই কূটলেখ বলা হয়। লেখের যথার্থতা অন্বেষণ করে তার সত্যতা সিদ্ধ করা যায়। *বিষ্ণুধর্মসূত্রানু*সারে ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা বা সাক্ষী এদের কারো বা সকলের মৃত্যু হলে, তাঁদের হস্তাক্ষর আছে এমন দলিল দস্তাবেজ দেখে, তার সাথে সাদৃশ্য দেখে লেখের প্রামাণিকতা সিদ্ধ করতে হবে।[৬৭] ঋণীর দ্বারা তার হস্তাক্ষরকে জাল করা হলে তার নির্ণয় করার দরকার হয়। সেক্ষেত্রে সাক্ষী ও লিপিকর সত্যতাকে সিদ্ধ করতে পারেন। যদি সাক্ষী ও লেখকের মৃত্যু হয় তবে লেখে কোনো রাজকীয় মুদ্রা অঙ্কিত থাকলে তার দ্বারা সত্যতা নির্ণীত হতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সিদ্ধ হয় যে প্রাচীনভারতীয় ন্যায়ালয়ে ঋণ, স্থাবর-জঙ্গম সম্পত্তি প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত প্রমাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৯.১.২.ব্যবহারদর্শনে সাক্ষীপ্রমাণ প্রসঙ্গ

সহপূর্বক অক্ষি শব্দের উত্তর ইনি প্রত্যয় করে সাক্ষী শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। সাক্ষাৎ দ্রষ্টাই সাক্ষী।[৬৮] বিবাদে সত্যাসত্য নির্ণায়ক তিনটি প্রমাণের মধ্যে সাক্ষী সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। মনুর মতে, প্রত্যক্ষদর্শন ও শ্রবণের দ্বারাই সাক্ষিত্ব সিদ্ধ হয়। সাক্ষী সত্য বললে ধর্মতঃ ও লোকতঃ নিন্দনীয় হন না। বিষ্ণুর মতে যিনি নিজের চক্ষু ও কর্ণের দ্বারা বিষয়টি অনুভব করেছেন তিনিই সাক্ষী।[৬৯] সাক্ষীর স্বরূপ বিষয়ে নারদও একই কথা বলেছেন- শ্রবণেন্দ্রিয় ও চক্ষুর দ্বারা যথাযথ দর্শন করে যে জ্ঞানলাভ হয় সেই জ্ঞানবান ব্যক্তিই সাক্ষীরূপে গণ্য হন। কর্ণের দ্বারা যিনি বিবাদাস্পদীভূত বিষয় সম্বন্ধিয় বাক্য অনুভব করেন এবং চোখের দ্বারা নিজেই প্রকৃত বস্তু দর্শন করেন তিনিই সাক্ষী। মেধাতিথির মতে যিনি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছেন কিংবা শ্রবণ করেছেন

---

[৬৭] যত্রর্ণী ধনিকো বাপি সাক্ষী বা লেখকোঽপি বা।
ম্রিয়তে তত্র তল্লেখ্যং তত্ত্বহস্তৈঃ প্রসাধয়েৎ।। বি.ধ.সূ.,৭.১৩

[৬৮] সাক্ষাদ্ দ্রষ্টরি সংজ্ঞাযাম্ । পা.সূ.,৫.২.৯১

[৬৯] সমক্ষদর্শনাত্ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি।
সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে।। মনু.,৮.৭৪
দ্র. সমক্ষদর্শনাত্ সাক্ষী শ্রবণাদ্বা চৈব সিধ্যতি। বি.ধ.সূ.,৮.১৩

তার কাছ থেকে কিছু শুনে যদি কেউ সাক্ষ্য দেয় তবে তা প্রমাণ বলে বিবেচিত হবে না। এ বিষয়ে বিষ্ণু সম্পূর্ণ ভিন্ন মত দিয়েছেন। তাঁর মতে যদি নির্দিষ্ট সাক্ষী মারা যায় কিংবা বিদেশে চলে যায় তবে তার কাছ থেকে যিনি শ্রবণ করেছেন তিনি সাক্ষ্য দিতে পারবেন।[৭০]

স্মৃতিশাস্ত্রে কৃত ও অকৃত এই দুইপ্রকার সাক্ষী উল্লিখিত হয়েছে। যাদের সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করা হয় তারা কৃতসাক্ষী। যারা স্বয়ং সাক্ষ্যদান করে অর্থাৎ নিযুক্ত না হয়েও সাক্ষ্যদান করে তারা অকৃতসাক্ষী। এই কৃতসাক্ষী হল পাঁচ প্রকার ও অকৃতসাক্ষী হল ছয় প্রকার। কৃতসাক্ষীগুলি হল- ১.লিখিতসাক্ষী- দলিলপত্র প্রভৃতিতে যার নাম লেখা থাকে। ২.স্মারিতসাক্ষী- সাক্ষ্যবিষয়ে যাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। ৩.যদৃচ্ছাভিজ্ঞসাক্ষী- যারা দৈবক্রমে উপস্থিত হয়ে বিবাদবিষয়ে অবগত হয়ে সাক্ষ্যদানের জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে সাক্ষ্যদান করেন। ৪.গূঢ়সাক্ষী- যারা অজ্ঞাতভাবে থেকে বিবাদের বিষয় শ্রবণ করে পরে সাক্ষ্য দেন। ৫.উত্তরসাক্ষী- অন্য সাক্ষীদের নিকটে বিবাদের কথা শুনে যারা সাক্ষ্যদেন।

অকৃতসাক্ষীগুলি হল – ১.গ্রামসাক্ষী- গ্রামের বিবাদে গ্রামের লোকেরা যখন সাক্ষ্য দেয় তখন তাদেরকে গ্রামসাক্ষী বলা হয়। ২.প্রাড্বিবাকসাক্ষী- ধর্মাধিকরণে কোনো ঘটনা ঘটলে প্রাড্বিবাক বা প্রধান ন্যায়াধীশ এবং লেখক ও সভ্যগণ যখন সাক্ষ্য দেন। ৩.রাজসাক্ষী- রাজার সম্মুখে সভ্যগণের মধ্যে কোনো বিবাদের ঘটনায় রাজাই যখন সাক্ষ্য দেন। ৪.কার্যাভ্যন্তরসাক্ষী- মামলাকার্যের পরিচালনায় যারা জড়িত ক্ষেত্রবিশেষে তারা যদি সাক্ষ্য দেন। ৫.অর্থীপ্রহিতসাক্ষী- অর্থী যাদের সাক্ষ্য দানের জন্য প্রেরণ করে। ৬.কুল্যসাক্ষী- কোনো বংশগতবিবাদে ঐ বংশের বৃত্তান্ত জানেন এমন স্ববংশীয় ব্যক্তিগণ যখন সাক্ষ্য দান করেন তখন কুল্যসাক্ষী বলা হয়।

বিবাদের নির্ণয়ে সাক্ষীর গুরুত্ব অপরিসীম। উপযুক্ত সাক্ষী প্রদর্শনের মাধ্যমে বিবাদাস্পদীভূত বিষয়টি বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে যিনি প্রমাণ করতে পারেন তিনিই জয়লাভ করেন।

---

[৭০] পরম্পরাসাক্ষী ন সাক্ষী। মনুভা.,৮.৭৪

তুল., বি.ধ.সূ.,৮.১২

৯.১.৩.ব্যবহারনির্ণয়ে ভুক্তি প্রমাণের গুরুত্ব

প্রাচীন ন্যায়বিদ শাস্ত্রকারগণ বিবাদের নির্ণয়প্রসঙ্গে ভুক্তি বা ভোগকে অতিমহত্ত্বপূর্ণ একটি প্রমাণ বলে অভিহিত করেছেন। ভুক্তি শব্দের অর্থ হল উপভোগ। তিনপ্রকার মানুষপ্রমাণের মধ্যে অন্যতম হল এই ভোগপ্রমাণ। আসেধরহিত অর্থাৎ জমির মালিক বা রাজার দ্বারা যেখানে প্রতিবাদ করা হয়নি এবং দীর্ঘদিন নিরবচ্ছিন্ন যে ভোগ তাই স্মৃতিতে ভোগপ্রমাণ বলে গণ্য হয়েছে। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য বলেছেন, যে সম্পত্তির খোঁজ-খবর তার মালিক রাখে না, অন্যে দশবছর ভোগ করছে, তার উপর সেই পূর্বমালিকের কোনো অধিকার থাকবে না।[৭১] অর্থাৎ অন্যের ভূক্তির দ্বারা অনেক সময় ভূস্বামীর সত্ত্বহানি ঘটে। ধর্মশাস্ত্রকারগণ বলেন যে, দ্বার নির্গমন পথ জলের প্রবাহ প্রভৃতিস্থানের উপর বিবাদ নির্ণয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হলে অন্যপ্রমাণের অপেক্ষা ভুক্তিকে অধিক প্রামাণিক বলে স্বীকার করতে হবে।[৭২] যদি কোনো সম্পত্তির মালিক তার সম্পত্তির উপর অন্য কারোর অধিকার দেখেও চুপ থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত হলেও কোনো দাবি না করে তবে সে তার পুনঃপ্রাপ্তিতে অধিকারী হবেন না।

কাত্যায়নের মতে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সময় অতিক্রান্ত হলেও ভোগ্যদ্রব্যের উপর ভোক্তার মালিকানা বর্তায় না। যেমন বেদ ও শিল্পশিক্ষার্থীর সম্পত্তি, রাজার দ্বারা দণ্ডিত ব্যক্তির সম্পত্তি, বন্ধু ও আত্মীয়ের সম্পত্তি (কাত্যা.স্মৃ.,৩৩৩-৩৩৪)। মনুর মতে, অন্যের ধেনু, উট, ঘোড়া, বৃষ স্নেহপূর্বক দোহন-বহন প্রভৃতির দ্বারা বহুকাল ভোগ করলেও মালিকের সত্ত্ব নষ্ট হবে না। যখন চাইবে তখনই মূল মালিকের কাছে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।[৭৩]

ভুক্তি দুইপ্রকার- সাগমা এবং অনাগমা। যেখানে ভোগ্যদ্রব্যের মালিক নিজেই ভোগ করেন তা হল সাগমা ভোগ। যেখানে কেউ ভোগ্যদ্রব্যের মালিক না হয়েও অপরের দ্রব্য ভোগ

---

[৭১] যৎ স্বং দ্রব্যমন্যৈর্ভুজ্যমানং দশবর্ষাণ্যুপেক্ষেত হীয়েতাস্য। অর্থ.,৩.১৬.৩০

[৭২] কাত্যা.,৩১৪

[৭৩] সম্প্রীত্যা ভূজ্যমানানি ন নশ্যন্তি কদাচন।
ধেনুরুষ্ট্রো বহন্নশ্বো যশ্চ দম্যঃ প্রযুজ্যতে।। মনু.,৮.১৪৬

করেন তা হল অনাগমা ভোগ। লিখিতভাবে আইনানুগ অধিকারযুক্ত ভুক্তি হল সাগমা এবং লিখিতভাবে আইন মাফিক অধিকারহীন ভুক্তি হল নিরাগমা বা অনাগমা ভুক্তি।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে প্রথম সত্ত্বাধিকারী পুরুষের পক্ষে আগম এবং চতুর্থ পুরুষের পক্ষে ভোগ বলবৎপ্রমাণ। আর যদি তার সাথে অল্পমাত্র ভোগ না থাকে তবে দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরুষের পক্ষে প্রমাণিত হলেও আগম প্রমাণ হবে না। তাঁর মতে, তিন পুরুষ ধরে আগত ভোগ অপেক্ষা সাগম ভোগ প্রমাণ অধিক প্রামাণিক হবে না। আগমযুক্ত ভুক্তিকেই মালিকানার ক্ষেত্রে অধিক প্রামাণিক বলে স্বীকার করেছেন। অত এব সাগম বা আগমযুক্ত, দীর্ঘকাল ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিবাদহীন প্রত্যর্থীর সম্মক্ষে যে ভোগ করা হয় তাই প্রমাণ বলে বিবেচিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট যে, স্মৃতিশাস্ত্রে বিবাদ নিরসনে ভুক্তি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। কাত্যায়ন ভুক্তিকে লিখিত প্রমাণের ন্যায় প্রমাণিক বলেও স্বীকার করেছেন।[৭৪] তবে সকলেই যে এই প্রমাণের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ দান কিংবা ক্রয় যেভাবেই দ্রব্য প্রাপ্তি ঘটুক তাতে ভোগকে পরম আবশ্যক বলা হয়েছে।

৯.২.ব্যবহারদর্শনে দিব্যপ্রমাণসমূহ

তিন প্রকার মানুষ প্রমাণ ছাড়াও স্মৃতিতে উল্লিখিত অপর একটি প্রমাণ হল দিব্যপ্রমাণ। বিবাদে সত্য অন্বেষণ দিব্য পরীক্ষণের দ্বারা করা হলে তাকে দিব্য প্রমাণ বলে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, নারদ, বৃহস্পতি প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ দিব্য প্রমাণের সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। কখন দিব্যপ্রমাণের প্রয়োগ করা হবে সে সম্পর্কেও স্মৃতিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মনু জল ও অগ্নি এই দুই প্রকার দিব্যপ্রাণ স্বীকার করেছেন।[৭৫] যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ ও বিষ্ণু তুলাদণ্ড, অগ্নি, জল, বিষ ও কোষ এই পাঁচ প্রকার দিব্যপ্রমাণের উল্লেখ করেছেন।[৭৬]

---

[৭৪] প্রমাণেষু স্মৃতা ভুক্তিঃ সা চ লেখ্যসমং মতা। কাত্যা.,৩১৩

[৭৫] অগ্নিং বা হারয়োদেনমপ্সু চৈনং নিমজ্জয়েৎ। মনু.,৮.১১৪

কাত্যায়ন বিষ, তুলাদণ্ড, অগ্নি, জল, দেবোদক, তণ্ডুল এবং শপথ এই সাত প্রকার দিব্যপ্রমাণ স্বীকার করেছেন (৪১২-৪২০)। বৃহস্পতি নারদোক্ত পাঁচ প্রকার দিব্যসাক্ষের সাথে তপ্তমাষ, কাল ও ধর্ম এই তিনটিকেও দিব্যপ্রমাণরূপে উল্লেখ করেছেন।[৭৭] স্মৃতিকারগণ প্রমাণবিষয়ক আলোচনায় দিব্যপ্রমাণ সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছেন। সেখানে দিব্যপ্রমাণের স্থান, কোন ঋতুতে কোন দিব্য গ্রহণীয়, কোন বর্ণের জন্য কোন দিব্য নির্দিষ্ট তা উল্লেখ করার পাশাপাশি কোন বিবাদে কোন প্রকার দিব্য প্রমাণরূপে বিবেচিত হবে তাও উল্লিখিত হয়েছে। অধিক ধনসম্বন্ধিয় বিবাদে তুলা, অগ্নি, বিষ ও জলকে দিব্যপ্রমাণরূপে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। অল্পধনসম্বন্ধিয় বিবাদে কোশপানকে গ্রহণ করতে বলেছেন। এক সহস্র তাম্রমুদ্রা থেকে বেশি ধনসম্বন্ধিয় বিবাদকে মহাভিযোগ বলা হয়েছে এবং তার থেকে কম মুদ্রা সম্বন্ধীয় বিবাদকে অল্প অভিযোগ বলা হয়েছে।

৯.২.১.অগ্নি-প্রমাণ

সর্বাধিক প্রাচীন দিব্যপ্রমাণ হল অগ্নিপ্রমাণ। স্মৃতিতে দিব্যপ্রমাণের প্রাচীনতম তালিকাগুলিতে এর উল্লেখ রয়েছে। ইহার সর্বাধিক প্রাচীন নিদর্শনরূপে *রামায়ণে* সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথাটি উল্লেখ করা যেতেই পারে। যেখানে সীতা নিজের সতীত্বের প্রমাণ দেওয়ার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য অগ্নিপ্রবেশের রূপটি অগ্নির প্রজ্বলিত শিখায় প্রবেশের পরিবর্তে জ্বলন্ত অগ্নিকে হস্তে ধারণরূপ প্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে। কারণ স্মৃতিতে দিব্যপ্রমাণরূপে অগ্নিপ্রমাণের যে ব্যাখ্যা মেলে সেখানে কতকগুলি পাতা দিয়ে হাতের তালু আবৃত করে, রক্ততপ্ত লৌহপিণ্ড নিয়ে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করতে বলা হয়েছে। কতবার অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করা হবে, কিংবা কি গাছের পাতা দিয়ে হাতের তালুকে আবৃত রাখবে

---

[৭৬] তুলাগ্ন্যাপো বিষং কোষো দিব্যানীহ বিশুদ্ধয়ে। যাজ্ঞ.,২.৪৫

দ্র. বি.ধ.সূ.,পৃ.৩৬

দ্র.নারদ.,৪.২৫২

[৭৭] ধটোঽগ্নিরুদকং চৈব বিষং কোশস্তথৈব চ।

...

অষ্টমং কালমিত্যুক্তং নবমং ধর্মকং তথা।। বৃহ.,৮.৩-৪

সে নিয়ে স্মৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। দিব্যপ্রমাণে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি অধিষ্ঠাতা অগ্নিদেবতার কাছে প্রার্থনা করতো- হে অগ্নি! তুমি পাপ ও পুণ্যের সাক্ষী হয়ে সত্য প্রকাশ করবে।

৯.২.২.জল-প্রমাণ

- স্মৃতিতে দিব্যপ্রমাণরূপে জলের ব্যবহাররূপ প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য দিব্যের তুলনায় এই দিব্যটি কষ্টসাধ্য হওয়ায় এটি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। কিংবা এমন বলা চলে যে এই দিব্যটি সফলভাবে সকলে আচরণ করতে সক্ষম ছিল না। নারদ স্ত্রী, দুর্বল পুরুষ, বালক, রোগগ্রস্থকে ও বৃদ্ধকে এই দিব্য আচরণে নিষেধ করেছেন।[৭৮] জলে দিব্যপ্রমাণ আচরণ করার পূর্বে দিব্যকারী ব্যক্তি সত্য উন্মোচনের জন্য সর্বপ্রথমে বরুণ দেবতার কাছে প্রার্থনা করবে। তারপর নাভিপ্রমাণ জলে দণ্ডায়মান কোনো ব্যক্তির উরুদ্বয় ধারণ করে জলে ডুব দেবে। এই সময় নিশ্চিত স্থান থেকে নিক্ষিপ্ত বাণ যথাস্থানে নিয়ে না আসা পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি জলে নিমজ্জিত অবস্থাতেই থাকবে। এই জলাশয়টি কেমন হবে সে বিষয়েও স্মৃতিতে স্পষ্টতঃ আলোচনা করা হয়েছে। জলাশয়টি হবে পঙ্ক, শৈবাল, দুষ্ট কুমীর, মৎস্য, জলৌকা প্রভৃতি রহিত এবং এটি দেবনির্মিত কিংবা মনুষ্যনির্মিত যে কোনো প্রকারই হতে পারে। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি তার একাঙ্গও দেখা যায় তবে তাকে অশুদ্ধ বলে মানা হবে কিন্তু যদি সে এই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিমজ্জিত অবস্থায় জীবিতই থাকে তবে তাকে শুদ্ধ বলে মানা হবে।[৭৯]

৯.২.৩.বিষ-প্রমাণ

বিষ পরীক্ষার জন্য কয়েক ধরণের বিষ অন্তর্গত থাকতো বলে স্মৃতিশাস্ত্রে জানা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বিষ্ণু প্রমুখ স্মৃতিকারগণ হিমালয়ের শৃঙ্গ হতে জাত বিষকে দিব্যপরীক্ষায় গ্রহণ করতে বলেছেন। বিষ পরীক্ষার দ্বারা দিব্যকারী ব্যক্তি প্রথমে ব্রহ্মার পুত্ররূপে বিষকে

---

[৭৮] ন মজ্জনীয়ং স্ত্রীবালং ধর্মশাস্ত্রবিশারদৈঃ।

রোগিণশ্চাপি বৃদ্ধাশ্চ পুমাংসো যে চ দুর্বলাঃ।। নারদ,৪.৩১৩

[৭৯] পঙ্কশৈবালদুষ্টগ্রাহমৎস্যজলৌকাদিবর্জিতেঽম্ভোসি।

...

অন্যথা ত্ববিশুদ্ধঃ স্যাদেকাঙ্গস্যাপি দর্শনে।। বি.ধ.সূ., ১২.১-৬

সম্বোধন করে সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য প্রার্থনা করবেন। যদি বিষপান করার পর তার শরীরে কোনো বিকার যেমন স্বেদ, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, কম্পন, বিবশতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা না যায় তবে দিব্যকারী পুরুষকে নিরপরাধ ও শুদ্ধ বলে ঘোষণা করা হবে (যাজ্ঞবল্ক্য-২.২১১)।

৯.২.৪.কোশ-প্রমাণ- বিষের পরিবর্তে কয়েকমাত্রা কৃতকবিষময় জলপান করাই হল কোশপানরূপ দিব্যপ্রমাণ। এক্ষেত্রে দুর্গা, আদিত্য প্রভৃতি উগ্র দেবতাগণকে গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা পূজা করে তাদের স্নান করিয়ে ঐ জল দিব্যকারী ব্যক্তিকে তিনবার গণ্ডষভরে পান করতে হত। এরপর দ্বিসপ্তাহ অপেক্ষা করতে হত।

৯.২.৫.তুলা-প্রমাণ-

তুলা হল ওজন পরিমাপক যন্ত্র। 'ধট' বলেও একে সম্বোধন করা হয়েছে। ধট বা তুলাযন্ত্রের দ্বারা পরিমাপ করতে যারা অভিজ্ঞ সেই স্বর্ণকার প্রভৃতির দ্বারা অভিযুক্ত বা অভিযোক্তাকে তুলাযন্ত্রে মাটি প্রভৃতি দিয়ে ওজন করানো হবে। যে অবস্থায় দুদিক সমান হয়েছে, শিক্যের তলায় সেই স্থানটি চিহ্নিত করতে হবে। তারপর দিব্যকারী ব্যক্তিকে তুলা থেকে নামিয়ে তাকে দিয়ে 'আমি পাপকারী হলে তুমি আমাকে নিজে নামাও আর যদি শুদ্ধ হই, সত্যবাদী হই তাহলে আমাকে ওপরে ওঠাও' এরূপ বলাতে হবে। একথা বলার পরে পুনরায় তুলাযন্ত্রে ওঠার পরে যদি আরোহীর দিকটি নীচে নামে তবে সে দোষী এবং যদি ওপরে ওঠে তবে সে নির্দোষী বলে গণ্য হয়।[৮০] এই ধট বা তুলাযন্ত্রে নির্মাণশৈলী নিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য আলোচনা না করলেও টীকাকার আলোচনা করেছেন। নারদের বচন উদ্ধৃত করে তিনি তুলাদণ্ডটি কি কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত হবে, কিভাবে বৃক্ষচ্ছেদন করতে হবে তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, কেবল দিব্যকারী ব্যক্তি নয় প্রাড্বিবাককেও তুলাযন্ত্রের কাছে সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। তুলাকে কাক ইত্যাদি প্রাণীর থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি ধটশালা নির্মাণ করতে বলেছেন। দিব্যপ্রমাণকালে তুলাযন্ত্রের কক্ষটি ভেঙে গেলে

---

[৮০] ত্বং তুলে সত্যধামাসি পুরা দেবৈর্বিনির্মিতা।

...

শুদ্ধশ্চেদ্ গময়োর্দ্ধং মাং তুলামিত্যভিমন্ত্রয়েৎ।। যাজ্ঞ.,২.১০২

কিংবা তুলাটি ভেঙে গেলেও দিব্যকারী ব্যক্তিকে দোষী বলে মানতে বলেছেন[৮১] - যদিও দোষী চিহ্নিত করণের এমন বিধান স্মৃতির অন্যত্র মেলে না।

[৮১] মিতা.,২.১০০-১০২

তৃতীয় অধ্যায়

স্মৃতিসাহিত্য ও আখ্যানে বিচারপদ্ধতি ও বিচারক

তৃতীয় অধ্যায়

স্মৃতিসাহিত্য ও আখ্যানে বিচারপদ্ধতি ও বিচারক

সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্য প্রধানতঃ মানবেতর প্রাণী অর্থাৎ পশু-পক্ষী আদি তির্যক প্রাণীদের কাহিনি অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। এই সমস্ত প্রাণীর স্বভাব অনুযায়ী এদের উপরে মানবিক সত্তা আরোপিত হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রে যে বিধি নিষেধ, অপরাধ-অন্যায়, সমাজনীতির কথা বলা হয়েছে, তাদেরই দৃষ্টান্ত যেন গল্পাকারে পশু-পাখির মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত হয়েছে। সাধারণতঃ অতি সহজ সরল গদ্যরীতি ব্যবহৃত হলেও ক্বচিৎ সমাস, শ্লেষ ও অলঙ্কারাদির সহায়তায় বিশেষ বিশেষ কাব্যরীতিও কাহিনিগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

আখ্যানগুলির একটি বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে নানাবিধ প্রেম-প্রীতি,ন্যায়-অন্যায় ও অপরাধের কাহিনি। কোথাও তার দণ্ড বিহিত হয়েছে কোথাও বা হয়নি। আসলে প্রবৃত্তি ও রিপুর প্রভাব চিরকালই অমোঘ, তার প্রভাব এড়ানো কোনো কালেই সহজ ছিল না। অপরাধ আছে, অপরাধ ছিল, অপরাধ থাকবে। তাই মানবজীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সাহিত্য কীর্তিগুলিতেও অপরাধ, অপরাধী, অপরাধের নিবৃত্তি, অপরাধের শাস্তি ইত্যাদির প্রতিফলন দেখা যায় – আখ্যানগ্রন্থগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। আখ্যান-উপাখ্যান গুলিতে বিভিন্ন অপরাধের দৃষ্টান্ত যেমন রয়েছে তেমনি তার শাস্তি ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা দেখা যায়। সেখানে সাধারণ জনবাসীর পাশাপাশি সমাজের উচ্চস্থানীয় ব্যক্তি, সম্মাননীয় বলে পরিচিত ব্যক্তি, এমনকী বিচারক তথা বিচারকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি, রাজকর্মচারী সকলের অপরাধ প্রবণতার কথাই উল্লিখিত হয়েছে। প্রশাসনিক পদে আসীন ব্যক্তিগণও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। চাটুকারীতা, স্বজনপোষণ, লোভ ইত্যাদির কারণে যেমন বর্তমানে রক্ষককে ভক্ষকের ভূমিকায় দেখা যায়। তেমনি আখ্যান-উপাখ্যান গুলিতেও এমন একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজসভার প্রশাসনিক পদে আসীন ব্যক্তিগণ যেমন-বিচারসভায় উপস্থিত সভ্যগণ, গণক, লেখক ও অন্যান্য পদাধিকারী ব্যক্তিগণ তথা স্বয়ং বিচারকের

দুর্নীতিপরায়ণতার চিত্র বিভিন্ন কাহিনিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এদের দুর্নীতিপরায়ণতার কারণেই ন্যায়ব্যবস্থা অচলাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

রাজাও যে দুর্নীতিগ্রস্ত হতে পারেন এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয়েছে। দেবতা বা ধর্মের দোহাই দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কিভাবে রাজা হওয়া যায় এবং পারিষদ্-বর্গ সব জেনেও তোষামদকারীরূপে নির্বাক হয়ে অবস্থান করেন তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল *পঞ্চতন্ত্রের* 'নীলবর্ণশৃগালে'র আখ্যানটি। আলোচ্য আখ্যানটিতে চণ্ডরব নামক একটি শৃগাল খাবারের লোভে নগরে প্রবেশ করেছিল। সেখানে প্রবেশমাত্রই নগরস্থিত কুকুরদলের তাড়া খেয়ে সে প্রাণভয়ে ছুটতে থাকে, এমন সময়ে পালাতে গিয়ে এক ধোপার নীলভর্তি গামলায় পড়ে যায় এবং তার সমগ্র দেহ নীল বর্ণ প্রাপ্ত হয়। নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয়ে শেয়ালটি এক অদ্ভুত জীবের ন্যায় আকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং সেই অবস্থায় বনে প্রবেশ করে। ভিন্ন আকৃতি প্রাপ্ত হওয়ায় বনের কোনো পশুই তাকে শেয়াল বলে চিনতে সক্ষম হয়নি- বরং ভয় পেয়েছে। তাকে দেখে বড়-ছোট পশুদের এমন ভয় পাওয়া বুঝতে পেরে ধুরন্ধর শেয়ালটি ফন্দি খাটিয়ে বলে - 'ওহে, বনের পশুরা আমাকে দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এই বনে পশুদের কোনো রাজা নেই তাই স্বয়ং ব্রহ্মা আমাকে সৃষ্টি করে এই বনের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করে পাঠিয়েছেন' । এমন বক্তব্য শুনে বনবাসী সকল পশুরাও তাকেই রাজারূপে স্বীকার করে নিয়েছে, তোষামোদকারী কিছু পশুদের নিয়ে রাজসভা তৈরি করে বনের রাজা রূপে শাসন শুরু করেছে। কিছুদিন পরে যখন অন্যান্য শেয়ালের ডাক শুনে ছদ্মবেশী চণ্ডরব স্বভাববশতঃ 'হুক্কা-হুয়া' স্বরে ডাকতে শুরু করেছে তখন বাঘ-সিংহরা শেয়ালের ছলনা বুঝতে পেরে তার বিনাশ ঘটিয়েছে।[১]

আলোচ্য আখ্যানটিতে আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছলনার আশ্রয় নিয়ে শেয়ালটি রাজপদে আসীন হয়েছে। বনবাসী অন্যান্য পশুদেরও তার সভায় সভাসদ্-রূপে নিয়োগ করেছে। শেয়ালের নানা কর্মকাণ্ড দেখে সন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও এই সকল সভাসদ্-রা রাজার অলৌকিক শক্তির কারণে শেয়ালের সকল চতুরতা মেনে নিয়েছে। রাজার অনুগ্রহ পেতে গেলে তাকে

[১] সুধাকর মালবীয়, *পঞ্চতন্ত্র*,পৃ.১৮৪

তোষামোদ করতেই হবে, তাই তারা চাটুকারিতার পথটিই অনুসরণ করেছে। সত্য অনুসন্ধান করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথে হাঁটেনি। আখ্যানগ্রন্থগুলিতে এমন একাধিক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে প্রশাসক সহ কর্মচারীকেও দুর্নীতিপরায়ণ হতে দেখা যায়। তবে কোথাও কোথাও ন্যায়নিষ্ঠ-সত্যের পথে চালিত সভাসদ্ রাজার অন্যায্য সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন এমন কাহিনীও মেলে। আখ্যানগুলিতে বিচারক ও বিচারকার্যে সংযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক কিভাবে বিচারটি সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছে, কিভাবে ন্যায়প্রতিষ্ঠার পথটি বিপথে চালিত হয়েছে, এই সকল ব্যক্তিগণের আবশ্যিক গুণাবলী সমূহ- সম্বন্ধে আখ্যানগুলি থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১.আখ্যানে বিচারক ও সভ্যপ্রসঙ্গ

বিভিন্ন কাহিনির মাধ্যমে আখ্যানগুলিতে বিচারসভার গঠন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কে বা কারা বিচারকার্যে অধিকারী, কারা সহকারী, তাদের কর্তব্য কী এগুলি কোথাও স্মৃতিতে উল্লিখিত ন্যায়ালয়ের সাথে হুবহু মিলে যায় আবার কোথাও ভিন্নরূপ। *পঞ্চতন্ত্রের* 'শশ-কপিঞ্জলকথায়' কপিঞ্জলনামের একটি পক্ষী ও শশকের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা বিবাদ নিরসনের জন্য একজন বিচারকের অন্বেষণ করেছে। পরে একটি বিড়ালকে বিচারকের আসনে বসিয়েছে। আলোচ্য আখ্যানটিতে বিচারকের স্বরূপ বিষয়ে একাধিক তথ্য মেলে। বিচারক হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির একাধিক গুণের আবশ্যিকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে বিচারক হবেন ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ, বয়ঃবৃদ্ধ। তিনি লোভ-অভিমান বর্জিত হয়ে সঠিক নির্ণয়দান করবেন। আখ্যানটিতে বিচারকরূপে বিড়ালের বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপনের জন্য তার চরিত্রটি যেভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে, তার দ্বারা আদর্শ তথা প্রকৃত বিচারক কেমন হবে সে বিষয়ে সন্ধান দেওয়া হয়েছে। বিড়ালটি হাতে পবিত্র কুশঘাস নিয়ে নিজে ধার্মিক বলে পরিচয় দিয়েছে। কপিঞ্জল ও শশকের সামনে ধর্মশাস্ত্রের নানা বচন উদ্ধৃত করে নিজেকে ধর্মশাস্ত্র জ্ঞানের নিদর্শন দিয়েছে। তার

এই সকল গুণ দেখে কপিঞ্জল ও শশক তাকে বিচারক বলে স্বীকার করেছে।[২] স্মৃতিতেও বিচারকের একাধিক গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। *হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্রে* নারদ, আপস্তম্ব উক্ত বিচারকের গুণগুলি উল্লিখিত হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে, ন্যায়াধীশ আঠারো প্রকার বিবাদপদ ও তার নানা বিভাগ সম্পর্কে, আন্বীক্ষিকী আদিবিদ্যায় কুশল হবেন এবং শ্রুতি ও স্মৃতিতে পারঙ্গম হবেন।[৩] অর্থাৎ বিচারকের ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ হওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ বিচারকের যেমন ধর্মশাস্ত্রানুসারে বিচারদর্শন করতে বলা হয়েছে তেমনি আলোচ্য আখ্যানটিতে ধর্মশাস্ত্র জ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[৪]

শুকসপ্ততিকথায় বিচারকের শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন বলা হয়েছে। শাস্ত্রজ্ঞ না হলে মানুষের দোষ-গুণ তিনি কখনই বিভাজন করতে সমর্থ হবেন না। তাই একজন সুবিচারকের শাস্ত্রের জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।[৫] আলোচ্য গ্রন্থটির দ্বিপঞ্চাশৎ সংখ্যক কথায় বিচারকার্যে অত্যন্ত দক্ষ একজন রাজা ও তার মন্ত্রির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। রাজার নাম ছিল নীতিসার ও তার মন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধিসার। তার কেবলমাত্র বাদীর কথা শুনেই প্রকৃত বিষয়টি অনুমান করতে পারতেন এবং উপযুক্ত রায়দান করতে সক্ষম ছিলেন। তাদের এই গুণের জন্য তারা জগৎপ্রসিদ্ধ ছিলেন।[৬] আলোচ্য আখ্যানটিতে রাজা ও তার সহায়করূপে মন্ত্রীর নামকরণটি এমনভাবে করা হয়েছে যে- তা থেকে সহজেই বিচারকার্য সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য মন্ত্রীর বুদ্ধিগুণ যে একান্ত অপরিহার্য তা অনুমান করা যায়। বিচারক ও বিচারকার্যে সহকারী ব্যক্তিরা, নীতিবিদ ও বুদ্ধিমান হলে তবেই বাদী-প্রতিবাদী সুবিচার পায়।

রাজা স্বয়ং কিংবা তার দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তি প্রাড্বিবাক একা বিচারকার্য পরিচালনা করবেন না। বিচারসভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সাথে পর্যালোচনা করে তবেই নির্ণয়দান করবেন।

---

[২] পঞ্চ.,পৃ.৪৯৪-৪৯৬

[৩] P.V.Kane,Hist.Dh.,vol.3.P.242-244

[৪] ভোঃ যদি স্মৃতিং প্রমাণীকরোষি, তদাগচ্ছ মযা সহ, যেন স্মৃতিপাঠকং পৃচ্ছামি...। পঞ্চ.,পৃ.৪৮৮

[৫] গুণদোষৌ ন শাস্ত্রজ্ঞঃ কথং বিভজতে জনঃ। রমাকান্ত ত্রিপাঠী,*শুকসপ্ততিকথা*, পৃ.২৭৫

[৬] তদেব.,পৃ.২১২

আখ্যানগুলিতে বিভিন্ন বিবাদের নিরসনে বিচারকের পাশাপাশি সভ্যগণের উপস্থিতিও চোখে পড়ে। কেবল তাই নয় তাদের মূল্যবান উপদেশ দ্বারা তারা রাজাকে বিচারে সঠিক দিশাও দেখিয়েছেন। *কথাসরিৎসাগরের* রত্নপ্রভা-লম্বকের নবম তরঙ্গে এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে একজন সভ্য রাজাকে সঠিক উপদেশ দিয়ে বিচারকার্যে সাহায্য করেছেন। আখ্যানটিতে অর্থলোভ নামের এক বণিক রাজার কাছে মিথ্যা অভিযোগ করেছে যে, তার পত্নীকে সুখধন বলপূর্বক হরণ করেছে। এমন অভিযোগ শোনা মাত্রই রাজা প্রভাবশালী বণিক সুখধনকে বন্দি করার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিচারসভায় উপস্থিত মন্ত্রী ও সভ্যগণই তাকে পূর্বে অর্থলোভে অভিযোগে সত্যতা যাচাই করতে বলেছেন এবং তারপরেই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। বণিক সুখধন যেহেতু সমাজে প্রতিষ্ঠিত, সম্মাননীয় তাই তাকে বক্তব্য পেশের সুযোগ দিতে বলেছেন। পরবর্তীতে অর্থলোভের মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং রাজা নির্দোষ সুখধনকে মুক্ত করেছেন।[৭] এইভাবে সভ্যগণের সহায়তায় রাজা একজন নির্দোষীকে শাস্তিপ্রদানরূপ পাপ থেকে বিরত হয়েছেন। এবং ভ্রান্তবিচার থেকে নিজেকেও মুক্ত করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের মদনমঞ্জুকা লম্বকের দ্বিতীয় তরঙ্গেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত মেলে। 'রাজপুত্র ও তার জীবনরক্ষাকারী বণিকপুত্রের কাহিনি'তে বণিকপুত্রের স্নেহানুরাগের কথা বিস্মৃত হয়ে বিনা অপরাধে তাকে বধদণ্ড বিধান করেন। এমনকি রাজপুত্র বণিকপুত্রকে আত্মপক্ষ সমর্থনে সুযোগও দেননি। এই সময় সভাস্থ সচিবগণই ক্রুদ্ধ রাজপুত্রকে উপদেশ দিয়ে শান্ত করেছেন এবং বণিকপুত্র যাতে মৃত্যুদণ্ডের পূর্বে বিচারালয়ে এসে আত্মপক্ষ ব্যক্ত করতে পারেন সেবিষয়ে রাজপুত্রকে সম্মত করেছেন।[৮] বস্তুত, বিচারের চারটি পাদের মধ্যে অন্যতম একটি হল উত্তরপাদ। যেখানে প্রতিবাদী নিজ বক্তব্য পেশের সুযোগ পান। প্রতিবাদীর বক্তব্য না শুনেই শাস্তিবিধান যথার্থ বিচার নয়। সভাস্থ ব্যক্তিদের সহায়তায় রাজপুত্র সঠিকভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছেন। আখ্যানগুলিতে এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত মেলে যেখানে রাজার বিচার সভায় মন্ত্রী ও সভ্যগণের উপস্থিতি রয়েছে।

---

[৭] জগদীশলাল শাস্ত্রী, *কথাসরিৎসাগর*, পৃ.১৯৭

[৮] তদেব., পৃ.১০৩-১০৫

সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার ত্রিংশ উপাখ্যানে রাজা বিক্রমাদিত্যকে সভ্য, সামন্ত ও মন্ত্রীগণের সহিত বিচারসভায় অধিষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

সভায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের উপদেশ রাজা সর্বদাই গ্রহণ করতেন এমন নয়। কখনও কখনও রাজার সাথে তাদের মতবিরোধও হত। রাজা নিজ বুদ্ধিতেই নির্ণয়দান করেছেন- এমন দৃষ্টান্তও আখ্যানে মেলে। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* একত্রিংশ উপাখ্যানে রাজকুমার একজন ব্রাহ্মণকে কশাঘাত করলে ব্রাহ্মণ বিচারের জন্য রাজার কাছে উপনীত হন। রাজা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আঘাতের অপরাধে পুত্রের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে স্বদেশ থেকে নির্বাসনের আদেশ দেন। সভাস্থিত সকলে রাজাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাজপুত্রকে এরূপ শাস্তি না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। রাজা রাজপুত্রকে ক্ষমা করেননি। তাঁর মতে, শাস্ত্রে বিহিত আছে ব্রাহ্মণকে আঘাত দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই সভ্যগণের অনুরোধ না মেনেই তিনি রাজকুমারের দণ্ড বিধান করেছেন।[৯] এইভাবে রাজা বিচারে স্বয়ং রায়দান করেছেন। রাজা আপন অধিকার বলেই বিচারের সময় সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করতে নাও পারতেন। স্মৃতিও রাজাকে এইরূপ অধিকার দিয়েছে। স্মৃতিতে বলা হয়েছে, সভাসদগণকে যেহেতু রাজা বিচারকার্যে সহায়তার জন্য নিয়োগ করেন তাই রাজাকে ব্যবহারদর্শনকালে সঠিক উপদেশ দিয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হওয়া তাঁদের অবশ্য কর্তব্য। *মিতাক্ষরা*কার কাত্যায়নের বচন উদ্ধৃত করে বিচারসভায় সভাসদগণের কর্তব্য নিশ্চিত করেছেন। সভাসদ সম্পর্কিত যাজ্ঞবল্ক্যের বচনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, রাজা ব্রাহ্মণগণের সাথে বিচার করবেন, এখানে এই ব্রাহ্মণগণ হলেন অনিযুক্ত আর সভাসদগণ হলেন রাজার দ্বারা নিযুক্ত। ধর্মজ্ঞব্যক্তি নিযুক্তই হোক বা অনিযুক্তই হোক বিচার বিষয়ে তিনি কথা বলার অধিকারী। এই নিযুক্ত সভাসদগণ বিচার্য বিষয়ে রাজাকে যথাযথভাবে উপদেশ দিলে রাজা যদি তবুও ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে সভাসদগণ রাজাকে নিবারণ করবেন। নাহলে তাঁদেরই দোষ হবে। এপ্রসঙ্গে তিনি কাত্যায়নের যে বচনের উল্লেখ করেছেন তা হল, অন্যায় পথগামী রাজাকে যে সভাসদগণ অনুগমন করেন তাঁরা সেই রাজার পাপের ভাগী হন। সুতরাং রাজাকে সদ্বুদ্ধি দান করা তাঁদের

---

[৯] মলয়েন্দ্র কুমার সেন,*সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা*,পৃ.৮৮

কর্তব্য। অনিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ যদি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ভুল পরামর্শ দেন তাহলে তাঁরা দোষী বলে গণ্য হবেন। কিন্তু রাজাকে নিবারণ না করলে তাঁদের দোষ হবে না।[১০]

শুকসপ্ততিকথায় বিচারকালে রাজার সংশয় দূর করতে সমর্থ ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়েছে এবং যিনি এরূপ করেন তিনি রাজার কাছে প্রধানতা প্রাপ্ত হন।[১১] *হিতোপদেশের* সুহৃদ্ভেদেও একই রকম উপদেশ দেখা যায়। পিঙ্গলক নামক সিংহ বনের রাজা। তার দুই সেবক হল করটক ও দমনক নামে দুই শৃগাল। সেবকের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচ্য আখ্যানটিতে যে উপদেশ দমনক করটককে দিয়েছে সেখানে একজন রাজকর্মচারীর কর্তব্য সম্পর্কে জানা যায়। বলা হয়েছে প্রভুর হিতাকাক্ষী ভৃত্য প্রভুর বিপদের সময়, ভ্রান্তপথে যাওয়ার সময় এবং সঠিক সময় চলে যাচ্ছে দেখলে প্রভু জিজ্ঞাসা না করলেও তাঁকে মার্গনির্দেশ করবেন।[১২] *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* একটি আখ্যানে দেখা যায় রাজসেবক রাজাকে ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ থেকে বিরত করেছেন। রাজা নির্দোষ রাজগুরু শারদানন্দকে ভুল বুঝে তার মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেন। কিন্তু রাজার একনিষ্ঠ সেবক শারদানন্দকে নির্দোষ জেনে তাকে গোপনে রক্ষা করেন। পরে রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলে রাজার সম্মুখে শারদানন্দকে উপস্থিত করেছেন। এই সময় রাজা নিজমুখে ঐ মন্ত্রীর প্রতি তার কার্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। আলোচ্য আখ্যানটিতে ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ থেকে ও ভ্রান্তবিচারের পাপে নিমগ্ন হওয়া থেকে তাঁকে মুক্ত করার জন্য মন্ত্রীর প্রভূত প্রশংসা করেছেন।[১৩]

---

[১০] তত্র নিযুক্তানাং যথাবস্থিতার্থকথনেঽপি যদি রাজা অন্যথা করোতি তদাসৌ নিবারণীয়ঃ অন্যথা দোষঃ। উক্তঞ্চ কাত্যায়নেন অন্যায়েনাপি তং যান্তং যেঽনুযান্তি সভাসদঃ তেঽপি তদ্ভাগিনঃ তস্মাদ্ বোধনীয়ঃ। মিতা.,২.২

[১১] রাজগ্রহে সমায়াতে বিষমে কার্যসংশয়ে।
সন্দিগ্ধমনসাং রাজ্ঞাং প্রধানাঃ সংশয়চ্ছিদঃ।। শুক., ৪৭

[১২] আপদ্যুন্মার্গগমনে কার্যকালাত্যয়েষু চ।
অপৃষ্টেনাপি বক্তব্যং ভৃত্যেন হিতমিচ্ছতা।। হিতো.,৬৪

[১৩] সিংহাসন.,পৃ.১৪

বিচারকার্যে যুক্ত ব্যক্তিরা লোভ, হিংসা কিংবা কারো প্রতি অনুরাগাসক্ত হলে সঠিক নির্ণয়দান সম্ভব নয়। বিচার সেক্ষেত্রে পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে পড়ে। তাই রাজা বিচার-বিবেচনা করে তবেই এদের নিয়োগ করবেন। *কথাসরিৎসাগরের* মদনমঞ্জুকা লম্বকের অষ্টম তরঙ্গে বলা হয়েছে, রাজা সুকৌশলে রাজকর্মচারীদের ভয়, লোভ, ধর্ম ও কাম সম্বন্ধে পরীক্ষা করে তবেই তাঁদের উপযুক্ত কার্যে নিয়োগ করবেন। যখন তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করবে তখন পরীক্ষা করে দেখবেন – কে সত্য, কে দ্বেষপ্রযুক্ত, কে স্নেহপ্রযুক্ত অথবা কে স্বার্থপ্রণোদিত। যার সম্পর্কে অসত্যতার পরিচয় পাবেন তার জন্য উপযুক্ত দণ্ডবিধান করবেন।[১৪]

হিতোপদেশে বলা হয়েছে অভিমান অর্থাৎ আত্মগর্ববশতঃ কিংবা লোভবশতঃ কিংবা ক্রোধের দ্বারা বশীভূত হয়ে কিংবা কোনোরূপ ভয়দ্বারা চালিত হয়ে ন্যায়বিচার করা উচিত নয়। যিনি এইরূপ করেন তিনি নিশ্চিতরূপে নরকগামী হন।[১৫] অর্থাৎ বিচারে কোনো কারণে পক্ষপাত করলে ইহলোকে এবং পরলোকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। বিবাদকে পক্ষপাত থেকে মুক্ত করার এই প্রচেষ্টা স্মৃতিতেও মেলে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, বিচারে নিযুক্ত প্রাড্বিবাক প্রভৃতি সভ্যগণ যদি অপ্রতিরোধ্য রজো গুণের দ্বারা বশীভূত হয়ে, স্নেহ, লোভ, ভয় প্রভৃতির বশে যদি স্মৃতি ও আচার বিরুদ্ধ কাজ করেন তাহলে তাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দণ্ড দিতে হবে।[১৬] *মিতাক্ষরা*কার যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত আলোচ্য শ্লোকটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির জন্য যে পরিমাণ দণ্ড নির্ধারিত থাকবে তার দ্বিগুণ দণ্ড সভ্যগণ প্রত্যেকে পাবেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত 'বিবাদাদ্ দ্বিগুণম্' এই কথাটিকে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, যে বস্তু নিয়ে বিবাদ তার দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হবে এমন অর্থ করা সঠিক হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে স্ত্রীগ্রহণ ইত্যাদি বিবাদের ক্ষেত্রে ঐরূপ দণ্ড দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেছেন, কেবলে স্নেহ, লোভ, ভয় প্রভৃতি কারণরূপে থাকলে

---

[১৪] কথা.,পৃ.১৫৫

[১৫] মানাদ্বা যদি বা লোভাৎ ক্রোধাদ্বা যদি বা ভয়াৎ।
যো ন্যায়মন্যথা ব্রূতে স যাতি নরকং নরঃ।। হিতো.,১০৮

[১৬] রাগাল্লোভাদ্ ভায়াদ্ বাপি স্মৃত্যপেতাদিকারিণঃ।
সভ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ দণ্ড্যা বিবাদাদ্ দ্বিগুণং দমম্।। যাজ্ঞ.,২.৪

তবেই দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হবে। অন্যথায় সভ্যগণ যদি অজ্ঞানতাবশতঃ বা মোহবশতঃ ভুল বিচার করেন তবে ঐ দণ্ড ধার্য হবে না। আখ্যানেও লোভী সভাসদ্গণের প্রভূত শাস্তি বিধান করা হয়েছে। *বিষ্ণুধর্মসূত্রে* ঘুষখোর সভ্যকে দেশ নিষ্কাশনরূপ শাস্তি দিতে বলেছেন। কাত্যায়নের মতে, যদি কেউ সভ্যের ত্রুটির কারণে হেরে যায় তবে তার যে হানি হয় তা সভ্যকেই দিতে হবে।[১৭] বিভিন্ন আখ্যানে অসৎ রাজকর্মচারীদের উপস্থিতির প্রমাণ দেখা যায়। *শুকসপ্ততিকথার* তৃতীয় কথায় ধূর্ত নকল বিমলের বিরুদ্ধে প্রকৃত বিমলনামের ব্যক্তি রাজার কাছে অভিযোগ করেন। রাজা প্রকৃতবিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য রাজপুরুষ প্রেরণ করেন। কিন্তু রাজপুরুষগণ ধূর্ত ও প্রতারক নকল বিমলের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তার অনুকূল হয়ে যায় এবং ঐ নকল ব্যক্তিকেই আসল বিমল বলে রাজা কাছে পরিচয় দেয়।[১৮] রাজকর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ করে বিচারকে প্রভাবিত করার দৃষ্টান্ত *দশকুমারচরিতে*ও রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের অষ্টম উচ্ছ্বাস বিশ্রুতচরিতে বিচারকার্যে যুক্তদের অর্থ গ্রহণের কথা স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯]

২.অপরাধীর শারীরিক ও মানসিক বৈলক্ষণ—শাস্ত্রে ও সাহিত্যে

অপরাধী শব্দটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর শব্দ। কোনো মানুষের জীবনে কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে যদি অপরাধী শব্দটি যুক্ত হয়ে যায় তবে তার জীবনের ধারাটি বদলে যায়। তাই কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করার পূর্বে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ তদন্ত ও সুবিচার আবশ্যক। আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে অপরাধীর বিচারের এক সুস্পষ্ট চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। প্রায় সর্বত্রই অপরাধীকে বিচারকের সম্মুখে হাজির করিয়ে বিচারপ্রক্রিয়া নিষ্পন্ন করা হয়েছে। অনুমানের ভিত্তিতে বিচারক্রিয়া পরিচালিত হয় না, বিচারের ভিত্তি হল প্রমাণ। আখ্যানগুলিতে অপরাধী সনাক্তকরণের বেশ কিছু লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, যার দ্বারা বিচারাধীন ব্যক্তি দোষী কি না তা উপলব্ধি হয়।

---

[১৭] সভ্যদোষাত্তু যন্নষ্টং দেয়ং সভ্যেন তত্তদা।। কাত্যা.,৮১

[১৮] শুক.,পৃ.২০-২২

[১৯] তারাচরণ ভট্টাচার্য,*দশকুমারচরিত*,পৃ.৪২৪-৪২৬

মানুষ বিভিন্ন কারণে অপরাধে লিপ্ত হয়। অপরাধের বেশিরভাগক্ষেত্রেই অপরাধের পিছনে লোভ, কাম, ঈর্ষা, ক্রোধ প্রভৃতি নেতিবাচক প্রবৃত্তিগুলি দায়ী। অন্তর-অন্ধকারাচ্ছন্ন, অপরাধে সংযুক্ত হলে মানুষদের চারিত্রিক ক্রুরতা বা স্বাভাবিক আচারের বৈলক্ষণ তাদের চেহারায়ও প্রস্ফুটিত হয়। ধরা পড়ার পর দণ্ডের ভয়ে এদের চলনে-বলনে অনেক অসঙ্গতি দেখা যায়, কেউ আবার অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হয়ে নিথর নিশ্চুপ হয়ে যান। বিভিন্ন আখ্যানে দোষীর এমন কিছু লক্ষণের কথা পাওয়া যায় যা থেকে অপরাধীর স্বরূপ বিচারক সহজেই অনুমান করতে পারেন। *হিতোপদেশের* বিগ্রহ বিভাগটিতে এরূপ একটি উক্তি পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, পণ্ডিতেরা অন্যদের বর্ণ, আকার, কথার প্রতিধ্বনি, চোখ-মুখের বিকার প্রভৃতি দেখেও মনগত অভিপ্রায় বুঝতে পারেন।[২০]

আখ্যানগুলিতে অপরাধীদের এই সকল শারীরিক বিকার বা লক্ষণগুলিরও উল্লেখ আছে, যা দেখে তাদের অন্তরের অভিপ্রায় বোঝা যায়। *কথাসরিৎসাগরের* মদনমঞ্জুকা লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গের 'বিষ্ণুদত্ত ও তার সপ্তমুর্খ সঙ্গীর কাহিনি'তে দোষী ব্যক্তির মুখমণ্ডল পাণ্ডবর্ণ ধারণ করেছে – এমন উল্লেখ দেখা যায়।[২১] অপরাধী ধরা পড়ে গেলে দণ্ডের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। অন্তরের এই ভীত ভাব শারীরিক ভাবেও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। শারীরিক এই ভাব পরিবর্তন সে চেষ্টা করেও লুকিয়ে রাখতে পারে না, ফলস্বরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কিংবা বিচারক দোষী ব্যক্তির সম্পর্কে সহজেই আন্দাজ করতে পারেন।

মুখ হল মনের আয়নাস্বরূপ – তাই হৃদয়ের অভিব্যক্তি মুখমণ্ডলে প্রস্ফুটিত হবেই। নির্দোষী ব্যক্তির মুখে যেমন ঔজ্জ্বল্যতা বিরাজ করে, তেমনি অপরাধী ব্যক্তির মুখ ফ্যাকাশে বা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। *কথাসরিৎসাগরের* আলোচ্য আখ্যানটিতেও শবরপত্নীর সাথে তার উপপতির অবৈধ সম্পর্কের কথা সকল জানতে পারায় শবরাধিপতির সামনে বিচারকালে তার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে পড়েছে। যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় কার্য করেছে সে সর্বদাই ভীত, সন্ত্রস্ত থাকবে, কারণ

---

[২০] সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, *হিতোপদেশ*, পৃ.৩৩

[২১] কথা., পৃ.১৪১

অপরাধী যত সুক্ষ্মভাবেই তা সম্পাদন করে থাকুক না কেন তার কোনো না কোনো সাক্ষী অবশ্যই থাকবে। অপরাধ প্রকাশিত হবার ভয়ে তাই সে ভীত থাকে।

শুকসপ্ততিকথায় বলা হয়েছে অপরাধী সর্বদা শঙ্কিত হয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু নির্দোষ ব্যক্তি ভয়রহিত হন।[২২] অভিজ্ঞ ও যথার্থ গুণসম্পন্ন বিচারক অপরাধীর শারীরিক নানা লক্ষণ দেখেই দোষী ও নির্দোষী ব্যক্তি নির্ণয় করতে সক্ষম হন। এমনই একটি দৃষ্টান্ত *কথাসরিৎসাগরের* রত্নপ্রভা লম্বকের পঞ্চম তরঙ্গের 'শৃঙ্গভূজ ও রাক্ষসকন্যার কাহিনি'তে দেখা যায়। সেখানে রাজা তার পরমপ্রিয় রক্ষক সুরক্ষিতকে ধর্মাধিকরণে আহ্বান করেছেন। রাজ্ঞীর সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক আছে এমন অভিযোগ থাকায় তাকে নির্বাসনরূপ দণ্ড দিয়েছেন। আবার রাজমহিষীকেও এই একই অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু দণ্ড বিধানকালে এঁদের উভয়ের মুখেই রাজা ভয়ের লেশমাত্রও পর্যবেক্ষণ করেননি। যা রাজাকে তার সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু রাজমহিষী ও সুরক্ষিতের নির্দোষী হওয়ার সপক্ষে কোনো প্রমাণ না থাকায় ঐ দণ্ডই আপাতত বহাল রেখেছিলেন। প্রকৃত দোষী অন্বেষণ প্রক্রিয়াটি গোপনে চালিয়ে গেছেন। শেষে মিথ্যাভিযোগকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের অন্বেষণ করে তাঁদের শাস্তি দিয়েছেন। রাজ্ঞী ও সুরক্ষিতকে মুক্ত করেছেন।[২৩] এক্ষেত্রে নির্দোষী ব্যক্তির মুখের ভাব দেখেই রাজা তাদের নিরপরাধীতা বিষয়ে বুঝতে পেরেছেন এবং প্রকৃত দোষীকে অন্বেষণ করেছেন। সুতরাং অপরাধী ব্যক্তির ভাব পরিবর্তন কিংবা অভিব্যক্তি দেখে বিচারক অপরাধী বিষয়ে অনুমান নিশ্চই করতে পারেন, কিন্তু অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে দণ্ড প্রদান যথার্থ বিচার নয়, তাই প্রমাণ দেখে তবেই তিনি রায়দান করেন। তবে, *কথাসরিৎসাগরের* রত্নপ্রভা লম্বকের নবম তরঙ্গের 'অর্থলোভ ও তার সুন্দরী পত্নীর কাহিনি'তেও এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেখানে রাজা অপরাধীর ভাবের বহিঃপ্রকাশ দেখে সত্য

[২২] শুক.,পৃ.২৭২

[২৩] কথা.,পৃ.১৭৯

অনুধাবনে সমর্থ হয়েছেন।[২৪] সেখানে অর্থলোভকে রাজা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে নিরুত্তর হয়ে অধোমুখে দণ্ডায়মান থেকেছে। যা দেখে রাজা সে দোষী তা বুঝতে পেরেছেন।

দোষী ব্যক্তির শারীরিক আকৃতি পরিবর্তন হয়ে কীরূপ হয় তা একাধিক আখ্যানে উল্লিখিত হয়েছে। *শুকসপ্ততিকথার* সপ্তপঞ্চাশত্তম কথায় রাজা শুভঙ্কর নামক এক পণ্ডিতকে দোষী জেনে, তাঁকে যখন সেবিষয়ে প্রশ্ন করেছেন, দণ্ডের ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।[২৫] কারণ সাধারণ মানুষের সাথে অন্যায় আচরণ করলেই দণ্ড পেতে হয়, রাজার সাথে অন্যায় আচরণের শাস্তি ভয়াবহ হবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। *কথাসরিৎসাগরের* লাবাণক লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গে অপরাধী ব্যক্তির শারীরিক বৈলক্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলোচ্য আখ্যানটিতে রাজা ও রাজমহিষী আপন পুত্রহত্যার কারণ হয়েছেন। অপরাধের অনুশোচনায় বিদ্ধ হয়ে তারা দুজন মন্ত্রীদের যখন একথা ব্যক্ত করেছেন তখন সকলের সম্মুখে অধোমুখে দণ্ডায়মান থেকেছেন, তাদের দৃষ্টি সর্বদা ভূমিতেই নিবদ্ধ ছিল, পুত্রহত্যার শোকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না।[২৬] অর্থাৎ অপরাধী দণ্ডের ভয়ে হোক কিংবা অনুশোচনা বিদ্ধ হয়ে তার চেহারায় তার অন্তরের ভাব প্রকাশিত হবেই। অপরাধপ্রবণ, দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তির বিকার চিহ্ন সম্পর্কে স্মৃতিতেও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থী, প্রত্যর্থী বা সাক্ষী এদের মধ্যে কিছু লক্ষণ বা বিকারচিহ্ন দর্শন করে দোষীব্যক্তি কে সে বিষয়ে ধারণালাভ করা যায়।

যে ব্যক্তির মন বাক্য, শরীর ও কর্মে স্বভাবতঃ বিকার দেখা যায়, সেই ব্যক্তিকে অভিযোগ বা সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে পণ্ডিতগণ দোষী বলে মনে করেন। এই বিকার কী প্রকার হয় তা স্পষ্টভাষায় আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি দেশ থেকে দেশান্তরে যায়, কোথাও স্থির থাকতে পারে না, ওষ্ঠ প্রান্তদুটিকে জিহ্বার অগ্রভাগের দ্বারা বার বার স্পর্শ করেন – এগুলি হল কর্মের বিকৃতি। ঐ ব্যক্তির ললাট ঘর্মাক্ত হয়, মুখ বিবর্ণ হয়, কখনও সাদা কখনও কালো বর্ণ

---

[২৪] কথা.,পৃ.১৯৭

[২৫] শুক.,পৃ.২৩৩

[২৬] কথা.,পৃ.৭৬-৭৭

ধারণ করে - এগুলি শরীরের বিকার। কথা বলতে গেলে তার কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে ওঠে এবং সে উল্টো পাল্টা সামঞ্জস্যহীন বাক্য বলে, পূর্বের কথার সঙ্গে পরের কথার সঙ্গতি নেই এমন কথা বলে এবং স্বাভাবিক কথার চেয়ে অনেক বেশি কথা বলে – এগুলি বাক্যের বিকার। অপরের উক্তিকে প্রত্যুক্তির দ্বারা বাকপূজা করেন না, আবার কেউ তার দিকে দৃষ্টপাত করলে প্রতিদর্শনের দ্বারা চক্ষুপূজা করেন না, ক্ষণে ক্ষণে ঠোট বাঁকায় – এগুলিও সম্ভাব্য অপরাধীর শরীরের বিকার।[২৭]

কিন্তু এই বিকারগুলি দ্বারা দোষের সম্ভাবনামাত্র বোঝা যায়। দোষনিশ্চয় কিন্তু এগুলির উপরে নির্ভর করে করা হয় না। কারণ, কোনটি স্বাভাবিক বিকার এবং কোনটি নৈমিত্তিক বিকার তা পৃথকভাবে বোঝা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। যদি বা কোনো ব্যক্তি অধিক বুদ্ধির বলে উভয়ের পার্থক্যটি বুঝতে পারেন, তথাপি তা পরাজয় নিশ্চয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। কারণ মরণোন্মুখ মানুষের মৃত্যুচিহ্ন দর্শন করে কেউ মৃতের কার্য সম্পাদন করে না। তেমনি এর পরাজয় হবে এই মনে করে দোষীর চিহ্ন দর্শন করে দোষ সম্ভাবনার কথা কল্পনা করা গেলেও ঐ কল্পনার উপর নির্ভর করে কাউকে শাস্তি প্রদান করা অনুচিত।

৩.আখ্যানে উপলব্ধ বিচারপদ্ধতি

আখ্যানগুলিতে বিভিন্ন অপরাধের চিত্র যেমন ধরা পড়েছে তেমনি তা মীমাংসা করার জন্য বাদী-প্রতিবাদীকে বিচারালয়ের শরণাপন্নও হতে হয়েছে এমন নিদর্শনও বহু দেখা যায়। কাহিনিগুলিতে বিচারপ্রার্থী কোথাও রাজার কাছে কোথাও প্রাড্বিবাকের কাছে আপন সমস্যার

---

[২৭] দেশাদ্ দেশান্তরং যাতি সৃক্কিনী পরিলেঢ়ি চ।
ললাটং স্বিদ্যতে চাস্য মুখং বৈবর্ণ্যমেতি চ।।
পরিশুষ্যৎস্খলদ্বাক্যো বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
বাক্ চক্ষুঃ পূজয়তি নো তথোষ্ঠৌ নির্ভুজত্যপি।।
স্বভাবাদ্ বিকৃতিং গচ্ছেন্ মনোবাক্কায়কর্মভিঃ।
অভিযোগেঽথ সাক্ষ্যে বা দুষ্টঃ স পরিকীর্তিতঃ।। যাজ্ঞ.,২.১৩-১৫

কথা জানিয়েছেন। বিচারকর্তাও নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী সত্যানুসন্ধানপূর্বক যাচককে ন্যায় পাইয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। আখ্যানসাহিত্যে উপলব্ধ বিবাদপদসমূহে বিচারপদ্ধতির ক্ষেত্রেও স্মৃতি উল্লিখিত নির্দিষ্টক্রমের প্রতিফলন দেখা যায়। কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে বিচারপদ্ধতির চারটি পাদেরই অনুসরণ করে বিবাদ নিরসন করা হয়েছে। আবার যেক্ষেত্রে অপরাধী নিজে অপরাধ স্বীকার করেছে কিংবা সন্দেহভাজন ব্যক্তি নিশ্চিত অপরাধী এরূপ জানা গেছে সেক্ষেত্রে বিচার দ্বিপাদেই নিষ্পন্ন হয়েছে।

যে কোনো সমস্যার সমাধানে কিংবা ন্যায়বিরুদ্ধভাবে কারো দ্বারা আক্রান্ত হলে রাজার কাছে বিচার চাইতে দেখা যায়। ন্যায়ালয়ের উপরে পরিপূর্ণ আস্থার এক সুন্দর চিত্র আখ্যানগুলিতে ফুটে উঠেছে। রাজাকেও প্রার্থীকে সুবিচার পাইয়ে দিতে তৎপর দেখা যায়। তবে কোনো কোনো কাহিনীতে ধর্মও ব্যক্তির কাছেও বিবাদের মীমাংসা করে দেওয়ার অনুরোধ করতেও দেখা যায়। যেহেতু রাজা ধর্মশাস্ত্রানুসারেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন তাই ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে বিচারকের আসনে বসিয়ে বিচার প্রার্থনা করা হয়েছে – এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়।

পঞ্চতন্ত্রের কাকোলূকীয়ম্-এর 'শশ-কপিঞ্জলকথা'য় খরগোশ ও চড়ুই পাখিটি তাদের মধ্যে বাসস্থান নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হওয়ায় এক বিড়ালের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়েছে। এক্ষেত্রে বিড়ালটিকে তারা বিচারকাসনে বসিয়েছে কারণ তাদের যুক্তিতে বিড়ালটি স্মৃতিতে উল্লিখিত বিচারকের গুণসম্পন্ন। ধর্মশাস্ত্রের নানা তত্ত্বকথা সম্পর্কে অবগত হওয়ায় তারা বিড়ালটির ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ আইনজ্ঞ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে। তাই তারা বিড়ালটির কাছে ধর্মশাস্ত্রানুসারে তাদের বিবাদ নিরসনের আবেদন জানিয়েছে।[২৮] *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* তৃতীয় উপাখ্যানে রত্নগ্রহণ নিয়ে ব্রাহ্মণের পরিবারে বিবাদি সৃষ্টি হলে, ব্রাহ্মণ নৃপতির নিকট উপস্থিত হয়ে সকল কথা জানিয়ে, মীমাংসা করে দিতে অনুরোধ করেছেন যেহেতু রাজাই ছিলেন ন্যায় ও নীতির নির্ধারণ কর্তা।[২৯] *বেতালপঞ্চবিংশতি* গ্রন্থটির তৃতীয় উপাখ্যানে স্বামী কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায়, স্ত্রী তার

---

[২৮] পঞ্চ.,পৃ.৪৯২

[২৯] সিংহাসন.,পৃ.২৫

স্বামীর শাস্তির জন্য রাজার কাছে বিচার প্রার্থী হয়েছে। রাজাও ধর্মানুসারে তথ্যানুসন্ধানপূর্বক সুবিচার করেছেন।[৩০] স্মৃতিতেও বলা হয়েছে ন্যায়বিরুদ্ধ পথে কেউ কারো দ্বারা আক্রান্ত হলে রাজার কাছে ন্যায় বিচারের আবেদন করবেন। রাজাও ধর্মশাস্ত্রানুসারে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন – এমনটাই স্মৃতির বিধান।[৩১]

৩.১.চতুষ্পাদ ব্যবহারের স্বরূপ নিরূপণ বিচার

আখ্যান-উপাখ্যানগুলির বিচারপদ্ধতিটিকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষেণ করলে দেখা যায়, সেখানে প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই স্মৃতিবিহিত ব্যবহারের চার পাদের কাঠামোটি রয়েছে। দোষী অন্বেষণ হোক কিংবা কাউকে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ায় হোক বিচারক এই নির্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। *পঞ্চতন্ত্রে* মিত্রভেদের 'ধর্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধিকথা'য় ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধির মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হওয়ায় তারা ন্যায়ালয়ে গমন করেছে। সেখানে ন্যায়াধীশ প্রথমে এক পক্ষের বক্তব্য শুনে তার প্রত্যুত্তরে অপরপক্ষকে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিয়েছেন। যাকে ভাষাপাদ ও উত্তরপাদের দৃষ্টান্ত বলা যেতেই পারে। এরপর লেখ্যপ্রমাণ উপলব্ধ না থাকায় সাক্ষীপ্রমাণ পেশ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে যেহেতু উভয়েই বন মধ্যস্থ একটি বৃক্ষকে সাক্ষী রেখে তারা সম্পদ প্রোথিত করেছিল তাই তাকেই সাক্ষী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। প্রমাণ পেশের এই ধাপটি ক্রিয়াপাদ বলেই পরিচিত। এরপর ন্যায়াধীশ ও সভ্যগণ সাক্ষীর সত্যতা যাচাই করে, যথানুপূর্বক বিবেচনা করে পাপবুদ্ধিকে দোষী বলে চিহ্নিত করেছেন এবং উপযুক্ত দণ্ডবিধান করেছেন। ধর্মবুদ্ধির কথার সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় – সে জয়লাভ করেছে। বিবাদের নিষ্পত্তিসংক্রান্ত এই ধাপটি সাধ্যসিদ্ধিপাদ বলা অসংগত হবে না।[৩২]

---

[৩০] দামোদর ঝা,*বেতালপঞ্চবিংশতি*,পৃ.২৮-২৯

[৩১] স্মৃত্যাচারব্যাপতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্ রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ।। যাজ্ঞ.,২.৫

[৩২] পঞ্চ.,পৃ.২৮১

কথাসরিৎসাগরের রত্নপ্রভা লম্বকের নবম তরঙ্গের 'অর্থলোভ ও তার সুন্দরী পত্নীর কাহিনি'তেও বিচার ব্যবস্থার চতুষ্পাদ ব্যবহারের ক্রমানুযায়ী বিচারকার্যটি সম্পন্ন হতে দেখা যায়। আখ্যানটিতে অর্থলোভ তার স্ত্রী মানপরাকে বলপূর্বক সুখধন নামক এক বণিক অপহরণ করেছে – এমন অভিযোগ নিয়েই রাজার শরণাপন্ন হয়েছে। রাজার কাছে আপন অভিযোগ সমস্ত জানিয়েছে। রাজা সুখধনের উত্তর লিপিবদ্ধ করেছেন। রাজা অর্থলোভকে আপন বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে আদেশ দিয়েছেন। মানপরার সাক্ষ্য গ্রহণ করে অর্থলোভের অভিযোগ অসত্য তা বুঝতে পেরে অর্থলোভকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে শাস্তি প্রদান করেছেন। এখানে অর্থলোভের রাজার কাছে অভিযোগ পেশ ভাষাপাদ, রাজার দ্বারা সুখধনের উত্তর লিপিবদ্ধকরণ উত্তরপাদ, রাজাকর্তৃক প্রমাণ পেশের জন্য অর্থলোভকে আদেশ ও মানপরার সাক্ষ্য গ্রহণ ক্রিয়াপাদের উদাহরণ। সবশেষে অর্থলোভের সাধ্যটি অসিদ্ধ বলে বিবেচিত হওয়ায়, বিচারে তার পরাজয় ও সুখধনের জয় সাধ্যসিদ্ধিপাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ।[৩৩]

কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গের 'উপকোশার কাহিনি'তেও চতুষ্পাদ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। উপকোশার স্বামী বিদেশ গমনের পূর্বে এক বণিকের কাছে সম্পদ সমূহ গচ্ছিত রেখে যান। কিন্তু উপকোশা তা ফেরৎ চাইলে বণিক প্রত্যর্পণে অস্বীকার করেন। উপকোশার স্বামী তার কাছে কোনো সম্পদই রাখেনি এমন দাবী করেছে। বণিক হিরণ্যগুপ্ত তার স্বামী কর্তৃক ন্যস্ত ধন আত্মসাৎ করেছে – উপকোশা রাজার কাছে এমন অভিযোগ জানিয়েছে। বণিকের দ্বারা অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হয়ে উপকোশা স্বয়ং রাজাকে তার অভিযোগ জানিয়েছে- ভাষাপাদেরই অংশ। উপকোশার অভিযোগ শুনে রাজা বণিককে তলব করে তার উত্তর শুনেছেন – ইহা উত্তরপাদ। রাজা উপকোশাকে তার অভিযোগে সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং উপকোশা সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করেছে – ইহা ক্রিয়াপাদ এবং সাক্ষ্য দ্বারা সে তার

[৩৩] কথা.,পৃ.১৯৬-১৯৭

বক্তব্যকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে তাই বিচার তার জয় হয়েছে ও বণিককে শাস্তি পেতে হয়েছে – ইহা সাধ্যসিদ্ধিপাদের দৃষ্টান্ত।[৩৪]

পঞ্চতন্ত্রের মিত্রভেদের 'লৌহতুলা বণিকপুত্রকথা'য় বণিক তার পুত্রচুরির অপরাধে জীর্ণধনের বিরুদ্ধে রাজার কাছে নালিশ জানিয়েছে – ইহাকে ভাষাপাদ বলা যায়। রাজা জীর্ণধনের বক্তব্য শ্রবণ করেছেন ইহা উত্তরপাদ। জীর্ণধন নিজের বক্তব্যের সপক্ষে যথাযথ যুক্তি ও প্রমাণ পেশ করেছে ইহা ক্রিয়াপাদ এবং শেষে নিজের বক্তব্য প্রমাণ করতে না পারায় বণিকের পরাজয় হয়েছে, জীর্ণধন জয়লাভ করেছে এবং নিজের গচ্ছিত ধন ফিরে পেয়েছে ইহা সাধ্যসিদ্ধিপাদের দৃষ্টান্ত।[৩৫]

দশকুমারচরিতের অপহারবর্মাচরিতেও বিচারব্যবস্থার যে চিত্রটি ধরা পড়েছে সেখানেও স্মৃতিবিহিত রূপটিই চোখে পড়ে। ধনমিত্র তার চর্মথলিকা গণিকা কামমঞ্জরীর কাছে আছে, অথচ কামমঞ্জরী তা প্রত্যর্পণে অস্বীকার করছে – এমন অভিযোগ নিয়ে রাজার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করেছেন। তার অভিযোগের ভিত্তিতে রাজা গণিকাকে ন্যায়ালয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন, চর্মথলিকা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এবং তাদের উত্তর শুনেছেন। তাদের সকল সত্যবৃত্তান্ত রাজার কাছে নিবেদন করে তারা অর্থপতিকে প্রকৃত চোর বলে দাবী করেছে। রাজাও অর্থপতিকে দেশ থেকে নির্বাসনরূপ দণ্ড দিয়েছেন। এখানে ধনমিত্রের অভিযোগপেশ ভাষাপাদ, কামমঞ্জরী ও তার মাকে ন্যায়ালয়ে তলব ও তাদের বক্তব্য পেশ, চর্মথলিকা চুরির বিষয়টি অস্বীকার করা – এগুলি সবই উত্তরপাদের অন্তর্গত। রাজা তাদের দুজনকে নানা প্রকার ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করেছেন ও তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অর্থপতিকে চর্মথলির অপহরণকর্তারূপে নির্দিষ্ট করণ করেছেন – এগুলি ক্রিয়াপাদেরই ঘটনা সমূহ। ধনমিত্রের জয়লাভ ও অর্থপতিকে নির্বাসনরূপ দণ্ড প্রদান সাধ্যসিদ্ধিপাদের নমুনা।[৩৬]

---

[৩৪] কথা.,পৃ.৮-১০

[৩৫] পঞ্চ.,পৃ.২৯৩

[৩৬] দশ.,পৃ.১৮০-২০০

তবে সবক্ষেত্রেই যে বিবাদের ন্যায়প্রতিষ্ঠা সহজ-সরলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এমন নয়। কোথাও মিথ্যা সাক্ষী দ্বারা বিচারের রায়কে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, কোথাও বিচার সম্পন্ন হওয়ার পর সাক্ষী উপস্থিত হয়েছে। উপস্থিত সাক্ষীর ওপরে ভিত্তি করে পূর্বে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কোথাও অভিযোগকারীর মিথ্যা অভিযোগ ধরা পড়েছে এবং সে সাজা প্রাপ্ত হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া তাই – তা চারটি ধাপে সুষ্ঠুক্রমে তা সম্পন্ন হয়েছে এমন নয়। যেমন – *বেতালপঞ্চবিংশতি* গ্রন্থের তৃতীয় উপাখ্যানে স্ত্রীকে আঘাত করার অপরাধে তার পিতা রাজদ্বারে গমন করে অভিযোগ জানিয়েছে। প্রাড্বিবাক তার জামাতাকে বিচারালয়ে আসার আদেশ দিয়েছেন। স্ত্রী ও তার পিতার অভিযোগের ভিত্তিতে জামাতার উত্তর রাজা শ্রবণ করেছেন। স্ত্রী আপন ক্ষত দেখিয়ে ও নানান যুক্তি পেশ করে আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছে, কিন্তু তার স্বামী কোনোরূপ প্রমাণাদি পেশ করতে না পারায় অধোবদনে দণ্ডায়মান থেকেছে। প্রাড্বিবাক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তাকে মৃত্যুদণ্ডরূপ শাস্তি প্রদান করেছেন। এখানে স্ত্রীর অভিযোগ পেশ ভাষাপাদ, তার স্বামীর উত্তর দান উত্তরপাদ, প্রমাণাদি পেশ ক্রিয়াপাদ ও স্ত্রীর জয় তথা তার স্বামীর পরাজয় ও দণ্ডপ্রাপ্তি সাধ্যসিদ্ধিপাদের দৃষ্টান্ত। তবে বিচারপ্রক্রিয়াটি এখানেই সম্পন্ন হয়নি, স্বামীকে শূলে চড়ানোর জন্য বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাওয়ার সময় একজন চোর এসে সাক্ষ্যদান করে, সে নিরপরাধ, তা প্রমাণ করেছে। তার ভিত্তিতে নির্দোষী মুক্ত হয়েছে এবং মিথ্যাভিযোগকারী স্ত্রী আপন কৃত কর্মের জন্য দণ্ডিত হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়া যে সবসময় স্মৃতি নির্দিষ্ট ধাঁচেই নিষ্পন্ন হয়েছে এমন নয়।[৩৭]

হিতোপদেশের সুহৃদভেদের পঞ্চম কথায় এক নাপিতের স্ত্রী তার স্বামী নাক কেটে দিয়েছে এমন অভিয়োগ নিয়ে রাজার কাছে নাপিতের শাস্তির দাবী করেছেন – আক্রান্ত ব্যক্তির বিচারের এই আবেদন অবশ্যই ভাষাপাদ বলে গণ্য করা যায়। রাজা নাপিতকে ডেকে সব জিজ্ঞাসা করলে নাপিত সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে- উত্তর প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি এইপাদে সম্পন্ন হয়েছে তাই উত্তরপাদ, নাপিতের স্ত্রী তার ক্ষত ও নাপিতের রক্তাক্ত ক্ষুর দেখিয়ে নিজের বক্তব্যকে

---

[৩৭] বেতাল.,পৃ.২৮-৩০

সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু নাপিত তার নিজের সপক্ষে কোনো প্রমাণ- কোনো যুক্তি দেখাতে পারেনি- প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তাই এটি অবশ্যই ক্রিয়াপাদ বলে বিবেচনা করা যায়। নিজের সাধ্য বা বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে বলে নাপিতের স্ত্রীর সাধ্যসিদ্ধি ঘটেছে – এটি সাধ্যসিদ্ধিপাদ।

বিচারে নাপিতের মৃত্যুদণ্ডরূপ শাস্তি দেওয়া হয়েছে। বিচারটি এখানেই শেষ হলে আমাদের কাছে বিচারব্যবস্থার সরলরূপটি প্রকট হত। কিন্তু এক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা এত সরলভাবে হয়নি। নাপিতকে শাস্তির জন্য বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি চোর এসে সমস্ত সত্য বৃত্তান্ত ন্যায়ালয়ে জানায় এবং তার কথার সত্যতা যাচাই করে ন্যায়াধীশ নাপিতকে মুক্ত করেন, নাপিতের স্ত্রীকে মিথ্যা অভিযোগের দায়ে দণ্ডিত করেন। আবার চোরের সাক্ষ্যর ওপরে ভিত্তি করে গোয়ালার স্ত্রীও পরপুরুষগামী হওয়ায় দণ্ডিত হয়েছে। নাপিতের স্ত্রীর সাথে তার বিবাদ ও গোয়ালা- তার স্ত্রীর সাথে বিবাদটি সংযুক্ত নয় কিন্তু বিচারক চোরের সাক্ষ্যর ভিত্তিতে একটি মামলাকে অন্য মামলার সাথে সংযুক্ত করে দোষীকে শাস্তি দিয়েছেন।[৩৮] অর্থাৎ বিচারকার্য এক্ষেত্রে স্মৃতি বিরুদ্ধ পথেই সমাধা হয়েছে বলা যায়।

স্মৃতিতে যেমন দুটিপাদেই বিচারক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে, আখ্যান-উপাখ্যানেও ব্যবহারের দ্বিপাদের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। *কথাসরিৎসাগরের* রত্নপ্রভা লম্বকের অষ্টম তরঙ্গের ‘পরিত্যাগসেন, তার দুষ্টভার্যা ও দুই পুত্রের কাহিনি’তে ইন্দীবরসেনের মৃত্যুতে অভিযুক্ত খড়্গদংষ্ট্রাকে তার অপরাধের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে সে তা স্বীকার করে নিয়েছে এবং বিচার ক্রিয়াটি সেখানেই সম্পন্ন হয়েছে। যদিও সে ভুলবশতঃ অপরাধ করায় এবং সত্য কথা বলায় তার শাস্তি হয়নি।[৩৯] অপরাধ স্বীকার করে নেওয়ায় অপরাধী অনুসন্ধান কার্যটি সেখানেই সমাপ্ত হয়েছে। এমন অপর একটি দৃষ্টান্ত আলোচ্য গ্রন্থটির মদনমঞ্জুকা লম্বকের প্রথম তরঙ্গের ‘সপ্ত দ্বিজের কাহিনি’তে দেখা যায়। আখ্যানগুলিতে বিচারের নির্দিষ্ট ক্রমের দৃষ্টান্তের পাশাপাশি বিভিন্ন আখ্যান

---

[৩৮] হিতো.,পৃ.৭২

[৩৯] কথা.,পৃ.১৯২-১৯৩

থেকে ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, ক্রিয়াপাদ ও সাধ্যসিদ্ধিপাদ বিষয়ে একাধিক নিয়মবিধি সম্পর্কেও জানা যায়। আখ্যানে ও স্মৃতিতে প্রাপ্ত এই চারটি পাদের নিয়মবিধি বিষয়ক তথ্যগুলি বিক্ষিপ্ত হলেও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

৩.২.ভাষাপাদের স্বরূপ ও আখ্যানে তার বিচার

শুকসপ্ততিকথার দ্বিপঞ্চাশৎ কথায় চারজন ব্যক্তি তাদের উপার্জিত রত্ন তাদেরই এক সঙ্গীর কাছে গচ্ছিত রাখে। কিন্তু ঐ সঙ্গীটি সকল রত্নই আত্মসাৎ করে, তখন তারা সকলে ন্যায়প্রার্থী হয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে আপন অভিযোগ জানিয়েছে। বিচারের আবেদন করার পর রাজা ও মন্ত্রী তাদের কাছে রত্নগুলির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা রত্ন কোথায়, কবে, কিভাবে পেয়েছে এবং কিভাবে তা হারিয়েছে – এই সকল তথ্য পুঙ্খানুপঙ্খ বর্ণনা করেছে। তবেই তাদের অভিযোগ গৃহীত হয়েছে এবং বিচার শুরু হয়েছে। স্মৃতি ও আচারগর্হিত পথে আক্রান্ত ব্যক্তি স্বয়ং এসে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে রাজার নিকট আবেদন করবেন তবেই তা গ্রহণীয় হবে। যাজ্ঞবল্ক্য, স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, অর্থীকে স্বয়ং আবেদন করতে হবে।[৪০] অর্থীর আবেদনটি যুক্তিযুক্ত হলে প্রত্যর্থীকে আহ্বান করা হবে। প্রত্যর্থীর সম্মুখে অর্থী পূর্বে যা যা বলেছে তা অপরিবর্তিতভাবে লিখিত হবে। লেখার সময় কোনো কথা পরিবর্তন করা যাবে না। লেখ্যপত্রে বৎসর, মাস, পক্ষ, দিন, নাম, জাতি, স্থান প্রভৃতির সুস্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে।[৪১]

পঞ্চতন্ত্রের কাকোলূকীয়ম্ এর 'শশ-কপিঞ্জলকথা' থেকেও জানা যায় যে বিচারপ্রার্থীকে বিচারকের কাছে সশব্দে, সুস্পষ্টভাবে আপন বক্তব্য বলা উচিত। কারণ খরগোশ ও চড়াই পাখিটি বিড়ালকে বিচারক মেনে যখন তার কাছে বিচার প্রার্থী হয়েছে তখন বিড়াল দুষ্টস্বভাবের এবং তাদের উভয়কে ভক্ষণ করতে চাইছে – এরূপ কাহিনির মধ্য দিয়ে বিষ্ণুশর্মা বিচারব্যবস্থার কয়েকটি বিধিবিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেখানে বিড়াল খরগোশ ও চড়ুইকে তাদের

---

[৪০] ...আবেদয়তি চেদ্ রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তত্। যাজ্ঞ.,২.৫

[৪১] প্রত্যর্থিনোঽগ্রতো লেখ্যং যথাবেদিতমর্থিনা।
সমামাসতদর্ধাহর্নামজাত্যাদি চিহ্নিতম্।। তদেব,২.৬

বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে, সশব্দে তার নিকটে এসে জানাতে বলেছে। তবেই অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে।[৪২] যে যে অভিযোগ যেমন গ্রাহ্য নয় তেমনি সকল ব্যক্তির অভিযোগও গ্রাহ্য নয় এমন কথা স্মৃতিতেও বলা হয়েছে। *শুকসপ্ততিকথার* একবিংশকথায় স্বভাবকুটিল এক কুট্টনী সম্ভ্রান্ত কুলবধূ এক বণিকের পুত্রবধূর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও তার অভিযোগ গ্রাহ্য করা হয়নি।[৪৩]

যথার্থ আবেদন কিরূপ হবে স্মৃতিতে সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বে আবেদিত প্রকৃত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রসিদ্ধ, অবিরুদ্ধ, নিশ্চিতভাবে সাধনে সক্ষম, সংক্ষিপ্ত, সমগ্র বিষয়ের বোধক, দেশ ও কালের অবিরোধী অর্থযুক্ত বৎসরাদি ও সাধ্যসম্বন্ধে উল্লিখিত, সাধ্যপ্রমাণের সংখ্যা, অর্থী ও প্রত্যর্থীর নামাদি, পূর্বপুরুষ ও পূর্ববর্তী রাজাদের নামযুক্ত নিজ পীড়ার উল্লেখযুক্ত লিখিত আবেদনকেই 'ভাষা' বলে। *মিতাক্ষরা*কারের মতে ভাষা শব্দের দ্বারা প্রতিজ্ঞা বা পক্ষ বোঝানো হয়। এগুলি সমার্থক শব্দ।[৪৪] যা প্রার্থনা করা হয় তাই হল অর্থ অর্থাৎ সাধ্য। সেই অর্থ যার কাছে আছে সেই হল অর্থী। তার প্রতিপক্ষ হল প্রত্যর্থী। সেই প্রত্যর্থীর সম্মুখে লেখ্যপত্র প্রস্তুত করতে হবে। অর্থী আবেদনের সময় যা যেভাবে জানিয়েছে তা সেভাবেই লিখতে হবে। কোনো ভাবেই তার অন্যথা করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আবেদন কালেই তো পীড়নের বিষয়ে বলা হয়েছে, তবে আবার লেখার কী প্রয়োজন ? এর উত্তরে বলা হয় লেখ্যপত্রে অর্থী ও প্রত্যর্থীর নাম, গোত্র, জাতি ইত্যাদি এবং অভিযোগ দিবসের বৎসর, মাস, পক্ষ, তিথি, বার প্রভৃতি চিহ্নিত করতে হবে।[৪৫] বিবাদাস্পদীভূত দ্রব্যের পরিচয়, তার সংখ্যা, স্থান, দিনের কোন ভাগ ইত্যাদির উল্লেখ থাকতে হবে।

আবেদনকালে কেবল কার্যমাত্র লিখিত হয়, আর প্রত্যর্থীর সামনে বৎসর, মাস প্রভৃতি উল্লেখ করে লেখ্যপত্র রচনা করা হয়- এই হল উভয়ের পার্থক্য। *মিতাক্ষরা*কারের মতে, যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ভাষাপাদ সম্বন্ধীয় শ্লোকটিতে 'সংবৎসর' এই বিশেষণের উল্লেখ যদিও সকল

---

[৪২] পঞ্চ.,পৃ.৪৯৭

[৪৩] শুক.,পৃ.১০৭

[৪৪] ভাষা প্রতিজ্ঞা পক্ষ ইতি নামান্তরম্। মিতা.,২.৬

[৪৫] আবেদনকালে এবার্ত্তিবচনস্য লিখিতত্বাৎ পুনর্লেখনম্ অনর্থকম্ ইত্যত আহ- সমামাসেত্যাদি। তদেব,২.৬

ব্যবহারে প্রয়োজনীয় নয়, তথাপি আধি, প্রতিগ্রহ ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে তা কালনির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয়। কারণ এই তিনটির ক্ষেত্রে পূর্বের ক্রিয়াকে বলবতী বলা হয়েছে। কার ক্রিয়াটি পূর্ববর্তী তা নির্ধারণের জন্য বৎসরের উল্লেখ থাকা বিশেষ প্রয়োজন। অর্থের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বৎসরের উল্লেখ করা উচিত। কারণ হয়তো কেউ কোনো বৎসরে বিশেষ সংখ্যক দ্রব্য কারো কাছ থেকে গ্রহণ করলো কিন্তু ফেরৎ চাইলে বলল নিয়েছিলাম সত্যই, কিন্তু ফেরৎ দিয়েছি। সেক্ষেত্রে বৎসরের উল্লেখ থাকলে লেখ্যটি দেখে বলা যাবে যে তুমি পূর্বের বৎসরে ফেরৎ দিয়েছো, বর্তমান বৎসরে নয়। মাস প্রভৃতির উল্লেখও একই কারণে বাঞ্ছনীয়। তবে, অর্থীর সকল আবেদন বিচার্য হত এমনটা নয়। সময়, স্থান, দ্রব্যাদির স্পষ্ট বিবরণের অভাবে আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। অর্থীর আবেদন বাতিল হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি একাধিক শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক আলোচিত হয়েছে- এমনটা *মিতাক্ষরা*কারের আলোচনায় স্পষ্টতই চোখে পড়ে। শাস্ত্রকারের নাম উল্লেখ না করলেও অভিযোগের ক্ষেত্রে অপ্রসিদ্ধ, নিরাবাদ (পীড়ারহিত), নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন, অসাধ্য ও পুরোরাষ্ট্র বিরুদ্ধ অভিযোগ- এইগুলিকে বিচারের অযোগ্য অভিযোগ বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৬] নারদ অর্থীর অভিযোগপত্রের সাতটি দোষের কথা বলেছেন। তাঁর মতে অন্যার্থ, অর্থহীন, প্রমাণবর্জিত, আগমবর্জিত, হীন, একাধিক ও ভ্রষ্ট এগুলি হল অভিযোগপত্রের দোষ।[৪৭] অর্থহীন অভিযোগ, দ্রব্যাদির বিষয়ে প্রমাণরহিত, পরিমাণ অনুল্লিখিত, একাধিক লোকের বিরুদ্ধ হওয়ায় নগর বা রাষ্ট্রের বিরোধ সৃষ্টিকারী অভিযোগ অস্বীকার্য ছিল। সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারিক রীতি ও নিয়ম বহির্ভূত নয় এমন অভিযোগই গ্রাহ্য হত।

রাষ্ট্রবিরুদ্ধ বা রাষ্ট্রের পক্ষে হানিকর এমন অভিযোগ দুষ্ট বলে বিবেচিত হত। রাজা দ্বারা বর্জিত হয়েছে, যে ব্যবহার পুরো বিরোধী ও রাষ্ট্রের বিরোধী, সমগ্র প্রকৃতির অর্থাৎ নগরবাসী-মানুষের বিরোধী, আবার যেগুলি পুর-গ্রাম মহাজনগণের বিরোধী সেই ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়- এমন আলোচনাই স্মৃতিতে মেলে। নারদও রাষ্ট্রস্বার্থকে সর্বাগ্রে রেখেছেন এবং রাষ্ট্রবিরোধী তথা

---

[৪৬] অন্যৈস্তু বিস্পষ্টমুক্তম্ – অপ্রসিদ্ধং নিরাবাধং নিরর্থং নিষ্প্রয়োজনম্। মিতা.,২.৬

[৪৭] অন্যার্থোঽর্থহীনং চ প্রমাণাগমবর্জিতম্।
লেখ্যং হীনাধিকং ভ্রষ্টং ভাষাদোষাস্তূদাহৃতাঃ।। নারদ.,২.৮

রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রবাসীর পক্ষে হানিকর এমন অভিযোগের সারবত্তাকে অস্বীকার করেছেন।[৪৮] কাত্যায়ন রাষ্ট্রবিরোধী অভিযোগের পাশাপাশি অনেক বস্তুবিষয়ক অভিযোগকেও অসিদ্ধ বলেছেন।[৪৯] প্রায় সকল শাস্ত্রকারগণই কোন অভিযোগ বিচার্য ও কোনটি বিচারের অযোগ্য তার উল্লেখ করেছেন। তবে অভিযোগ বা আবেদনের বিষয়টি যথার্থ হওয়া সত্ত্বেও কখন কখন বিচারালয়ে তা মীমাংসিত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হত না। শাস্ত্রে কেবল অভিযোগের বিষয়টির যথার্থতার মাপকাঠি নির্দিষ্ট করা হয়েছে এমনটা নয়, যার সম্পর্কে অভিযোগ করা হচ্ছে তার সাথে অভিযোগকারীর কী সম্পর্ক এবং যে ব্যক্তি অভিযোগ করছে তার স্বরূপ কেমন হবে তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। নারদ পাঁচ প্রকার ব্যক্তিকে ব্যবহার করার পক্ষে অপকৃষ্ট বা হীন বলে নির্দেশ করেছেন। যে আবেদনকালে একরকম বলেন, লেখার সময় অন্যরকম লেখান, সাক্ষী প্রভৃতির দ্বারা নিষ্পাদিত বিচারের বিষয়ে যিনি বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন, সাক্ষ্যদানাদিতে অনুপস্থিত হয় যে ব্যক্তি, যে উত্তরদানকালে মৌন থাকে এবং যে আহুত হয়ে উপস্থিত হয়েও পালিয়ে যায় এমন ব্যক্তির অভিযোগও অবিচার্য।[৫০] গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র, পতি-পত্নী তথা স্বামী-সেবক এদের মধ্যে অভিযোগের বিচার সম্ভব নয়। কিন্তু এর তাৎপর্য এমন নয় যে, এদের মধ্যে কোনো বিবাদ হতে পারে না কিংবা বিবাদ হলে তা বিচার্য হবে না। বৃহস্পতির উক্তির এমন অর্থ করা যেতে পারে যে, এদের মধ্যে কোনো বিবাদ উপস্থিত হলে তা বিচারালয়ের কাঠগড়ায় না এনে আপসে তার সমাধান করে নেওয়া। কিন্তু যদি মীমাংসা করার পরেও বিবাদের সূত্রপাত ঘটে কিংবা গুরুতর

---

[৪৮] আগমবর্জিতং দোষং পূর্ববাদে বিবর্জয়েত্।

একস্য বহুভিঃ সার্ধং পুররাষ্ট্রবিরোধকম্।। নারদ.,২.১২

তুল. পুররাষ্ট্রাদিবিরুদ্ধং যথা রাজ্ঞা বিবর্জিতং যশ্চ যশ্চ পৌরবিরোধকৃত্...। মিতা.,২.৬

[৪৯] যশ্চ রাষ্ট্রবিরুদ্ধশ্চ যশ্চ রাজ্ঞা বিবর্জিতঃ।

অনেকপদসংকীর্ণঃ পূর্বপক্ষো ন সিদ্ধতি।। কাত্যা.,১৩৬

[৫০] অন্যবাদী ক্রিয়াদ্বেষী নোপস্থাতা নিরুত্তরঃ।

আহূতঃ প্রপলায়ী চ হীনঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ।। নারদ.,২.৩৩

কোনো অভিযোগ হয় সেক্ষেত্রে বিচারালয়ে অবশ্যই অভিযোগটি গ্রহণ করতে হবে। এর ধরণের বিবাদকে স্মৃতিতে নিরর্থক বিবাদ বলে নিন্দা করা হয়েছে।[৫১]

আবেদ্যমান বিষয় ও ভাষাপাদের বাক্যের পরিবর্তন হলে সমগ্র বিষয়টি পরিবর্তিত হয়ে পড়ে তাই বাক্য পরিবর্তন করা অনুচিত। পূর্বে যেভাবে আবেদন করা হয়েছে সেভাবেই তা লেখ্যপত্রে নিবেশিত করাতে হত। লেখ্যপত্রে লেখা হয়ে গেলে তা আর পরিবর্তন করা যেতো না। দিন- ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক কোনো বিষয় লিখে রাখা কেনো আবশ্যক ছিল তা *শুকসপ্ততিকথা*র একটি কাহিনি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। এই গ্রন্থের পঞ্চষষ্ঠি কথায় একজন সাধু হয়েও তার শিষ্যকে মাংস আনতে প্রেরণ করেছে। এমন অনাচার করার জন্য সে যখন সকলের দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছে সে আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছে যে, সে 'মাং সংবর্ততে'- এরূপ বাক্য বলেছে এবং শিষ্যই তার কথা না বুঝে ভুল করেছে এরূপ প্রতিপন্ন করেছে।[৫২] অর্থাৎ একটিমাত্র শব্দ পরিবর্তন দ্বারা দুষ্টব্যক্তি নির্দোষ ও নির্দোষী ব্যাক্তি দুষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে। তাই লিপিবদ্ধকরণ আবশ্যক।

অর্থী যা নিবেদন করে তা মাটিতে বা কাঠের ফলকে লিখে আবাপ অর্থাৎ ন্যূনতা ও আধিক্য পরিহারের জন্য শব্দ যোজনা ও শব্দ অপসারণ ইত্যাদির দ্বারা বিশোধিত হওয়ার পর পত্রে সন্নিবেশিত করতে হত। প্রত্যর্থীর উত্তর দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লেখ্যপত্রের সংশোধন করা যেত, তারপর নয়। কাত্যায়ন ও বৃহস্পতির মতে, অর্থীর আবেদন সংশোধন করার পর তবেই তা পত্রে নিবেশিত করতে হবে।[৫৩] উত্তর দর্শনের পূর্ব পর্যন্তই লেখ্যপত্র শোধন করা যেতে পারে। উত্তর লেখা হয়ে গেলে ভাষাপাদের সংশোধন করা যায় না। উত্তর দানের পরেও সংশোধন চলতে থাকলে অনাবস্থা দোষ এসে পড়ে। *মিতাক্ষরা*কার বলেছেন, যদি সভ্যগণ পূর্বপক্ষের লেখ্যকে

---

[৫১] Hist.Dh.,vol..3,P.251

[৫২] শুক.,পৃ.২৬১

[৫৩] পাণ্ডলেখেন ফলকে ততঃ পত্রে বিশোধিতম্।। কাত্যা.,১৩১

তুল. ন্যূনাধিকং তু সংশোধ্য পশ্চাৎপত্রে নিবেশয়েত্।। বৃহ.,২.৩৩

সংশোধন না করেই প্রত্যর্থীকে দিয়ে উত্তর দান করান তাহলে রাজা তাদের দণ্ড দেবেন এবং প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্যবহারটিকে পুনরায় প্রবর্তন করাবেন।[৫৪]

অর্থী আবেদন করার পর প্রত্যর্থীর সম্মুখে তার আবেদনের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা হবে। বিচারপদ্ধতির এটি হল প্রথম ধাপ বা স্তর। তাই বিচারপ্রক্রিয়াটি শুরু করার জন্য প্রতিবাদীর বিচারসভায় উপস্থিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আবেদন প্রস্তুত করার পর প্রতিবাদী আহ্বানপত্র পেয়ে আদালতে বা বিচারালয়ে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বাদীকে অপেক্ষা করতে হয়। যদি এমন সম্ভাবনা দেখা যায় যে, প্রতিবাদী এই ব্যবস্থার সুবিধা নিয়ে পলায়ন করতে পারে তবে আসেধাজ্ঞার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আসেধ প্রক্রিয়াটিকে ব্যবহার প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে পরিচালিত করার সহায়ক একটি বিশেষ উপায় বলা যেতে পারে, যার দ্বারা প্রতিবাদীর ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। এটি কিন্তু চতুষ্পাদেরই অন্তর্গত, পাদান্তর নয়। বৃহস্পতি চার প্রকার আসেধের কথা বলেছেন।[৫৫] সেগুলি হল- ১. স্থানাসেধ- ন্যায়ালয়ের আবেদনপত্র পাওয়ার পর প্রতিবাদী স্থান বিশেষ ত্যাগ করে কোথাও যেতে পারবে না। ২. কালকৃত আসেধ- নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতিবাদী কোথাও যেতে পারবে না। ৩. প্রবাসাসেধ- প্রতিবাদীর বিদেশে যাওয়া বন্ধ করা হয়। ৪.কর্মাসেধ- যে কাজে বাদীর ক্ষতি হবে প্রতিবাদী সে কাজ থেকে বিরত থাকবে।

স্মৃতিতে আসেধের বহু গুরুত্ব কথিত হয়েছে। যে ব্যক্তি আসেধ দ্বারা আদিষ্ট হয়েও আসেধ উল্লঙ্ঘনের সাহস দেখায় তাকে দণ্ড পেতে হয়। প্রতিবাদী ন্যায়প্রক্রিয়ায় বিলম্ব করলেও সে বিষয়ে আসেধ আরোপ করা যেতে পারে। নারদ, বৃহস্পতি আসেধের যে আলোচনা করেছেন তা থেকে একথা বলা যায় আসেধ হল প্রতিবাদীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করার একটি মাধ্যম। যে-যাবৎ ব্যবহার প্রক্রিয়া সমাপ্ত না হয় সে-যাবৎ আসেধের প্রয়োগ বলবৎ থাকে।

---

[৫৪] পূর্বপক্ষম্ অশোধয়িত্বা এব যদোত্তরং দাপয়ন্তি সভ্যাস্তদা রাগাল্লোভাদ্ ইত্যুক্তদণ্ডেন সভ্যান্ দণ্ডয়িত্বা পুনঃ প্রতিজ্ঞাপূর্বকং ব্যবহারঃ প্রবর্তনীয়ো রাজ্ঞেতি। মিতা.,২.৬

[৫৫] স্থানারোধঃ কালকৃতঃ প্রবাসাত্ কর্মণস্তথা।
চতুর্বিধঃ স্যাদাসেধো হ্যসিদ্ধস্তং ন বন্ধয়েত্।। বৃহ.,১.৫৯

রাজা আহ্বান করা সত্ত্বেও, কারা ন্যায়ালয়ে উপস্থিত না হলেও দণ্ডিত হবেন না সে সম্পর্কে কয়েকটি আখ্যান থেকে কিছু ধারণা লাভ করা যায়। *শুকসপ্ততিকথা*র আটষট্টিসংখ্যক কথায় কেশব নামক এক ব্রাহ্মণ শিষ্টাচার লঙ্ঘন করায় এক বণিক রাজার কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছে। আলোচ্য আখ্যানটিতে রাজার দ্বারা আহুত হয়েও সে রাজসভায় উপস্থিত হয়নি, তার জায়গায় তার বন্ধুকে প্রেরণ করেছে। তার মানসিক প্রকৃতি স্থির নয় – তাই সে রাজসভায় উপস্থিত হতে পারেনি। রাজাও তার এই অনুপস্থিতি স্বীকার করে তার বন্ধুর কাছেই বিবাদ সম্পর্কিত নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করেছেন। পরবর্তী কালে মানসিক স্থিরতা নেই তাই সে অপরাধের দণ্ডও প্রাপ্ত হয়নি।[৫৬] অর্থাৎ রাজসভায় সকলকেই উপস্থিত হতে হত এমন নয়। মানসিক বিকারগ্রস্থ ব্যক্তি না উপস্থিত হলেও দণ্ডিত হত না- এমনটা বোঝা যায়। এই গ্রন্থেরই একবিংশকথায় এক নগরের সম্ভ্রান্ত বণিকপুত্রবধূর বিরুদ্ধে ন্যায়ালয়ে অভিযোগ আসা সত্ত্বেও রাজা তার সভাসদদের পরামর্শে কুলস্ত্রীকে সভায় উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেননি।[৫৭] *দশকুমারচরিতের* অপহারবর্মাচরিতেও উন্মত্তলোকেরা বিচারের ঊর্ধ্বে এইরূপ বিধি দেখা যায়। তাই নগররক্ষীরা অপহারবর্মাকে চোর জেনেও তাকে উন্মত্ত ও অপ্রকৃতিস্থ এইরূপ আশঙ্কা করে ছেড়ে দিয়েছে।

শাস্ত্রেও কিছু অবস্থা বিশেষে প্রতিবাদীকে ন্যায়ালয়ে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে স্মৃতিকারগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। *হিস্ট্রি অফ্ ধর্মশাস্ত্র* গ্রন্থে স্মৃতিকারদের মতানুসরণ করে কাদের ন্যায়ালয়ে আহ্বান করা যাবে না তার উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে রোগী, নাবালক, অত্যধিক বৃদ্ধ, বিপত্তিগ্রস্থ, ধার্মিক কর্মে যুক্ত ব্যক্তি, যে উপস্থিত হলে সম্পত্তির হানির আশঙ্কা আছে এমন ব্যক্তি, দুর্ভাগ্যগ্রস্থ, রাজকার্যে লিপ্ত, নেশাগ্রস্থ, উন্মত্ত, দাস, নব যুবতী, অভিযোগকারী অপেক্ষা উচ্চকুলে জাতা নারী, সদ্য সন্তানপ্রসবা বা বিপত্তিগ্রস্থ নারী- এদের বিচারসভায় আহ্বান নিষেধ করা হয়েছে। *নারদস্মৃতিতে* এবিষয়ে ভিন্নরূপ এক বিধান মেলে, যা বেশ মানবিক ও যুক্তিসঙ্গতও বটে। তিনি বেশ কিছু কার্যের উল্লেখ করে

---

[৫৬] শুক.,পৃ.২৬৯

[৫৭] শুক.,পৃ.১০৭

সেই কর্মে লিপ্ত ও উদ্যত ব্যক্তি যথা সময়ে বিচার সভায় উপস্থিত না হলেও আসেধের প্রয়োগে নিষেধ করেছেন। বিবাহের জন্য বরণপ্রাপ্ত বর, যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি, ব্যসনাক্রান্ত, অন্যের দ্বারা অভিযুক্ত হয়ে অন্য ধর্মাধিকরণে উপস্থিত, রাজকার্যে নিরত, গোসেবায় নিযুক্ত গোপালক, শস্যক্ষেত্রের কৃষক, শিল্পকর্মে নিমগ্ন শিল্পী, যুদ্ধরত সৈনিক, অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক, দূত, দান করতে উদ্যত ব্যক্তি ও বিষম স্থানে অবস্থান করছে এমন ব্যক্তিকে নারদ অনাসেধ্যা বলেছেন।[৫৮] এই সকল ব্যক্তিদের স্থানে তাদের পরিবর্তে তাদের প্রতিনিধি বিচারসভায় উপস্থিত হলেও বিচারকার্য চলতে পারে। তবে, যে সকল নারীরা পরিবারের ভরণ-পোষণ স্বয়ং করান, যারা ভ্রষ্ট চরিত্র অথবা জাতিচ্যুত হয়েছে, একা থাকে তাদের বিচারসভায় স্বয়ং উপস্থিত থাকতে হত।

হীন জাতীয়া নারী, কিংবা বেশ্যা স্থানীয়া নারী, বেশ্যা সহকারী কুট্টনী এরা বিচারসভায় আহুত হলে তাদের অবশ্যই রাজসভায় উপস্থিত হতে হত। *দশকুমারচরিতে*র অপহারবর্মাচরিতে গণিকা কামমঞ্জরী ও তার মাকে রাজার সমন পেয়ে রাজসভায় উপস্থিত হতে হয়েছে।[৫৯] *শুকসপ্ততিকথা*র সপ্তমসংখ্যক কথায় এক বিপ্র তার অলৌকিক এক দ্রব্য চুরির অপরাধে গণিকা ও তার সঙ্গী কুট্টনীকে অভিযুক্ত করেছে। সেখানেও রাজার সমন পেয়ে এই অভিযুক্ত দুজনকে রাজসভায় উপস্থিত হতে হয়েছে।[৬০] সুতরাং এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে কিছু কিছু নারীদেরও বিচারের স্বার্থে বিচারসভায় উপস্থিত হতে হত। স্মৃতির বিধানানুযায়ী, শত্রুর আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারির সময়ে রাজা প্রতিবাদীকে পুনরায় আহ্বান করতে পারতেন। সেক্ষেত্রে প্রতিবাদীকে প্রথমবারের অনুপস্থিতির জন্য দণ্ড পেতে হত না। তবে গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে বিচারসভায় স্বয়ং আসতেই হত।

---

[৫৮] নির্বেষ্টুকামো রোগার্তো যিযক্ষুর্ব্যসনে স্থিতঃ।

...

বিষমস্থশ্চ নাসেধ্যো ন চৈতানাহ্বয়েন্নৃপঃ।। নারদ.,১.৪২-৪৪

[৫৯] দশ.,পৃ.১৮০

[৬০] শুক.,পৃ.৫৪

৩.৩.উত্তরপাদের স্বরূপ বিচার

বিচারপ্রক্রিয়ার দ্বিতীয় স্তর হল অভিযুক্তর উত্তর প্রদান। যাজ্ঞবল্ক্য এটিকে উত্তরপাদ বলেছেন। কারণ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় তার বক্তব্য না শুনে বিচারপ্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। তাছাড়াও সকল অভিযোগ সর্বদা সত্য হবে এমনটাও নয়, মিথ্যা অভিযোগও করা হতো। বিভিন্ন আখ্যানগুলিতে বিচাররে যে চিত্রটি চোখে পড়ে সেখানেও এই অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তরদান প্রক্রিয়াটি দেখা যায়। *বেতালপঞ্চবিংশতির* তৃতীয় উপাখ্যানে বিচারসভায় বিচারকালে উত্তরপাদের একটি দৃষ্টান্ত মেলে। যা থেকে উত্তরপাদের নিয়মবিধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। আলোচ্য উপাখ্যানটিতে এক স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে শস্ত্রদ্বারা আঘাতের অভিযোগ করেছে। তার অভিযোগটি বিচারকালে প্রাড্বিবাক স্ত্রীর বক্তব্য শোনার অব্যবহিত পরেই স্ত্রীর সামনেই তার পতিকে এর উত্তর দিতে বলেছেন।[৬১] এক্ষেত্রে স্ত্রী অভিযোগ করায় সে বাদী পক্ষ ও তার স্বামী প্রতিবাদী পক্ষ। স্ত্রীর অভিযোগের বিচারকালে বাদী-প্রতিবাদীকে মুখোমুখি রেখে বিচার করা হয়েছে। বাদীর সামনেই প্রতিবাদীকে তার উত্তর জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। যা থেকে বোঝা যায় যে, উত্তরপাদের প্রত্যর্থী অর্থীর সামনে তার উত্তরপ্রদান করবে। স্মৃতিতেও উত্তরপ্রদানের এই ধাপটি সম্পর্কে এমন তথ্যই পাওয়া যায়। স্মৃতির বিধান অনুযায়ী, উত্তরপাদে প্রত্যর্থী অর্থীর সম্মুখে অভিযোগের ভিত্তিতে তার বক্তব্য পেশ করবে। প্রত্যর্থীর উত্তর অর্থীর সমানেই লেখা হবে। তখন প্রত্যর্থী নিজপক্ষ সমর্থন করে অর্থীর অভিযোগ খণ্ডন করবে।

*মিতাক্ষরা*কার উত্তরের যে লক্ষণ করেছেন তা হল – উত্তর হবে অর্থীর অভিযোগ দূরীকরণের সমর্থ, সারগর্ভ, ন্যায্যভাষণযুক্ত-সন্দেহরহিত। পূর্বাপর সামঞ্জস্যযুক্ত এবং ব্যাখ্যা ছাড়াও সহজে বোধ্য।[৬২] শাস্ত্রকারগণের মতে, অভিযোগপত্রটি প্রস্তুত হওয়ার অব্যবহিতপরেই প্রত্যর্থী তার উত্তর দেবে। তবে বেশ কিছু পরিস্থিতিতে প্রত্যর্থী উত্তর দানের জন্য সময় চাইলে তাকে সে সময়

---

[৬১] বেতাল.,পৃ.৩২

[৬২] পক্ষস্য ব্যাপকং সারমসন্দিগ্ধমনাকুলম্।
অব্যাখ্যাগম্যমিত্যুত্তরং তদ্বিদো বিদুঃ।। মিতা.,২.৭

দেওয়া হত। তবে তাকে কতটা সময় দেওয়া হবে কিংবা আদৌও সময় দেওয়া হবে কি না তা নির্ভর করতো বিবাদের বিষয়ের উপরে। সাধারণতঃ মকদ্দমার গুরুত্ব বা লঘুত্ব লক্ষ্য করে একদিন, পক্ষ, মাস বা সম্বৎসর সময় দেওয়া হত।[৬৩]

তবে গুরুতর কিছু অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রত্যর্থীর উত্তরদানে কাল বিলম্ব করা চলতো না। যাজ্ঞবল্ক্য বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ব্যবহারের নামোল্লেখ করেছেন এবং এই সকল বিষয়ে অভিযোগের ক্ষেত্রে উত্তরদানে বিলম্ব না করে প্রত্যর্থীকে দিয়ে উত্তর দেওয়াতে বলেছেন।[৬৪] সাহস (বিষ, অস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা প্রাণনাশ), স্তেয় অর্থাৎ চোর্য ও দুই প্রকার পারুষ্য – বাকপারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য এই সকল বিবাদের বিষয়ে কোনো একটি অভিযোগ যার সম্পর্কে করা হয় তাকে উত্তরদানের জন্য কোনো সময় দেওয়া হবে না – এই হল বিধান। উক্ত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যবিবাদের ক্ষেত্রে প্রত্যর্থী যদি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে না চায় তবে অর্থী, প্রত্যর্থী, সভ্যগণের ইচ্ছা অনুসারে উত্তর দেওয়ার সময় নির্ধারিত হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে বিলম্ব দোষাবহ হবে না।

বিচারপ্রক্রিয়ায় অভিযুক্তের উত্তরপ্রদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা *কথাসরিৎসাগরের* অপর একটি আখ্যান থেকেও জানা যায়। আলোচ্য গ্রন্থটির মদনমঞ্জুকা লম্বকের প্রথম তরঙ্গের 'নৃপতি বিক্রমসিংহ ও দুই দ্বিজের কাহিনি'তে দুই চোরকে রাজা বন্দি করেছেন। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পরের দিনই বিচারসভায় তাদের বিচার শুরু করেছেন। বিচারকালে শাস্তিপ্রদানের পূর্বে তাদের বক্তব্য পেশের সুযোগও দিয়েছেন। শুধু তাই নয় পরবর্তী কালে তাদের বক্তব্যের ভিত্তিতে চোরেদের দণ্ডও মুকুব করেছেন – এমনটা দেখা যায়।[৬৫] আলোচ্য আখ্যানটিতে রাজা গোপনে ঐ দুই দ্বিজের কথা শ্রবণ করেছিলেন এবং তারা চৌর্যবৃত্তিধারী সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন। তবুও তিনি বিচারকালে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়েছেন। পূর্বে দণ্ডপ্রদানে উদ্যত হলেও,

---

[৬৩] দিনং মাসার্ধমাসো বা সংবৎসরমথাপি বা।
ক্রিয়াস্থিত্যনুরূপস্তু দেয়ঃ কালঃ পরেণ তু।। বৃহ.,৩.৪

[৬৪] সাহসস্তেয়পারুষ্যগোঽভিশাপাত্যয়ে স্ত্রিয়াম্।
বিবাদয়েত্ সদ্য এব কালোঽন্যত্রেচ্ছয়া স্মৃতঃ।। যাজ্ঞ.,২.১২

[৬৫] কথা.,পৃ.১২১-১২২

তাদের বক্তব্য শুনে তাদের অসহায়তার কথা জানতে পেরে তাদের দণ্ডপ্রদান থেকে বিরত হয়েছেন। এর দ্বারা বিচারে প্রতিবাদীর বক্তব্যশ্রবণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ প্রতিবাদীর বক্তব্য শুনলে তবেই অপরাধের ধরণ, পটভূমি ও তার কারণ জানা যায়।

স্মৃতিতে যে কতগুলি বিবাদের ক্ষেত্রে প্রত্যর্থীকে দিয়ে কালবিলম্ব না করেই উত্তর দেওয়াতে বলা হয়েছে তার মধ্যে চৌর্যাপরাধের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আখ্যানটিতেও রাজা চোরদের বন্দি করার পর কাল বিলম্ব না করেই বিচার প্রারম্ভ করেছেন ও তাদের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করেছেন। অর্থাৎ চৌর্যাপরাধ স্মৃতি ও আখ্যান উভয়ক্ষেত্রেই গুরুতর বলে বিবেচিত হয়েছে।

স্মৃতিতে সাহস অপরাধের ক্ষেত্রেও কালবিলম্ব না করে অভিযুক্তকে দিয়ে উত্তরপ্রদান করানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। *কথাসরিৎসাগরের* রত্নপ্রভা লম্বকের নবম তরঙ্গের ‘অর্থলোভ ও তার ভার্যার কাহিনি’তেও এমন আদেশেরই প্রতিফলন দেখা যায়। আলোচ্য আখ্যানটিতে অর্থলোভ রাজার কাছে অভিযোগ করেছে যে, সুখধন নামক এক বণিক তার স্ত্রীকে অপহরণ করেছে। এমন অভিযোগ শুনে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে সুখধনকে তৎক্ষণাৎ বিচারসভায় উপস্থিত হওয়ার আদেশ দিয়েছেন।[৬৬] বলপূর্বক স্ত্রী অপহরণ সাহস অপরাধ বলেই বিবেচিত। এমন অভিযোগের কারণেই অনতি বিলম্বে রাজা বিচারক্রিয়া শুরু করতে তৎপর হয়েছেন। সুখধনকে বন্দি করার আদেশ দিয়েছেন। সুখধন সম্ভ্রান্ত বণিক হওয়ায় মন্ত্রীদের পরামর্শে রাজা আপন লোক প্রেরণ করে সুখধনের বক্তব্য জেনেছেন। অপরাধটি অত্যন্ত গুরুতর বলেই রাজা অনতি বিলম্বেই সুখধনের বক্তব্য জানার চেষ্টা করেছেন। স্মৃতিতেও এমন অপরাধের ক্ষেত্রে এমন বিচারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

---

[৬৬] তদেব.,পৃ.১৯৬-১৯৭

সবক্ষেত্রেই যে অপরাধী বিচারসভায় এসে সত্য কথা বলবে এমন নয়। কোনো ক্ষেত্রে অভিযোগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, কোথাও অস্বীকার করা হয়, আবার কোথাও অপরাধী হয়েও দোষ অস্বীকার করে মিথ্যাকথন করার দৃষ্টান্ত আখ্যানগুলিতে দেখা যায়। যেমন *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* চতুর্থ আখ্যানে রাজকুমারের অলঙ্কার দেবদত্ত কিভাবে পেল বিচারসভায় তাকে এমন প্রশ্ন করা হলে, দেবদত্ত রাজকুমারের অলঙ্কার নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন 'আমি রাজকুমারকে হত্যা করে তার অলঙ্কার নিয়েছি'।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য দেবদত্ত রাজকুমারের অলঙ্কার নিলেও তাকে হত্যা করেননি। এক্ষেত্রে দেবদত্ত অপরাধ স্বীকার করায় প্রমাণাদি পেশের প্রয়োজন পড়েনি। *কথাসরিৎসাগরের* কথাপীঠ লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গের 'উপকোশার কাহিনি'তে উপকোশার স্বামী এক বণিকের নিকট ধনসম্পদ গচ্ছিত রেখে বিদেশ যাত্রা করেছে। উপকোশা স্বামীর গচ্ছিত ধন ঐ বণিকের কাছে ফেরৎ চাইলে বণিক তা প্রদান করতে অস্বীকার করেছেন। উপকোশা বণিকের বিরুদ্ধে রাজার কাছে অভিযোগ করেছে। রাজার দ্বারা বিচারসভায় আহুত হয়ে ঐ বণিক উপকোশার সম্মুখে অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তিনি বলেছেন - 'রমণীর প্রাপ্য কোনো বস্তুই আমার নিকটে নাই'।[৬৭] অভিযোগ অস্বীকার করে বণিক মিথ্যা উত্তর দিয়েছেন। রাজা বিচারক্রিয়ার মাধ্যমে সত্য উদ্ঘাটনে তৎপর হয়েছেন। স্মৃতিতেও উত্তরের নানা প্রকারভেদের কথা বলা হয়েছে।

কাত্যায়ন উত্তরের চারটি প্রকারভেদ প্রদর্শন করেছেন। সেগুলি হল – সংপ্রতিপত্তি উত্তর, মিথ্যা উত্তর, প্রত্যবস্কন্দন, পূর্বন্যায়, ক্রিয়াপাদ।[৬৮] প্রত্যর্থী যখন অর্থীর অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নেয় তাকে বলা হয় সংপ্রতিপত্তি উত্তর। অর্থীর অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে যে উত্তর দেওয়া হয় তা মিথ্যা উত্তর। অর্থীর অভিযোগকে স্বীকার করে তার পক্ষে যথোপযুক্ত যুক্তি দেখিয়ে যে উত্তর দেওয়া হয় তা হল প্রত্যবস্কন্দন। যে উত্তর পূর্বকৃত মামলার কথা উল্লেখ করা

---

[৬৭] কথা.,পৃ.৮-৯

[৬৮] সত্যং মিথ্যোত্তরং চৈব প্রত্যবস্কন্দনং তথা।
পূর্বন্যায়বিধিশ্চৈবমুত্তরং স্যাচ্চতুর্বিধম্ ।। কাত্যা.,১৬৫

হয় তাকে বলা হয় পূর্বন্যায়। মিতাক্ষরাকার কাত্যায়নের বচন উল্লেখ পূর্বক এই চার প্রকার উত্তরকে উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানে তিনি চার প্রকার মিথ্যা উত্তরের উল্লেখ করেছেন। ১. এটি মিথ্যা, ২. আমি এ বিষয়ে জানি না, ৩. আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম না, ৪. আমি তখন জন্মগ্রহণ করিনি।[৬৯] চতুর্বিধ উত্তরের মধ্যে প্রথম প্রকারে প্রতিবাদী স্বয়ংই পরাজয় স্বীকার করে নেয়। সেক্ষেত্রে ন্যায়াধীশকে বিচার করতে হয় না। তিনি বাদীকে জয়পত্র প্রদান করেন। অন্য তিন প্রকারে উত্তরে বিচার প্রক্রিয়াটি পরিচালনার প্রয়োজন হয়। এখান থেকেই ক্রিয়াপাদ আরম্ভ হয়।

৩.৪.ক্রিয়াপাদের স্বরূপ বিচার

বিচারক্রিয়ার পরের ধাপটি হল প্রমাণ প্রদর্শন। অভিযোগকারী তার অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণাদি পেশ করে তার অভিযোগের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করবেন। বিচারপ্রক্রিয়ার যে চিত্রটি আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে মেলে সেখানে রাজা কিংবা প্রাড্বিবাক কর্তৃক অর্থীকে প্রমাণ পেশের আদেশ দিতে দেখা যায়। *শুকসপ্ততিকথার* একবিংশতিতম কথায় এক কুট্টনী নগরের বণিক বধূ মন্দোদরীর বিরুদ্ধে রাজা কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। মন্দোদরী রাজার পোষ্য ময়ূর ভক্ষণ করেছে – এই ছিল তার অভিযোগ। বিচারসভার সকলে এমন অভিযোগের বিচারকালে ঐ কুট্টনীকে তার অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করার আদেশ দিয়েছেন – এমন দেখা যায়।[৭০]

পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের মিত্রভেদের 'ধর্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধিকথা'য় বিচারক্রিয়ার যে দৃশ্যটি প্রস্ফুটিত হয়েছে, সেখানে বিবদমান এই দুই জন একে অপরের বিরুদ্ধে ধন অপহরণের অভিযোগ নিয়ে রাজদরবারে উপস্থিত হয়েছে। রাজা তাদের উভয়ের বক্তব্য শ্রবণ করার পর প্রমাণাদি প্রদর্শন করার আদেশ দিয়েছেন এবং সেই মতো শাস্ত্রানুযায়ী সম্ভাব্য প্রমাণও পেশ করা হয়েছে। সাক্ষী প্রমাণের উপরে ভিত্তি করেই বিচারে রায়দান করা হয়েছে।[৭১] অর্থাৎ উভয়পক্ষের বক্তব্য

---

[৬৯] মিতা.,২.৭

[৭০] শুক.,পৃ.১০৭

[৭১] পঞ্চ.,পৃ.২৮২

শ্রবণ করার পর প্রমাণপ্রদর্শন করতে হয় এবং তা পর্যালোচনা করেই বিচারকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ বিচারে নির্ণয় দান করেন। স্মৃতিতেও এই একই ধাপ বা স্তর অনুসৃত হয়েছে।

স্মৃতির বিধান অনুযায়ী, প্রত্যর্থীর উত্তর লেখার পর অর্থী স্বপক্ষে প্রমাণ দাখিল করবে। কারণ সাধ্যসিদ্ধি সাধনেরই মুখাপেক্ষী। উত্তরদানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণ প্রদর্শন করা উচিত। ক্রিয়াপাদের আরম্ভ হলে বাদী সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক ন্যায়াধীশের কাছে উপস্থাপন করবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে প্রতিবাদী আবেদকের সম্মুখে তার উত্তর প্রদান করবে। তার অনন্তরই বাদী তার প্রমাণ প্রদর্শন করবে।[৭২] ভাষাপাদ ও উত্তরপাদের অনন্তর এই ক্রিয়াপাদেই মকদ্দমায় সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রমাণ প্রদর্শনের পর তা পর্যালোচনার কথাটি *বেতালপঞ্চবিংশতির* তৃতীয় উপাখ্যানে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে এক চোর অভিযুক্তের সপক্ষে সাক্ষী দেওয়ার পর প্রাড্বিবাক ও অন্যান্য সভ্যগণ বার বার তাকে জিজ্ঞাসা করে তার কথার সত্যতা যাচাই করেছেন ও তথ্যানুসন্ধানপূর্বক সকল তথ্য জেনে তা সবিশেষ পর্যালোচনা করেছেন।[৭৩]

৩.৫.সাধ্যসিদ্ধিপাদের স্বরূপ বিচার

প্রমাণ প্রদর্শন করার পর তা বিচারকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করার পর, যার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয় সেই ব্যক্তি জয়লাভ করেন। যিনি অভিযোগ করেও প্রমাণ দেখাতে পারেন না বিবাদে তার পরাজয় ঘটে। যথাবিধি দণ্ডও পেতে হয়। *কথাসরিৎসাগরের* কথামুখ লম্বকের পঞ্চম তরঙ্গের 'দেবস্মিতার কাহিনি'তে বিচারক্রিয়াটি ভিন্নরূপ দেখা গেলেও সেখানেও বিচারের সুনির্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী বিবাদের নিরসন করা হয়েছে। আলোচ্য

---

[৭২] শ্রুতার্থস্যোত্তরং লেখ্যং পূর্বাবেদকসন্নিধৌ।
ততোঽর্থী লেখয়েত্ সদ্যঃ প্রতিজ্ঞাতার্থসাধনম্।। যাজ্ঞ.,২.৭

[৭৩] বেতাল.,পৃ.৩২

আখ্যানটিতে দেবস্মিতা বিচারালয়ে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করেনি, নৃপতিকে অনুরোধ করে সকল পৌরবাসীকে একত্রিত করে নৃপতির নিকট তার অভিযোগ জানিয়েছে। পৌরজনেদের মধ্যে উপস্থিত চারজন তার দাস এবং তারা পলায়ন করেছে এমন দাবী জানিয়েছে। পৌরজনসহ ঐ চারজনও তার বক্তব্যে সন্দেহ প্রকাশ করলে, সে রাজাকে যথোচিত প্রমাণ দেখিয়েছে এবং উপস্থিত জনগণের মধ্য থেকে ঐ চারজনকে সকলের সামনে প্রকাশিত করেছে। সঠিক প্রমাণ প্রদর্শন করে আপন বক্তব্যের সত্যতা প্রতিষ্টা করতে সমর্থ হওয়ায় বিচারে তার জয়লাভ হয়েছে।[৭৪] এখানে বিচারক্রিয়াটি বিচারালয়ে সংঘটিত হয়নি, তবুও তা যথাবিধিই পরিচালিত হয়েছে। দেবস্মিতা পূর্বে চারজন বণিকপুত্রের ললাটে কুক্কুর পদচিহ্ন অঙ্কিত করে দিয়েছিল, বিচারকালে সেটি সে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করেছে। যেহেতু তার প্রমাণ গ্রাহ্য হয়েছে তাই সে জয়লাভ করেছে। আর বণিকপুত্রগণ ছদ্মবেশ ধারণ করে পৌরজন সমাগমের মধ্যে উপস্থিত থেকে প্রথমে তার অভিযোগ অস্বীকার করলেও তাদের কাছে কোনো প্রমাণ না থাকায় তাদের পরাজয় ঘটেছে।

পঞ্চতন্ত্রের কাকোলূকীয়ম্ এর 'শশকপিঞ্জলকথা'য় বিচারব্যবস্থা সম্বন্ধিয় যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে – বিচারে যার পক্ষ নির্বল হয় সেই পরাজিত হয়। শশক ও চড়ুইপাখির মধ্যে বিবাদ হলে তারা বিড়ালের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়েছে। বিড়াল বিচারকরূপে নির্বাচিত হয়ে এমন কথাই জানিয়েছে যে – বিবাদে যে হীনবাদী বলে বিবেচিত হবে তাকে বিড়াল ভক্ষণ করবে।[৭৫] বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে বিচারকের কাছে যার পক্ষ দুর্বল বলে বিবেচিত হবে সেই পরাজিত হবে। এক্ষেত্রে নিজবক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ না দেখাতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই তার বক্তব্য দুর্বল বলে বিবেচিত হবে। এখানে বিচারকরূপে নিযুক্ত বিড়ালটি হীনবাদীকে ভক্ষণ করবে – এমন বক্তব্যদ্বারা পরাজিত ব্যক্তি দণ্ডভোগ করবে এমনটা সহজেই বোঝা যায়। স্মৃতির বিধান অনুযায়ী, যে প্রমাণটি অর্থী পেশ করেছে সেটি যদি সত্য বলে জানা যায় তবে ঐ প্রমাণকে সিদ্ধ বলা হয়, যার প্রমাণ সিদ্ধ হয় সেই জয়লাভ করে, অন্যথায় পরাজিত হয়। অন্যথা বলতে সাধ্যের অসিদ্ধিকেই বুঝতে হবে। চতুষ্পাদের মধ্যে প্রথমপাদ অর্থাৎ ভাষাপাদে

---

[৭৪] কথা.,পৃ.৪৪

[৭৫] পঞ্চ.,পৃ.৪৯২

প্রতিপাদিত তথ্য এই চতুর্থপাদে সিদ্ধ হয় বা অসিদ্ধ হয়। এই পাদে বাদীর জয় বা পরাজয় নির্ণীত হয় বলে একে নির্ণয়পাদও বলা হয়।

তবে, কোথাও কোথাও অভিযুক্তর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই প্রমাণ প্রদর্শনের পূর্বেই বিচারের রায় ঘোষণা করা হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও আখ্যানে দেখা যায়। যেমন *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* চতুর্বিংশতি উপাখ্যানে শালিবাহনকে রাজা বার বার বিচারসভায় উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেওয়ার পরও সে উপস্থিত হয়নি, রাজা তার অনুপস্থিতিতেই তাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।[৭৬] *দশকুমারচরিতের* অর্থপালচরিতে কামপালের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ যেমন হত্যা, জোরপূর্বক কন্যাকে বিবাহ ইত্যাদি অভিযোগ থাকায় তার চক্ষু উৎপাটন করে তাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।[৭৭] এক্ষেত্রে বিচারসভায় তাকে ডাকা হয়নি, তাকে আপন বক্তব্য পেশ করার সুযোগও দেওয়া হয়নি। এমনকি কোনো প্রমাণ পেশ ও তা পর্যালোচনাও করা হয়নি। কেবল কিছু ব্যক্তির কথার ভিত্তিতে তার দণ্ড বিহিত হয়েছে। এটি যথার্থবিচারের নিদর্শন হতে পারে না। কারণ বিচার হবে নির্দিষ্ট ক্রমবদ্ধ নিয়ম অনুসারে – এমনটাই শাস্ত্রের বিধান।

আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে বিচারের যথার্থতা ও অযথার্থ বিচারেরও নিদর্শন বর্তমান। অযথার্থবিচারের কয়েকটি চিত্র থাকলেও একাধিক আখ্যানে যথার্থবিচারব্যবস্থার যে রূপটি প্রস্ফুটিত হয়েছে, সেটিই আমাদের কাছে গ্রহণীয়। যেখানে সঠিকভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, বিচারপ্রার্থী আর্তব্যক্তি বিচারলাভ করেছে, দোষী তার যোগ্য শাস্তি পেয়েছে – এমন বিচারব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ।

৪.আখ্যানে লেখ্যপ্রমাণ প্রসঙ্গ

আখ্যানে লেখ্য প্রমাণকে প্রমাণগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম ও অন্যতম প্রমাণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লেখ্য প্রমাণ থাকলে অন্যান্য প্রমাণের আর প্রয়োজন হয় না। লিখিত প্রমাণ বা

---

[৭৬] সিংহাসন.,পৃ.৭২

[৭৭] দশ.,পৃ.২৩৫

লিখিত কোনো নথির অনুপস্থিতিতেই সাক্ষী, ভুক্তি প্রমাণগুলির ও তদভাবে দিব্যপ্রমাণের সাহায্যে বিবাদের নিষ্পত্তি করা হয়। *পঞ্চতন্ত্রের* মিত্রভেদের 'ধর্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধিকথা' আখ্যানটিতে লেখ্যপ্রমাণই সর্বপ্রথমে গ্রহণীয় এমন কথা বলা হয়েছে।[৭৮] সেখানে প্রমাণগুলির মধ্যে লিখিত দলিলকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বিবাদের সপক্ষে লিখিত কোনো দলিল আছে কি না তা পূর্বে অন্বেষণ করা উচিত, যদি না থাকে তবে অন্যান্য প্রমাণের অন্বেষণ করা উচিত।

যে আখ্যান – উপাখ্যানগুলিতে লিখিত প্রমাণ বা লিখিত দলিলের উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে, মোটামুটিভাবে প্রধানতঃ দুই প্রকার লেখ্যের কথা জানা যায়-একটি হল রাজকৃত (যা রাজাকর্তৃক রচিত হয়) অপরটি যা সাধারণ দেশবাসীকর্তৃক রচিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য স্মৃতিতেও লেখ্যের এই ভেদটি উল্লিখিত হয়েছে।

স্মৃতিতে রাজকৃতলেখ্যের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, নিয়মপূর্বক ভূমিদান করে নিজস্বত্ত্ব নাশ করে রাজা লেখ্য রচনা করাবেন। নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও লেখ্যরচনা প্রয়োজন। যেমন এই গ্রামে প্রতিটি জমির মালিক এই ব্যক্তিকে এত টাকা প্রতি বছরে বা প্রতি মাসে দেবে অথবা কোনো ফসলের ক্ষেত প্রভৃতির বিষয়ে কারো নামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার সময়েও রাজা এই সকল ক্ষেত্রাদি ও গ্রহীতার নাম উল্লেখপূর্বক লেখ্য রচনা করাবেন। পরবর্তীকালে ঐ ক্ষেত্র সম্বন্ধিয় কোনো বিবাদ উপস্থিত হলে ঐ লেখটি প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয়। আগামী দিনে সকলের অবগতির জন্য লেখ্য রচনা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে যাতে সকলে জানতে পারে যে অমুক বংশের অমুক রাজা এই ব্যক্তিকে এই জমি দান করেছেন। এই লেখ্যে দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি, দাতব্য বস্তুর বিবরণ ও সন্ তারিখের উল্লেখ অবশ্যই করতে হবে।

রাজকৃত লেখ একটি নির্দিষ্ট বিধিমেনেই রচিত হবে। সেখানে যে উদ্দেশ্যে লেখটি রচিত হচ্ছে তার উল্লেখের পাশাপাশি সময়, দাতা-গ্রহীতা ইত্যাদির উল্লেখ থাকা আবশ্যক। এখানে দান প্রসঙ্গটির কথা বলা হলেও, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যদি লেখ রাজা রচনা করেন সেক্ষেত্রেও

---

[৭৮] পঞ্চ.,পৃ.২৮২

লেখটিতে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। যদি তা না হত অর্থাৎ লেখটিতে সকল তথ্যাদি সঠিকভাবে সন্নিবেশিত না হত, কিংবা অসৎ ব্যক্তি দ্বারা অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রচিত হত তবে তা কুটলেখ্য বলে বিবেচিত হত। এমনই এক রাজকৃত লেখের উদাহরণ *কথাসরিৎসাগরের* রত্নপ্রভা লম্বকের অষ্টম তরঙ্গের 'পরিত্যাগসেন তার দুষ্টভার্যা ও দুই পুত্রের কাহিনি'তে দেখা যায়, সামন্তগণ রাজা পরিত্যাগসেনের নামাঙ্কিত একটি লিপি প্রাপ্ত হন। যেখানে রাজা তার পুত্রদ্বয়কে অপরাধী বিবেচনা করে সামন্তগণকে তাদের দণ্ড দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। সামন্তগণও ঐ লিপিকে প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করে রাজপুত্রদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ লেখটি ছিল কুটলেখ, যা রাজা রচনা করেননি- ইহা পরবর্তীকালে সকলে অবগত হন।[৭৯] রাজা লিপিকাটি দেখামাত্রই তা কোনো বঞ্চকের দ্বারা নির্মিত তা বুঝতে পারেন। রাজকৃত লিপিকাতে রাজার মুদ্রঙ্কন না থাকা সত্ত্বেও সামান্তগণ উহাকে প্রমাণ বলে বিবেচনা করার জন্য, রাজা তাদের তিরস্কার করেছেন এবং পদচ্যুত করেছেন। কুটলেখ্যটি নির্মাণ করেছে যে ব্যক্তি তাকে অন্বেষণ করে তার উপযুক্ত দণ্ডবিধানও করেছেন।

আলোচ্য আখ্যানটি থেকে একথা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, রাজকৃতলেখ যথাবিধি নির্মিত হলে তবেই তা প্রামাণিক বলে বিবেচিত হবে, অন্যথায় নয়। স্মৃতিতেও রাজকৃত লেখের যথাবিধি রচিত হওয়ার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। স্মৃতিকারগণ যে রাজকৃত লেখগুলির উল্লেখ করেছেন তা কিভাবে রচিত হবে, কি কি তথ্যাদি তাতে সন্নিবেশিত থাকবে তাও উল্লেখ করেছেন। যেমন - রাজকৃত লেখ রূপে জয়পত্র ও প্রসাদপত্রের উল্লেখ করেছেন সেখানেও রাজার মুদ্রাঙ্কন থাকা আবশ্যক এমন বলেছেন। বিবাদ নিষ্পত্তির শেষে রাজা সাক্ষীদের সম্মুখে জয়পত্র লেখাবেন। ইহা রাজার মুদ্রাঙ্কিত হয়। পরবর্তীকালে একই অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বলে বিবেচিত হয় এবং বিবাদের নিষ্পত্তি করা হয়। শাসনলেখ্যের আরও একটি ভেদের উল্লেখ স্মৃতিতে মেলে। তা হল- প্রসাদপত্র, যা কারো বীরত্বের পুরষ্কারস্বরূপ কিংবা কারো প্রভুভক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে রাজা দ্বারা পুরষ্কারস্বরূপ দেওয়া হয়।

---

[৭৯] কথা.,পৃ.১৯২

জানপদলেখ্যঃ- স্মৃতি ও আখ্যানে প্রাপ্ত অপর একটি লেখ্য হল জানপদলেখ্য। ইহা সাধারণ দেশবাসী দ্বারা লিখিত হত। *কথাসরিৎসাগরের* চতুর্দ্বারিকা পঞ্চম লম্বকের প্রথম তরঙ্গের 'শিব ও মাধবের কাহিনি'তে এরূপ একটি জানপদলেখ্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শিব তার রত্নসমূহকে বহু মূল্য পরিচয় দিয়ে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে পুরোহিতের কাছে বিক্রয় করেছে কিন্তু কিছু দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেগুলি বিক্রয় করতে গেলে পুরোহিত সেই রত্নগুলি নকল, কেবল কাঁচের টুকরোমাত্র এরূপ জ্ঞাত হন এবং বিচারালয়ের দ্বারস্থ হন। বিচারকালে শিব রাজার সম্মুখে পুরোহিতের সাক্ষরযুক্ত একটি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র রাজাকে দেখিয়েছে এবং পুরোহিত স্বয়ং রত্নাদির মূল্য নির্ধারণ করে রত্নাদি ক্রয় করেছে, তা প্রমাণ করে বিবাদে জয় লাভ করেছে। পুরোহিত পরাজিত হয়েছে।[৮০] আলোচ্য আখ্যানটিতে লেখ্যপ্রমাণ পেশ করেই শিব নিজের জয় নিশ্চিত করেছে। প্রাপ্তিস্বীকারপত্রটি প্রকৃতপক্ষে তাদের উভয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের লিখিত দলিল-যা লেখ্যপ্রমাণরূপে বিচারসভায় প্রদর্শিত হয়েছে। এই পত্রটি রাজা কর্তৃক নয়, সাধারণ দেশবাসী শিব ও পুরোহিত নিজেরাই রচনা করেছেন এবং তাতে স্বাক্ষরও করেছেন- তাই একে জানপদলেখ্যের একটি দৃষ্টান্ত বলে মনে করা অযৌক্তিক হবে না। তবে তারা এই লেখের রচনা কোনো সাক্ষীর সম্মুখে করেননি। সাক্ষীহীন প্রাপ্তিস্বীকার পত্রটি বিচারসভায় গৃহীত হয়েছে এবং তার উপরে ভিত্তি করেই শিব জয়লাভ করেছে- যা থেকে জানপদলেখ্য যে সাক্ষীহীন হলেও প্রামাণিক ছিল তা বোঝা যায়।

স্মৃতিতে জানপদলেখ্যের যে আলোচনা পাওয়া যায়, তাতে সাক্ষীরহিত ও সাক্ষীসহিত দুই প্রকারই হতে পারে এরূপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আলোচ্য আখ্যানে সাক্ষীরহিত জানপদলেখ্যটির প্রামাণিকতার বিষয়টি স্মৃতিসম্মতই বলা চলে। স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে, যখন সুবর্ণাদি দ্রব্য বা ধন ঋণগ্রহণের সময় উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ পরস্পরের রুচি অনুসারে ঐ ধন প্রত্যর্পণের নিয়ম ও বৃদ্ধির নিয়ম স্থির করে তখন সেই লেখ্য সাক্ষীযুক্ত করতে হয় এবং তা উত্তমর্ণের উপস্থিতিতে রচিত হবে। ঐ লেখ্যপত্রে উত্তমর্ণের ও অধমর্ণের নাম, জাতি, গোত্র, বেদ শাখার নাম, পিতার নাম,

---

[৮০] কথা.,পৃ.২৭-২৮

বৎসর, মাস, পক্ষ, তিথি, দ্রব্যের স্বরূপ প্রভৃতি লিখিত হবে।[৮১] নারদও জানপদলেখ্যের এই বিভাগটি স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, এই দুই প্রকার লেখ্যপত্র তখনই প্রমাণ বলে বিবেচিত হবে যখন ইহা দেশাচার অনুযায়ী লিখিত হয়। নারদ সেই লেখ্যপত্র বা দলিলকেই প্রমাণ বলে গণ্য করেন যা দেশাচারের বিরোধী নয়, যেখানে বন্ধক বা জামিনের উল্লেখ স্পষ্ট ভাষায় যথাযথরূপে থাকে। লেখ্যরচনার নিয়ম যেখানে অনুসৃত হয়েছে। বিষ্ণুও একই ভাবে লেখ্যর বৈধতা প্রসঙ্গে দেশাচারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।[৮২] স্মৃতিশাস্ত্রে জানপদলেখ্যের যে আলোচনা মেলে, তা থেকে মোটামুটিভাবে বেশকিছু জানপদলেখ্যের সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় – সম্পত্তির বিভাজন কালে কৃত বিভাগপত্র, দানপত্র, ক্রয়পত্র, কোনো কিছু বন্ধক রাখার সময় লিখিত লেখ্য, দাসত্ব সম্বন্ধীয় দাসপত্র, কতদিন যাবৎ কি হারে সুদ দিতে হবে – এই তথ্য সম্বন্ধিয় ঋণপত্র, সীমা নিশ্চিতকারী সীমাপত্র, পূগ-শ্রেণী-গণ ও পৌরজনের দ্বারা নির্ণীত নিজপরম্পরা সম্বন্ধিয় স্থিতিপত্র, বিশুদ্ধিপত্র-প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা শুদ্ধিকরণ হওয়ার পর সাক্ষীদের জবানবন্দি সহকারে লিখিত শুদ্ধিপত্র, সন্ধিপত্র-যেখানে বিশিষ্টজনের সম্মুখে অপরাধ স্বীকৃত হওয়ার পর মীমাংসা সম্বন্ধিয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয় এমন লেখ্য।

পরিশেষে নারদকে স্মরণ করে একথা বলা যায় যে, দেশাচার বিরোধী নয়, অর্থযুক্ত সন্দেহরহিত শব্দযুক্ত লেখ্যই প্রমাণ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি তা মত্ত, অভিযুক্ত, স্ত্রী, বালকের দ্বারা কিংবা বলপূর্বক ভয়ের দ্বারা অথবা ছলনার দ্বারা কোনো লেখ্য রচিত হলে তা প্রমাণ বলে গণ্য হবে না।[৮৩]

---

[৮১] সমামাসতদর্ধাহর্নামজাতিস্বগোত্রকৈঃ।
সব্রহ্মচারিকাত্মীয়পিতৃনামাদিচিহ্নিতম্।। যাজ্ঞ.,২.৮৫

[৮২] দেশাচারাবিরুদ্ধং যদ্ ব্যক্তবিধিবিলক্ষণম্।
তৎ প্রমাণং স্মৃতং লেখ্যম্ অবিলুপ্তক্রমাক্ষরম্।। নারদ.,৪.২৩৬
দ্র. দেশাচারাবিরুদ্ধং ব্যক্তাধিবিধিলক্ষণমলুপ্তক্রমাক্ষরং প্রমাণম্। বি.ধ.সূ.,৬.১১

[৮৩] মত্তাভিযুক্তস্ত্রীবালবলাৎকারকৃতং চ যৎ।
তৎ প্রমাণং লিখিতং ভীতোপধিকৃতং তথা।। নারদ.,৪.১৩৬

৫.সাক্ষী প্রমাণ

সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যের গ্রন্থগুলির বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যানে প্রমাণরূপে সাক্ষীর গুরুত্ব চোখে পড়ে। কোথাও বাদী কিংবা কোথাও প্রতিবাদী সাক্ষীকে উপস্থিত করেছে, আবার কোথাও সাক্ষী স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করেছে। সাক্ষীর চরিত্রগুলি বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা দেখলে সাক্ষী সম্বন্ধীয় একাধিক তথ্য সামনে আসে। যেগুলি কোথাও স্মৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আবার কোথাও বৈসাদৃশ্য।

যে কোনো ব্যক্তি সাক্ষী বলে বিবেচিত হতে পারে না। নির্দিষ্ট কতকগুলি গুণাবলী থাকলে তবেই কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হত। *শুকসপ্ততিকথা*র একবংশতিতম কথায় জানা যায়, যে কোনো ব্যক্তি সাক্ষ্য দান করতে আসলেই তার কথা বিশ্বাস করে বিচারক রায়দান করবেন না। তিনি সাক্ষীর যথার্থতা বিচার করেই তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। প্রতিষ্ঠান নামক নগরীতে প্রতিষ্ঠিত একজন বণিকের মন্দোদরী নামক এক কন্যা ছিল। স্বভাব দুষ্টা সেই কন্যা রাজার অত্যন্ত প্রিয় একটি ময়ূরের মাংস ভক্ষণ করেছিল। রাজা ময়ূরটি অন্বেষণ করতে থাকেন এবং দুন্দুভি বাজিয়ে এবিষয়ে রাজ্যবাসীকে অবগত করেন। এমন সময়ে বিকট দর্শনা, স্বভাব কুটিল, নিন্দনীয়া এক কুট্টিনী সেই দুন্দুভি স্পর্শ করে, প্রকৃত অপরাধীকে অন্বেষণ করার কার্যে সাক্ষ্য দান করতে স্বয়ং এগিয়ে আসে। কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত বণিক পুত্রী মন্দোদরীর বিরুদ্ধে দেওয়া তার সাক্ষ্য বিচারক গ্রহণ করেননি। সে সত্য কথা বললেও তার কথার ভিত্তিতে মন্দোদরীকে কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি।[৮৪]

কুট্টনীর চেহারার সম্পর্কে যে বর্ণনা মেলে, তাতে স্বাভাবিকভাবেই তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কুট্টনী ভয়ংকর দন্তবিশিষ্টা, কুরূপা, সমাজে নিন্দনীয়া, সে অপরের পত্নীকে পরপুরুষের সাথে মিলিত হওয়ার কর্মে সহায়তা করে, সে বিশ্বাসঘাতিনী। কোনো প্রকার

[৮৪] শুক.,পৃ.১০৭

চারিত্রিক গুণহীনা এমন নারী সমাজে সম্মানীয় বলে প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তির পরিবারের দিকে অভিযোগ করেছে। তাই রাজা মন্ত্রীকে কুট্টনীর কথায় বণিকবধূকে বিড়ম্বনা দিতে নিষেধ করেছেন। স্মৃতিশাস্ত্রেও সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তির আকৃতি, চরিত্র, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে দিক্ নির্দেশ করা হয়েছে। বস্তুতঃ এগুলির দ্বারাই কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য দানের যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। প্রায় সকল শাস্ত্রকারগণই সাক্ষীর যোগ্যতা বা গুণ সবিস্তার আলোচনা করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, সাক্ষীগণ হবেন তপস্বী, দানশীল, সৎকুল প্রসূত, সত্যবাদী, ধার্মিক, সরলমতি, পুত্রবান ও ধনবান।[৮৫] বৃহস্পতি বলেছেন, সাক্ষী শ্রুতি এবং স্মৃতিবিহিত ক্রিয়াকলাপে নিপুণ হবেন। তাঁর লোভ বা দ্বেষ থাকবে না। তিনি কুলীন সুশিক্ষিত এবং তপঃ, দান ও দয়া গুণযুক্ত হবেন। কাত্যায়ন, বিষ্ণু, নারদ সকল স্মৃতিকারগণই সাক্ষীর জন্য যে মাপকাঠি নির্দিষ্ট করেছেন তাতে সাক্ষীকে ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ, কুলীন, শীলবান, লোভ-মোহ-দ্বেষরহিত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। নারদের মতে সাক্ষীকে শারীরিকভাবেও পরিপূর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ কোনো ক্লীব, খঞ্জ কিংবা কোনো ভাবে শারীরিক অক্ষম ব্যক্তি সাক্ষী বলে গ্রহণীয় হবে না।[৮৬] অর্থাৎ স্মৃতির মতানুসারে ও আখ্যানেও দেখা যায় সাক্ষী হয়েছেন– প্রকৃত সজ্জন ও শারীরিকভাবে পরিপূর্ণ সক্ষম একজন ব্যক্তি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, উপরোক্ত গুণগুলি থাকলেও বহুস্থলে বিশেষকিছু ব্যক্তি সাক্ষী হতে পারেন না। সাক্ষ্য দানের জন্য গুণগুলি আবশ্যিক এমনটা বলেও শাস্ত্রকারগণ বিবাদে নির্ণয়দান যাতে সম্পূর্ণরূপে কণ্টকরহিত, সংশয়রহিত তথা পক্ষপাতশূন্য হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্যই এমন ব্যবস্থা করেছেন। সেগুলি হল – প্রথমত, কেউ যদি কারো আত্মীয় হয় তবে সে তার সাক্ষী হবার যোগ্য হবে না। দ্বিতীয়ত, মাতার পিতা, কাকা, পত্নীর ভ্রাতা, পত্নীর মাতা, ভাই, বন্ধু, জামাই স্পষ্টতঃ সাক্ষী হতে পারবেনা।[৮৭]

---

[৮৫] তপস্বিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
ধর্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তো ধনান্বিতাঃ।। যাজ্ঞ.,২.৬৮

[৮৬] ব্যঙ্গৈকশ্রোত্রিয়াচারহীনক্লীব...। নারদ.,৪.১৭৯

[৮৭] মাতুঃ পিতা পিতৃব্যশ্চ ভার্যায়া ভাতৃমাতরৌ। কাত্যা.,৩৬১
দ্র. ভ্রাতা সখা চ জামাতা সর্ববাদেষ্বয়ং বিধিঃ। বৃহ.,১৪.৩৯

আত্মীয় হওয়ায় তারা কেউ নিষ্পক্ষ সাক্ষ্য দিতে পারে না। তাই তারা সাক্ষ্য হবার যোগ্য নয়। মনু কিছু বিশেষ ব্যক্তিকে সাক্ষ্যদানে অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। তারা হল- পরস্পর অর্থের লেনদেন ব্যবসায়ী, আপ্ত নয় এমন ব্যক্তি, মিত্র, শত্রু, যার দোষ দৃষ্ট হয়েছে এমন, রোগী, মহাপাতকী ব্যক্তি কখনই সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য নয়।[৮৮] ধনসম্পদের লেনদেন করায় তারা পরস্পর উচিত সাক্ষ্য দিতে পারে না। মিত্র বা শত্রু অনুরাগ কিংবা দ্বেষের কারণে সত্যসাক্ষ্য দিতে পারে না। তারা নিষ্পক্ষ হতে পারে না। দোষে দূষিত ব্যক্তি স্বভাবতই অসত্যভাষণ করায় সাক্ষীরূপে যোগ্য হয় না। প্রায় সকল স্মৃতিকারের মতেই কিছু ব্যক্তি সাক্ষ্যদানে অযোগ্য। যথা – স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, দ্যূতাসক্ত, মত্ত, গ্রহোন্মত্ত, উন্মত্ত, ব্রহ্মহন্তা, অভিনেতা, পাষণ্ডী, বিকলেন্দ্রীয়, সুহৃদ্ (অর্থী ও প্রত্যর্থীর বন্ধুস্থানীয়), অর্থসম্বন্ধী, অভিশপ্ত, ক্ষধা-তৃষ্ণায় কাতর, ব্যবসনী, চোর, সাহসকারী, বিরুদ্ধ বক্তা, আত্মীয়গণের দ্বারা পরিত্যক্ত ব্যক্তি, মৃতান্তর সাক্ষী (অর্থী বা প্রত্যর্থীর মৃত্যুর পর নিরুপিত সাক্ষী) , ক্রূরকর্মী, অবশেন্দ্রিয় এবং সহায়ক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্যতা প্রাপ্ত হবে না।[৮৯] বালক বলতে যার ব্যবহার যোগ্যতা আসেনি, ষোল বছরের নিচে যার বয়স, সেই বালশব্দ বাচ্য এবং সাক্ষ্যদানে অযোগ্য। বৃদ্ধশব্দের দ্বারার আশি বছরের ঊর্ধ্বে যার বয়স তাকে বুঝতে হবে। যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত অসাক্ষীরূপে প্রতিপাদিত শ্লোকে বৃদ্ধশব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য শ্রোত্রিয়, বানপস্থকারী, সন্ন্যাসী, গুরুকুলবাসী এদের সকলকেই বুঝতে বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে এরাও সাক্ষী হওয়ার অযোগ্য।[৯০]

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীজাতিকে সাক্ষ্যদানাধিকারী বলে বিবেচনা না করলেও স্মৃতিতে এমন বিধান দেখা যায় যেখানে স্ত্রীজাতির বিবাদে স্ত্রীজাতিকেই সাক্ষী বলে গ্রহণ করতে বলা

---

[৮৮] নার্থসম্বন্ধিনো নাপ্তা ন সহায়া ন বৈরিণঃ।
ন দৃষ্টদোষাঃ কর্ত্তব্যা ন ব্যাধ্যার্ত্তা ন দূষিতাঃ।। মনু.,৮.৬৪

[৮৯] যাজ্ঞ.,২.৭০-৭১
দ্র. মনু.,৮.৬৫-৬৭
দ্র. নারদ,৪.১৭৮-১৮৬

[৯০] বালঃ অপ্রাপ্ত্যববহারঃ। বৃদ্ধঃ অশীতিকাবরঃ। বৃদ্ধগ্রহণং বচননিষিদ্ধানাম্ অন্যেষাম্ অপি শ্রোত্রিয়াদীনাম্ উপলক্ষণার্থম্ । মিতা.,২.৭০

হয়েছে। যে সকল শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীর সাক্ষী হওয়াতে নিষেধ করেছেন তারা কেবল পুরুষের বিবাদেই স্ত্রীর সাক্ষী হওয়ার নিষেধ করেছেন, স্ত্রী-যুক্ত আছে এমন বিবাদের ক্ষেত্রে নয়- এমনটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে। কাত্যায়ন ও মনুর মতে, সাক্ষী বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের বর্ণ বা জাতিরই হবেন, স্ত্রীজনের বিবাদের স্ত্রীই সাক্ষী দেবে, অন্ত্যজজনের বিবাদে অন্ত্যজজনই সাক্ষী হবে, হীনজাতির ব্যক্তিগণের বিবাদে হীনজন সাক্ষী দেবে, হীনজাতের ব্যক্তি উচ্চবর্ণের ব্যক্তি তথা ব্রাহ্মণকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না।[৯১] যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, সাধারণতঃ জাতি ও বর্ণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষী নিযুক্ত করা হলেও কোনো কোনোও ক্ষেত্রে সকল জাতির ব্যক্তিই যে কোনো বর্ণের বিবাদে সাক্ষ্য দান করতে পারবেন।[৯২]

তবে এবিষয়ে আখ্যানে ভিন্ন দৃষ্টান্ত মেলে। সেখানে স্ত্রী যুক্ত নয় এমন বিবাদেও স্ত্রীদের সাক্ষীরূপে নির্বাচন করা হয়েছে এবং তাদের বক্তব্যের ভিত্তিতে বিচারক রায়দান করেছেন। এমনি একটি দৃষ্টান্ত *শুকসপ্ততিকথার* তৃতীয় কথায় দেখা যায়। আখ্যানটিতে এক ধূর্ত ব্যক্তি বিমল নামক একজন বণিকের ছদ্মবেশ ধারণ করে তার গৃহ অধিকার করেছে। যিনি আসল বিমল নিজ গৃহ প্রবেশের জন্য ও নকল তথা ধূর্ত, ছদ্মবেশধারী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বিচারসভার শরণাপন্ন হয়েছে। রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেছে। যেহেতু ঐ ধূর্ত অম্বিকাদেবীর আরাধনা করে সম্পূর্ণ রূপেই বিমলের ন্যায় আকৃতি ধারণ করেছিল তাই রাজা কোনো ভাবেই প্রকৃত বিমল কে তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। এমতাবস্থায় তিনি বিমলের দুই পত্নীকে সাক্ষীরূপে নির্বাচন করে, প্রকৃত ব্যক্তি কে, তা নিশ্চিত করেছিলেন।[৯৩] বিবাদটি দুজন পুরুষের মধ্যে হলেও রাজা এক্ষেত্রে স্ত্রীলোককে সাক্ষীরূপে নির্বাচন করেছেন। কার বিবাদে কে সাক্ষী হবেন এবিষয়ে আখ্যানটির সাথে যাজ্ঞবল্ক্যের মতেরই মিল দেখা যায়। তিনিও বিবাদনিষ্পত্তির জন্য বর্ণ-জাতি-

---

[৯১] বিভাব্যো বাদিনা যাদৃক্ সদৃশৈরেব ভাবয়েত্।
নোৎকৃষ্টশ্চাবকৃষ্টস্তু সাক্ষিভির্ভাবয়েত্ সদা ।। কাত্যা.,৩৮৪
দ্র. মনু., ৮.৬৯

[৯২] যথাজাতি যথাবর্ণং সর্বে সর্বেষু বা স্মৃতাঃ। যাজ্ঞ.,২.৬৯

[৯৩] শুক., পৃ.২০-২২

লিঙ্গনির্বিশেষে সাক্ষী নিয়োগ করতে বলেছেন। কারণ সবক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট জাতি কিংবা লিঙ্গের ব্যক্তিকে সাক্ষীরূপে পাওয়া যাবে এমনটি সম্ভব নয়। তাই বিচারকার্য যাতে স্তব্ধ না হয়ে যায় সে কারণেই এমন বিধান। আলোচ্য আখ্যানটিতেও রাজা নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করেও দুষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে অসমর্থ হয়েছেন। তবেই স্ত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন – তা না হলে ধূর্তকে ধরা অসম্ভব হয়ে যেত এবং যিনি প্রকৃত বিমল তিনি নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন, তাই বিচারের স্বার্থেই তিনি এমন করেছেন।

নির্ণয়দানকালে বিচারক কতজন সাক্ষীর বক্তব্যের ওপরে ভিত্তি করে বিচার করবেন সেবিষয়ে আখ্যানে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। বিভিন্ন আখ্যানগুলিতে সাক্ষী সম্বন্ধিয় যে আলোচনা মেলে সেখানে সাক্ষীর নির্দিষ্ট সংখ্যা বিষয়ে স্পষ্ট রূপরেখা নেই। কোনো আখ্যানে একজন সাক্ষীর বক্তব্যে ওপরে ভিত্তি করেই নির্ণয়দান করা হয়েছে আবার কোথাও রায়দানের জন্য দুজন বা ততোধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন *শুকসপ্ততিকথার* তৃতীয় কথায় বিমলের একজন স্ত্রীর কথার ভিত্তিতেই বিবাদের নিষ্পত্তি হতে পারতো তবুও রাজা দুজনেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।

কথাসরিৎসাগরের লাবাণক লম্বকের ষষ্ঠতরঙ্গের 'সুন্দরকের কাহিনি'তে সুন্দরকের বিচারের সময় তার একাধিক বন্ধুর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে আবার এই গ্রন্থেরই 'কদলীগর্ভার আখ্যানে' কদলীগর্ভার শুচিতা সম্বন্ধিয় বিচারকালে একজন নাপিতের সাক্ষ্যর ভিত্তিতে তাকে মুক্ত করা হয়েছে। *বেতালপঞ্চবিংশতির* তৃতীয় উপাখ্যানে একজন সাক্ষীর দ্বারাই বিচার করা হয়েছে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত *পঞ্চতন্ত্রের* মিত্রভেদের চতুর্থ আখ্যানেও দেখা যায়। কিন্তু স্মৃতিতে সাক্ষীর সংখ্যাবিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। প্রায় সকল স্মৃতিকারদের মতেই কোনো মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সাক্ষীর সংখ্যা তিনের কম হবে না। আবার অন্যত্র এমন মতামতও দেখা যায় যেখানে বলা হয়েছে, বাদী ও প্রতিবাদীর সম্মতিক্রমে একজন ধর্মবিদ্ ব্যক্তিও সাক্ষী হতে পারেন। বৃহস্পতির মতে, মোকদ্দমায় সাক্ষীর সংখ্যা নয়, সাত, পাঁচ, চার বা তিন হতে পারে অথবা দুজন

বিদ্বান ব্রাহ্মণই পর্যাপ্ত। তিনি একজন সাক্ষীর দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তিতে নিষেধ করেছেন।[৯৪] *বিষ্ণুধর্মসূত্রেও* একই নিষেধ দেখা যায়। তবে, পরস্ত্রীসংগ্রহণ, চৌর্য, বাকপারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য এবং সাহসকর্মে গুণ-জাতি-সাক্ষীর সংখ্যা ইত্যাদি অনুযায়ী সাক্ষীনির্বাচন শাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে।[৯৫] এই সকল বিবাদে উপযুক্ত সাক্ষী পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব লোকব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করে সকলকেই সাক্ষী হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যাদের সাক্ষীত্ব স্মৃতিতে নিষিদ্ধ হয়েছে তারাও এই সকল বিবাদে সাক্ষী হতে পারবে।

স্মৃতির এই বিধানের প্রতিফলন *বেতালপঞ্চবিংশতির* তৃতীয় উপাখ্যানেও দেখা যায়। সেখানে এক স্বামী তার ব্যভিচারিণী স্ত্রীর মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। তার স্ত্রী নাসিকাচ্ছেদনের অভিযোগ নিয়ে ন্যায়ালয়ে বিচারপ্রার্থী হয়েছে। সজ্জন ঐ ব্যক্তি তার নিজের সপক্ষে কোনো প্রমাণ প্রদর্শন করতে না পারায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। শুলে আরোহণের জন্য বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাওয়ার সময় একজন চোর উপস্থিত হয়ে, তার নিরপরাধীতা বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেছে এবং তার মৃত্যুদণ্ডরূপ শাস্তি থেকে তাকে বাঁচিয়েছে। চোর রাতে অন্তরালে থেকে তার স্ত্রীকে উপপতির সহিত মিলিত হতে দেখেছে এবং পিশাচ কর্তৃক তার নাসিকাচ্ছেদন হতেও দেখেছে। বিচারসভায় এই সকল সত্যবৃত্তান্ত নিবেদনের মাধ্যমে সে অভিযুক্তকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন।[৯৬] চোর সমাজে এক ঘৃণ্য পেশার সাথে যুক্ত, সে নিজেও অপরাধী তবুও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। নাসিকাচ্ছেদন এই অপরাধটি দণ্ডপারুষ্য বিবাদপদের আওতাধীন। এই সকল বিবাদে সাক্ষী সবসময় সহজলভ্য হয় না। তাই সকল সাক্ষী-ই এক্ষেত্রে গ্রহণীয়। শাস্ত্রেও এমন বলা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সাক্ষী একজন চোর তাই প্রাড্বিবাক বার বার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ

---

[৯৪] নব সপ্ত চ পঞ্চ স্যুশ্চত্বারস্ত্রয় এব বা।
উভৌ বা শ্রোত্রিয়ৌ খ্যাতৌ নৈকং পৃচ্ছেৎকদাচন।। বৃহ.,৫.১
তুল. একশ্চাসাক্ষী। বি.ধ.সূ.,৮.৫

[৯৫] উভয়ানুমতঃ সাক্ষী ভবত্যেকোঽপি ধর্মবিত্।
সর্বঃ সাক্ষী সংগ্রহণে চৌর্যপারুষ্যে সাহসে।। যাজ্ঞ.,২.৭২

[৯৬] বেতাল.,পৃ.৩১-৩২

করেছেন এবং তথ্যানুসন্ধান করে তবেই তার কথায় বিশ্বাস করেছেন। একইভাবে *কথাসরিৎসাগরের* নাপিতের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত নীচ বর্ণের হওয়া সত্ত্বেও নাপিতের সাক্ষ্য রানীর দণ্ডমুক্ত ঘটিয়েছে।

এবিষয়ে *নারদস্মৃতিতে* একটি ভিন্নধর্মী মত দৃষ্ট হয়। সাক্ষীবিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দণ্ডপারুষ্য এই নির্দিষ্ট বিবাদপদটিতে সাক্ষী অনাবশ্যক বলেছেন। তাঁর মতে, দণ্ডপারুষ্যে প্রত্যক্ষচিহ্ন থাকায় বিবাদ স্বতঃ প্রমাণিত হয়ে যায় তাই সাক্ষীর প্রয়োজন নেই।[৯৭]

যে বিবাদ নির্ণয়ে একাধিক সাক্ষী নিযুক্ত হতো সেক্ষেত্রে সাক্ষীগণের মধ্যে মতবিরোধ হলে বিবাদের নিষ্পত্তি কিভাবে সম্ভব- এমন সংশয়ের নিরসনও শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। সাক্ষীরা সমানগুণ যুক্ত হলে সংখ্যাধিক্য পক্ষের মত গ্রহণীয় হবে। গুণবানদের মধ্যে মতবিরোধ হলে যিনি অধিক গুণযুক্ত দ্বিজোত্তম হবে তাকে অধিক প্রামাণিক মানতে হবে। সমানযোগ্যতা ও গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ সাক্ষী হলে তাদের বিরোধে শ্রৌত ও স্মার্ত ক্রিয়ায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বাক্যকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করতে হবে। স্মৃতিকারগণ সাক্ষীগণের সংখ্যা অপেক্ষা গুণকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের বিদ্ববত্তা, গুণ, কুলীনতা ও চারিত্রিক গুণাবলীর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এমন একজন সাক্ষী হলেও তাকে অধিক প্রামাণিক বলে তারা উল্লেখ করেছেন।[৯৮]

স্মৃতিতে বিচারব্যবস্থার যে রূপরেখাটি মেলে তাতে দেখা যায়, বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে যে পক্ষের উপর প্রমাণ প্রস্তুত করার দায়িত্ব থাকে সেই পূর্বে সাক্ষী পেশ করে। অন্যান্য প্রমাণ এবং সাক্ষীর সত্যতা যার পক্ষে যায় সেই জয়লাভ করে। যে পক্ষ পরাজিত হয় সে ও তার সাক্ষী অসত্যবাদীরূপে সিদ্ধ হয়। বিষ্ণুর মতে, যে পক্ষের সাক্ষী প্রতিজ্ঞাত বিষয়কে সত্য বলে সিদ্ধ

---

[৯৭] প্রত্যক্ষচিহ্নো বিজ্ঞেয়ো দণ্ডপারুষ্যকৃন্নরঃ।
অসাক্ষিপ্রত্যয়া হ্যেতে পারুষ্যে তু পরীক্ষণম্।। নারদ,৪.১৭৫

[৯৮] দ্বৈধে বহুনাং বচনং সমেষু গুণিনাং তথা।
গুণিদ্বৈধে তু বচনং গ্রাহ্যং যে গুণবত্তমা।। যাজ্ঞ.,২.৭৮
দ্র. বহুত্বং প্রতিগৃহ্নীয়াৎসাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ।
সমেষু চ গুণোৎকৃষ্টানগুণিদ্বৈধে দ্বিজোত্তমান্।। বি.ধ.সূ.,৮.৩৯

করে সেই পক্ষ বিজয়ী হয়। যে পক্ষের সাক্ষী অসত্যবাদী এবং অযথার্থবাদী বলে প্রমাণিত হয় সেই পক্ষকে পরাজিত বলে মানা হয়।[৯৯] সাক্ষীদের উচিত বিচারসভায় সত্যকথা বলা কারণ তার উপরে বাদী প্রতিবাদীর জয়-পরাজয় নির্ভর করে। সাক্ষী সত্যকথা বললে ইহ জগতে উত্তমকীর্তি লাভ করে, প্রশংসিত হয়, কখনও কখনও পুরস্কারাদিও প্রাপ্ত হন। মৃত্যুর পর সত্য সাক্ষ্যদানের জন্য তার স্বর্গলাভ ঘটে। সাক্ষ্যদানে মিথ্যা বললে যেমন দণ্ড পেতে হত তেমনি মৃত্যুর পর শত জন্ম পর্যন্ত নানাবিধ শাস্তিও পেতে হত- এমন বিধানই শাস্ত্রে মেলে। যিনি মিথ্যা সাক্ষ্যদান করেন এবং যিনি বিচারের সিদ্ধান্ত নিজের সপক্ষে আনার জন্য মিথ্যাসাক্ষী নিয়োগ করেন তারা উভয়ই দণ্ডর্হ। বিভিন্ন আখ্যানে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির উল্লেখ পাওয়া যায়।

পঞ্চতন্ত্রের মিত্রভেদ-এর 'ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি কথা'য় বিচারসভার এক দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যেখানে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী ও মিথ্যাসাক্ষী নিয়োগকারীর করুণ পরিণতি দেখা যায়। কাহিনিটিতে ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে দেশে ফেরার সময় ধনরাশি জঙ্গলে প্রোথিত করে, নিজ নিজ গৃহে গমন করেছে। ধর্মবুদ্ধিকে না জানিয়েই গোপনে পাপবুদ্ধি সকল ধন আত্মসাৎ করেছে। পরে ধর্মবুদ্ধি ধন অন্বেষণ করে না পেয়ে পাপবুদ্ধিকে দোষী বলেছে। কিন্তু পাপবুদ্ধি নিজের দোষ অস্বীকার করে ধর্মবুদ্ধির উপরেই চুরির অভিযোগ করেছে। দুজন বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য ন্যায়ালয়ে উপস্থিত হয়েছে। সেখানে পাপবুদ্ধি একটি বৃক্ষকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করেছে। বৃক্ষের কোটরে নিজের পিতাকে রেখে সে বিচারকে প্রভাবিত করে নিজ পক্ষে আনার চেষ্টা করেছে। পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য পাপবুদ্ধি ও তার পিতা উভয়েই শাস্তি পেয়েছে।[১০০]

আলোচ্য আখ্যানটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্মৃতি বিহিত বিচারপদ্ধতি অনুসারেই এখানে সাক্ষীপ্রমাণ পরিবেশিত হয়েছে। অভিযুক্ত পাপবুদ্ধি নিজের সত্যতা প্রমাণের

---

[৯৯] যস্যোচুঃ সাক্ষিণঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাতং স ঋণী ভবেত্।
অন্যথাবাদিনঃ চাস্য ধ্রুবস্তস্য পরাজয়ঃ।। তদেব,৮.৩৮

[১০০] পঞ্চ.,পৃ.২৮২

জন্য পূর্বে সাক্ষী পেশ করেছে। সে সাক্ষীরূপে নির্দিষ্ট বৃক্ষটির কোটরে নিজের পিতাকে লুকিয়ে রেখে, তাকে দিয়ে মিথ্যা বাক্য বলিয়েছে এবং ধর্মবুদ্ধিকে দোষী বলে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু পরে এই সকল ঘটনা ন্যায়াধীশ তথা সকলে অবগত হতে পেরেছেন। মিথ্যাসাক্ষী পেশ করার দণ্ডস্বরূপ পাপবুদ্ধিকে শমীবৃক্ষের শাখায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার পিতা পুত্রের কথায় এমন অসৎকার্য স্বরূপ মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে রাজি হয়েছেন তাই তারও পরিণতি হয়েছে মৃত্যু। রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পূর্বেই অদৃষ্টের প্রভাবে তার মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্যদান করলে তার শাস্তি ব্যক্তিকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এখানে অর্ধ জ্বলে যাওয়া শরীরবিশিষ্ট, কোটর থেকে চক্ষুনিষ্কাশিত, প্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়া, আর্তনাদরত পাপবুদ্ধির পিতার যে শারীরিক চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে তা একদিকে যেমন মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারীর ভয়ঙ্কর পরিণতিকে তুলে ধরে অন্যদিকে আবার বিকৃত চেহারা বিশিষ্ট তার আকৃতি স্মৃতিতে উল্লিখিত সাক্ষীর স্বরূপে বিপরীতধর্মী। অর্থাৎ সাক্ষী হওয়ার অযোগ্য ব্যক্তি স্মৃতিতে ও আখ্যানে একইভাবে চিত্রিত হয়েছে। *শুকসপ্ততিকথার* একবিংশতিতমকথায় এই একই কারণে মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কুট্টনী নির্বাসিত হয়েছে। গ্রন্থভেদে মিথ্যাসাক্ষীর দণ্ড ভিন্ন ভিন্ন হলেও কেউ-ই দণ্ডের থেকে রেহাই পায়নি।

এতৎসত্ত্বেও সাক্ষীরা ‘যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়’, এই আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূর করার জন্য সাক্ষ্যদানের পূর্বে তাদের নানাবিধ শপথ করিয়ে নিয়ে তবেই তাদের সাক্ষ্য বিচারালয়ে গ্রহণ করা হত। অর্থাৎ সত্যভাষণ করবেন এমন প্রতিজ্ঞা সাক্ষ্যদানের পূর্বে তাদের করতে হত। নারদ সাক্ষী বিষয়ক আলোচনায় সাক্ষীদের শপথপূর্বক সাক্ষ্যগ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রাহ্মণকে সত্য দ্বারা, ক্ষত্রিয়কে বাহন দ্বারা এবং অস্ত্র দ্বারা, বৈশ্যকে গো-বীজ ও সোনা দ্বারা, শূদ্রকে সর্ববিধ পাতক দ্বারা শাপ দেওয়ার বিষয়ে শপথ করানো হত।[১০১] বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিপালনে প্রধান আশ্রয় তথা সহায়ক দ্বারাই প্রতিটি বর্ণের পৃথক পৃথক শপথ গ্রহণ করানো হত। মূলতঃ এর দ্বারা তাদের নিজ নিজ বর্ণধর্মের প্রতি তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করানো হত। যদি তবুও সাক্ষীগণ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে

---

[১০১] সত্যেন শাপয়েত্বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং বাহনায়ুধৈঃ।
গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্বৈস্তু পাতকৈঃ।। নারদ.,৪.১৯৯

এমনটা প্রমাণিত হত তবে রাজা বা বিচারক তাদের শাস্তি দিতেন। এপ্রসঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্রকার ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডবিধি নির্দিষ্ট করেছেন।

কেউ যদি সাক্ষ্য দেবো এমন প্রতিজ্ঞা করেও বিচারকালে সাক্ষ্য না দেয় তবে সে দণ্ডভাক্ হত। যাজ্ঞবল্ক্য শপথ গ্রহণ করেও যে সাক্ষী সাক্ষ্যদানে বিরত হয় তাকে বিবাদে পরাজয়ের নির্দিষ্ট দণ্ড অপেক্ষা আটগুণ দণ্ড দিতে বলেছেন। কোনো ব্রাহ্মণ এমন করলে তাকে দেশ থেকে নির্বাসন দিতে বলা হয়েছে।[১০২] ব্রাহ্মণ হল চার বর্ণের মধ্যে সর্বোত্তম, অন্যান্য বর্ণের অনুকরণীয়। ব্রাহ্মণ সত্যের শপথ করেও তা থেকে বিচ্যুত হলে তা অবশ্যই দোষযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তাই ব্রাহ্মণকে অর্থ ও শারীরিক দণ্ড স্মৃতিতে না দিলেও তার জন্য দেশ নিষ্কাশন রূপ শাস্তি বিহিত হয়েছে। অপরবর্ণের ব্যক্তিরা শপথবাক্য পাঠ করেও সাক্ষ্যদানের সময় কারোর প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রভৃতি কারণে নিজে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে কিংবা 'আমি সাক্ষী নই' এরূপ বললে তাকে বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট অর্থদণ্ড কিংবা শারীরিক দণ্ড অপেক্ষা আটগুণ দণ্ড দিতে হত। যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণকে নির্বাসন দণ্ড দিলেও বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য বলেছেন, ব্রাহ্মণ আটগুণ দণ্ড না দিতে পারলে তবেই তাকে অন্য দণ্ড দেওয়া হবে। এপ্রসঙ্গে তিনি ব্রাহ্মণের জন্য 'বিবাসিত করা' এরূপ দণ্ড নির্দিষ্ট করেছেন এবং টীকায় বিবাসিত করা বলতে নগ্ন করা, গৃহভঙ্গ করা, দেশ থেকে নিষ্কাশন করাকে বুঝিয়েছেন।[১০৩]

পরিশেষে মনুকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, সকল বর্ণের মধ্যেই যিনি আপ্ত তিনি সকল বর্ণেরই সাক্ষী হতে পারেন।[১০৪] যারা অবিসংবাদক, যারা যেমনটি দেখেন বা শোনেন ঠিক সেরকমই বলেন, যারা শ্রুতি-স্মৃতি ও আচার প্রভৃতির ওপর ধর্মের পথে প্রতিষ্ঠিত, ধর্মবিষয়ে অভিজ্ঞ লোভশূন্য-এরকম ব্যক্তি সকল ব্যবহারে সাক্ষী হওয়ার উপযুক্ত। ইহলোক ও পরলোকে

---

[১০২] যঃ সাক্ষ্যং শ্রাবিতোঽন্যেভ্যো নিহ্নতে তত্তমোবৃতঃ।
স দাপ্যোঽষ্টগুণং দণ্ডং ব্রাহ্মণং তু বিবাসয়েত্ ।। যাজ্ঞ.,২.৮২

[১০৩] ব্রাহ্মণং পুনঃ অষ্টগুণদ্রব্যদানাসমর্থং বিবাসয়েত্। বিবাসনং নগ্নীকরণং গৃহভঙ্গদেশনির্বাসন-লক্ষণং বিষয়ানুসারেণ দ্রষ্টব্যম্। মিতা.,২.৮২

[১০৪] আপ্তাঃ সর্বেষু বর্ণেষু কার্যাঃ কার্যেষু সাক্ষিণঃ। মনু.,৮.৬৩

নিরুপম সুখলাভের জন্য তিনি অনুরাগ ও দ্বেষরহিত হয়ে সর্বদা সত্য কথা বলে বিচারকে সঠিক দিশা দেখাবেন।

৬.ভুক্তি প্রমাণ

স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ভুক্তি প্রমাণটির উল্লেখ আখ্যানেও দেখা যায়। সেখানেও বিবাদ নিরসনে এই প্রমাণের গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে এবং ভুক্তি প্রমাণ বিষয়ক একাধিক নির্দেশিকাও উল্লিখিত হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রের* কাকোলূকীয়ম্ এর 'শশ-কপিঞ্জল কথা' আখ্যানটিতে ভোগ প্রমাণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। একটি চড়ুই পাখি ও একটি কাক একই বৃক্ষে একসাথে বাস করতো। কিছুদিন পর চড়ুই পাখিটি খাদ্যের অন্বেষণে অন্যত্র গমন করে। অনেক দিন অতিক্রান্ত হলেও চড়ুই পাখিটি আপন কোটরে ফিরে আসে না এবং কোটরটি ফাঁকাই পড়ে থাকে। এমন সময় একদিন একটি খরগোশ চড়ুই পাখিটির কোটরটি অধিকার করে এবং সেখানে বাস করতে শুরু করে। কিছুদিন পর চড়ুই পাখিটি আপন কোটরে ফিরে আসে এবং সেটি অন্যের দ্বারা অধিকৃত দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। এবং খরগোশকে কোটরটি ত্যাগ করতে বলে। কোটরটিতে কার অধিকার এই নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। তারা বিবাদ নিরসনের জন্য বিচারকের শরণাপন্ন হয়।[১০৫]

আলোচ্য আখ্যানটিতে খরগোশ ও চড়ুইটির বাদানুবাদকালে ভোগ দখল বা ভুক্তি প্রমাণ বিষয়ক একাধিক তথ্য গ্রন্থকার সন্নিবেশিত করেছেন। স্মৃতিশাস্ত্রবচন স্মরণপূর্বক কখন ভোগদখলকারী কোনো দ্রব্যের মালিক হতে পারবেন কখন নয় সে বিষয়ে দিক্ নির্দেশ করা হয়েছে। চড়ুইটি শশককে তার কোটরটি ত্যাগ করতে বললে শশকটি চড়ুইকে জানিয়েছে, যেহেতু বর্তমানে কোটরটি শশক ভোগ করছে তাই চড়ুইয়ের তাতে কোনো স্বত্ব বা অধিকার নেই। কারণ দশ বর্ষ যাবৎ কেউ কোনো ভূমি ভোগ করলে , সেক্ষেত্রে সাক্ষী ও লিখিত কোনো প্রমাণেরই

---

[১০৫] পঞ্চ.,পৃ.৪৪৪-৪৮৮

প্রয়োজন হয় না। কেবল ভোগই প্রমাণ বলে বিবেচিত হয় এবং ঐ ক্ষেত্র ভোগকর্তার হয়ে যায় – স্মৃতিতে এমন কথিত আছে এরূপ বলে শশক চড়ুইয়ের স্বত্বাধিকার নস্যাৎ করে দেয়। স্মৃতিতে ভুক্তিপ্রমাণ প্রসঙ্গে শশকোক্ত বচনটি দৃষ্ট হয়। তবে সেখানে আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক বিধানও দৃষ্ট হয়। স্মৃতিশাস্ত্র মতে, যদি কোনো ব্যক্তি দীর্ঘ সময় যাবৎ কোনো ভূমিকে ভোগ করে ও ভূমির মালিক তা দাবি না করে তবে একটি নিশ্চিত সময়ের পর ঐ ভূমি দখলকারী বা ভোগকারীর হয়। তখন ঐ ভূমির ওপর পূর্বের মালিকের কোনো বৈধ অধিকার থাকে না। তবে সে তার ভূমি বিষয়ে মামলা করতে পারবে। কারণ তার ভূমির স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়না। ভোগ্যবস্তু ভূমি ছাড়া অন্য যে কোনো পার্থিব বস্তুই হতে পারে। কোন দ্রব্য কতদিন বিনা বাঁধায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগ করলে তাতে ভোগকারীর অধিকার জন্মাবে সে বিষযে স্মৃতিকারদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, জমির মালিকের সামনে বিনা প্রতিবাদে যদি কেউ কোনো ভূমি ২০ বছর ধরে ভোগ করে তবে ঐ জমিটি দখলকারীর হয়। জমির মালিকের জমির হানি ঘটে। হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ধনের ক্ষেত্রে ১০ বছর ঐ প্রকার নির্বাধ ভোগের দ্বারা ঐ সকল ধন ভোগকারীর হয়।[১০৬] এখানে ভূমি ও ধনের ফলহানিকেই বুঝতে হবে। বস্তুহানিকে নয় কিংবা ব্যবহারহানিও নয়। জমির মালিক জমির ফলভোগ থেকে বঞ্চিত হন। কিন্তু তিনি জমিটি পুনরুদ্ধারের জন্য অবশ্যই আবেদন করতে পারবেন। ২০ বছর পরেও ঐ ভোক্তার ওপর রাজদণ্ড প্রযুক্ত হতে পারে যদি তা অনাগম ভোগ হয়। ভূস্বামীর বা ধনস্বামীর উপেক্ষারূপ অপরাধের জন্যই এক্ষেত্রে তার ফলহানি ঘটে।

মনু বলেছেন, স্বামী যদি পোগণ্ড বা জড় না হয় অথচ দ্রব্যটি যদি তার স্বদেশেই অন্য কেউ ভোগ করতে থাকে তবে ব্যবহারবিধি অনুসারে ঐ দ্রব্যে দ্রব্যস্বামীর স্বত্ব লোপ পাবে এবং ঐ দ্রব্যটি ভোগকারীর অধীনস্থ হবে।[১০৭]

---

[১০৬] পশ্যতোঽব্রুবতো ভূমের্হানির্বিংশতির্বার্ষিকী।

পরেণ ভুজ্যমানায়া ধনস্য দশবার্ষিকী।। যাজ্ঞ.,২.২৪

[১০৭] অজড়শ্চেদপোগণ্ডো বিষয়ে চাস্য ভুজ্যতে।

ভগ্নং তদ্ব্যবহারেণ ভোক্তা তদ্ দ্রব্যমর্হতি।। মনু.,৮.১৪৮

স্মৃতিশাস্ত্রের আলোকে বিচার করলে আলোচ্য আখ্যানটিতে চড়ুই পাখির আপন কোটর ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টা একেবারেই অসঙ্গত বলা যায় না। কারণ চড়ুই কতদিন কোটরের বাইরে ছিল তা উক্ত হয়নি, আবার শশকের ভোগক্রিয়া চড়ুইটির সম্মুখে বিনা বাধায়ও ঘটেনি। শশকের ভোগের পক্ষে কোনো বৈধ আগম প্রমাণাদিও দেখা যায় না এবং সে দীর্ঘদিন যাবৎ ভোগ করছে এমনটাও নয়। ভোগ তখনই বলবান বলে বিবেচিত হয় যখন তা নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্বপুরুষানুক্রমে ভোগ করা হয়। সেক্ষেত্রে আগম বা অন্য প্রমাণ দ্বারা ভোগকে অস্বীকার করা যায় না।

পঞ্চতন্ত্রের কাকোলূকীয়মের দ্বিতীয় কথায় পিতৃপুরুষাদিক্রমে কৃত ভোগের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা দেখা যায়। 'শশক-গজযুথককথা' শীর্ষক আখ্যানটিতে একটি জলাশয়ের চারধারে কোমল তৃণযুক্ত ভূমিতে একদল খরগোশের বাসস্থান ছিল। কিন্তু কিছু দিন পর একদল হাতি সেখানে এসে বাস করতে শুরু করায় খরগোশেরা গৃহহীন হয়েছে। শক্তির বিচারে হাতির দল খরগোশদের থেকে অনেক শক্তিশালী হওয়ায় খরগোশের দল নিজেদের অক্ষম ভেবে তাদের বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রসঙ্গেই খরগোশদলের একজন শাস্ত্রবচন স্মরণ পূর্বক ভোগকৃত স্থান ছেড়ে যাওয়ার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে। পিতৃপুরুষাদি ক্রমে যেহেতু ঐ স্থান তারা ভোগ করছে, তাই ঐ স্থানে কেবল তাদের অধিকারই গ্রাহ্য হবে। শুধু তাই নয় আপন এই যুক্তির কথা তারা হাতিদের দলপতিকে জানিয়েছে এবং নিজেদের ক্ষেত্র ত্যাগ করেনি।[১০৮] আখ্যানটিতে খরগোশেরা পিতৃপুরুষাদি ক্রমে ঐ স্থান ভোগ করেছিল বলেই তাদের অধিকার হাতিদের অপেক্ষা অধিক বলে বিবেচিত হয়েছে এবং গজদলপতিও একথা স্বীকার করে ঐ স্থান ত্যাগ করেছে। ভোগ সম্বন্ধীয় এই নিয়মটি স্মৃতিতে উল্লেখিত বিধানেরই প্রতিফলন বলা যেতে পারে। কারণ সেখানেও তিন পুরুষধরে কোনো ক্ষেত্র কেউ ভোগ করলে সেখানেও ভোগকে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে বলশালী হাতিরা সহজেই খরগোশদের হারিয়ে স্থানটি অধিকার করতে পারতো কিন্তু গল্পকার হাতিদের ঐ স্থান ত্যাগ করানোর মধ্য দিয়ে

[১০৮] পঞ্চ.,পৃ.৪৭৬-৪৭৯

দীর্ঘদিনের ভোগকেই প্রামাণ্যতা দিয়েছেন। যেমন স্মৃতিতে সত্ত্ব প্রতিপাদনে অন্যান্য উপায় অপেক্ষা তিনপুরুষের ভোগকে প্রমাণিক মানা হয়েছে। আখ্যানটির বলশালী হাতি যেন সত্ত্ব প্রতিপাদক অন্যান্য সকল উপায়েরই নামান্তর।

স্মৃতিতে পিতৃপিতামহাদি ক্রমে ভোগের ক্ষেত্রে যে বিধানগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেগুলি হল – মনু, বৃহস্পতি, কাত্যায়নের মতে আগম প্রভৃতি থাকুক বা না থাকুক নিরবচ্ছিন্নভাবে তিন পুরুষ ভোগ করাকে জমির মালিকানার ক্ষেত্রে প্রমাণ বলেছেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য এবিষেয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ক্রয়-প্রতিগ্রহ প্রভৃতির দ্বারা প্রাপ্ত আগম প্রমাণ ভোগ প্রমাণ হতে অধিক বলবান বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু পিত্রাদি তিন পুরুষক্রমে আগত ভোগ হতে অন্য কোনো স্বত্ব প্রতিপাদক অধিক প্রবল কোনো প্রমাণ নেই।[১০৯] দানগ্রহণ, ক্রয় প্রভৃতির দ্বারা যে স্বত্ব উৎপন্ন হয় তা ভোগ বা ভুক্তির দ্বারা উৎপন্ন স্বত্ব অপেক্ষা অধিক বলবান। কিন্তু পূর্বপুরুষানুক্রমে কৃত যে ভোগ তা আগমের থেকে বলবান হয়। *মিতাক্ষরা*কার আলোচ্য শ্লোকের টীকায় ভোগের পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করেছেন। যেগুলিকে তিনি ভোগপ্রমাণ বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ পরের দ্রব্য অপহরণের দ্বারাও ভোগ সম্ভব। সুতরাং ভোগ পাঁচটি বিশেষণযুক্ত হলে তবেই তা প্রমাণ বলে গণ্য হয়। সেগুলি হল – আগমসহিত, দীর্ঘকাল, নিরন্তর, নিরাক্রোশ এবং প্রত্যর্থীপ্রত্যক্ষ। নারদের মতে, বিশুদ্ধ আগমের দ্বারাই ভোগ প্রমাণ বলে বিবেচিত হয়। আগম অবিশুদ্ধ হলে সেই ভোগ প্রমাণ বলে বিবেচিত হয় না।[১১০]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য পিতৃপুরুষানুক্রমে আগত ভোগ কিন্তু আগম নিরপেক্ষ এবং আগমের থেকেও অধিক বলবান। অবশ্য এক্ষেত্রে আগমটি অজ্ঞাত থাকে, কিন্তু আগম নেই এরূপ বলা যায় না। পিতৃপুরুষক্রমে আগত ভোগে আগমটির সত্তা ঐ নিরবচ্ছিন্ন ভোগের দ্বারাই উপলব্ধ হয়। প্রথম যে ব্যক্তি ভূমি বা ধন ভোগ করতে শুরু করে সে যদি আগম প্রমাণ না দেখাতে পারে

---

[১০৯] আগমোঽভ্যধিকো ভোগাদ্ বিনা পূর্বক্রমাগাতাৎ।
আগমেঽপি বলং নৈব ভুক্তিঃ যত্র নো।। যাজ্ঞ.,২.২৭

[১১০] আগমেন বিশুদ্ধেন ভোগো যাতি প্রমাণতাম্।
অবিশুদ্ধাগমো ভোগঃ প্রামাণ্যং নৈব গচ্ছতি।। নারদ.,৪.৮৫

তবে তার দণ্ড হবে। তার পুত্র হল দ্বিতীয় ভোক্তা। যে আগম প্রদর্শন করবে না কিন্তু সেই ব্যক্তি যে অবিচ্ছিন্নভাবে অপ্রতিবাদে অর্থীর সমক্ষে ভোগ করছে তার প্রমাণ দেবে। দ্বিতীয় ভোক্তা আগম না দেখালে দণ্ড পাবে না। কিন্তু বিশিষ্ট ভোগের প্রমাণ না দেখালে দণ্ড পাবে। তার পুত্র হল তৃতীয় ভোক্তা। যে আগমের প্রমাণ দেখাবে না এমনকি বিশিষ্টভোগেরও প্রমাণ তাকে দেখাতে হবে না। কিন্তু সে যে পিতৃপিতামহক্রমে ঐ ভোগ্যবস্তুটি ভোগ করছে তার প্রমাণ তাকে দেখাতে হবে। এই তৃতীয় ভোক্তা ক্রমাগত ভোগের প্রমাণ না দেখালে দণ্ডভাক্ হবে। আগম প্রমাণ বা বিশিষ্ট ভোগপ্রমাণ না দেখালেও তার দণ্ড হবে না। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভোক্তার ভুক্তি গরীয়সী। দ্বিতীয় ভোক্তার ক্ষেত্রেও ভুক্তি আগম অপেক্ষা গুরু, কিন্তু তৃতীয় ভোক্তার ক্ষেত্রে তা আগম অপেক্ষা গরীয়সী। হারীতের বচন উল্লেখ পূর্বক *মিতাক্ষরা*কার তিনজন ভোক্তার ক্ষেত্রেই আগম প্রমাণ না দেখানোর জন্য সমান অর্থহানি ঘটবে এমনটা বলেছেন। কিন্তু দণ্ডদানের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান দিয়েছেন।[১১১] আগমহীন ভোগকারী তস্কর বলে বিবেচিত হবে।

স্মৃতিতে ও আখ্যানে প্রাপ্ত তথ্যের দ্বারা একথা বলা যায় যে আগমযুক্ত দীর্ঘকাল পিতৃপিতামহাদিক্রমে বিনা বাধায় যে ভোগ করা হয় সেই ভোগই প্রামাণিক বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু আখ্যানে এমন কতগুলি বিশেষ স্থানের উল্লেখ দেখা যায় যেক্ষেত্রে ব্যক্তি দীর্ঘদিন ভোগ করলেও তার সত্ত্ব উৎপন্ন হয়না। এমনকি যদি কেউ নিজেও তা প্রতিষ্ঠা করেন তবেও তার সত্ত্বাধিকার গ্রাহ্য হয় না। *পঞ্চতন্ত্রের* কাকোলূকীয়মের 'শশকপিঞ্জলকথা'য় বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠা করার পর দীঘি, কূপ, জলাশয় তথা দেবমন্দির এবং বৃক্ষাদি কেউ ভোগ করলে, কিন্তু পরে ত্যাগ করলে, ত্যাগের পর ঐ দ্রব্যে প্রতিষ্ঠাকারীর আর কোনো অধিকার থাকে না।[১১২] স্মৃতিতেও, কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্ত্রনির্দিষ্ট সময়কাল অবধিও বিনা বাধায় ভোগ করলেও তাতে ভোগকারীর স্বত্ব উৎপন্ন হয় না সে বিষয়ে স্মৃতিতে স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্মৃতিতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মোটামুটিভাবে বলা যায় – বন্ধকী দ্রব্য বা আধি, গ্রামাদি সীমা, নিক্ষেপ (অজ্ঞাত গচ্ছিত

[১১১] ত্রিষ্বপি আগমানুদ্ধরণে অর্থহানিঃ সমানৈব দণ্ডে তু বিশেষঃ ইতি তাৎপর্যার্থঃ। মিতা.,২.২৪

[১১২] পঞ্চ.,পৃ.৯৩

দ্রব্য), স্ত্রীধন, বালকের সম্পত্তি, উপনিধি (জ্ঞাত গচ্ছিত দ্রব্য), দাসী প্রভৃতি স্ত্রীলোক, রাজার ধন এবং শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ধন এই গুলি বহুকাল ভোগ করলেও তাতে দ্রব্যস্বামীর স্বত্ব নষ্ট হয় না। অর্থাৎ এগুলির বাজেয়াপ্ত করা যায় না। *মনুসংহিতার* প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লূকভট্ট এবিষয়ে একটি বিধির উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, প্রীতিপূর্বক যদি কাউকে কোনো কিছু ভোগ করতে দেওয়া হয় তাতে দ্রব্যস্বামীর স্বত্ব কখনই নষ্ট হয় না। দ্রব্যস্বামী যখন চাইবে তখনই ভোগকারীকে ঐ দ্রব্যটি প্রত্যর্পণ করতে হবে।[১১৩]

৭.দিব্য প্রমাণ প্রসঙ্গ

সংস্কৃত আখ্যান-উপাখ্যান গুলিতেও অনেক ক্ষেত্রে কোনো বিষয় প্রমাণ করার জন্য দৈবের উপরে ভরসার প্রবণতা দেখা যায়। কোথাও দেবতার নামে শপথ করে নিজের বক্তব্যের প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায় আবার কোথাও অপরাধের শাস্তি দৈব দ্বারা হবে এরূপ নিশ্চিত বিশ্বাস দেখা যায়। স্মৃতিতে যেমন বিচারকার্যে মানুষ প্রমাণের পাশাপাশি দিব্য প্রমাণের গুরুত্বও আলোচিত হয়েছে, আখ্যানগুলিতেও নির্ণয়দানে এই প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত হয়েছে।

পঞ্চতন্ত্রের মিত্রভেদ-এর 'ধর্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধি' কথায় ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধির মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হলে তারা বিচারালয়ের শরণাপন্ন হয়। সেখানে ন্যায়াধীশ তাদের শপথ গ্রহণ করতে আদেশ দেন। এর দ্বারা নির্ণয়দানে দিব্য প্রমাণের গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। আলোচ্য আখ্যানটিতে দিব্যপ্রমাণ কখন প্রয়োগ করা হবে সেবিষয়েও দিক্ নির্দেশ করা হয়েছে। ন্যায়াধীশ শপথ গ্রহণ করার আদেশ দিলেও পাপবুদ্ধি শপথ গ্রহণে অস্বীকার করেছে, কারণ এই বিবাদের নিষ্পত্তি তার মতে সাক্ষীদ্বারা সম্ভব। সে ন্যায়াধীশকে জানিয়েছে যে, প্রমাণগুলির মধ্যে সর্বপ্রথমে লেখ্যপত্র তারপর সাক্ষীর অন্বেষণ করা হয় এগুলি না থাকলে তবেই দিব্য শপথ দ্বারা বিবাদের নিষ্পত্তি করা উচিত।[১১৪] মানুষ প্রমাণ দ্বারা বিবাদের মীমাংসা করা সম্ভব না হলে, দিব্য প্রমাণের

---

[১১৩] প্রীত্যা অনেন ভুজ্যমানাঃ কদাচিদপি স্বামিনো ন নশ্যন্তি। মন্বর্থ.,৮.১৪৬

[১১৪] পঞ্চ.,পৃ.২৮২

প্রয়োগ করে বিবাদের নিষ্পত্তি করা হবে। দিব্যপ্রমাণ প্রয়োগে ব্যক্তি অসত্য ভাষণের পরিণাম বিষয়ে ভয়ভীত হয়েই সত্যভাষণ করেন। যেমনভাবে বিবাদ নির্ণয়ে সাক্ষীদের বিশ্বাস করা হয় দিব্য প্রমাণের উপরেও সম্পূর্ণ আস্থা রাখা যায়। তবে, মানুষ প্রমাণের প্রামাণ্য দিব্যপ্রমাণ অপেক্ষা বেশি একথাও স্মৃতিতে বলা হয়েছে। কাত্যায়ন বলেন যদি মানুষ প্রমাণ একদেশে ব্যাপ্তও হয় তথাপিও তাকেই গ্রহণ করতে হবে। দিব্য প্রমাণ যদি সম্পূর্ণ অংশেও থাকে তাহলেও তা গ্রাহ্য হবে না।[১১৫] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য *মিতাক্ষরাকার*ও কাত্যায়নের মতটিরই সমর্থন করেছেন। তিনিও, মানুষ প্রমাণ ও দিব্য প্রমাণের মধ্যে কোনটি নির্বাচন করা হবে এমন সংশয়ে মানুষ প্রমাণকেই গ্রহণ করতে বলেছেন। যদি দিব্য প্রমাণ দ্বারা সাধ্য বস্তুর সম্পূর্ণই সিদ্ধ হয়ে যায় এবং মানুষ প্রমাণ দ্বারা সাধ্যের আংশিকাংশ হয় তবেও মানুষ প্রমাণই গ্রহণীয় হবে।

অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত উভয়ের পরস্পরের সম্মতি থাকলে উভয়ের একজন দিব্য গ্রহণ করবে। অপরজন শারীরিক দণ্ড বা অর্থদণ্ড অঙ্গীকার করবে। অর্থাৎ আলোচ্য আখ্যানটিতে কোন প্রমাণ কখন প্রয়োগ করা উচিত তার যে ক্রমটি উল্লিখিত হয়েছে, তা স্মৃতিসম্মত এমনটা বলা যায়। আবার সাক্ষী উপস্থিত এরূপ জানার পর ন্যায়ালয়ে ধর্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধিকে শপথ না করানোকেও ন্যায়সঙ্গত বলা চলে।

দশকুমারচরিত-এর উপহারবর্মাচরিত-এ উপহারবর্মা অগ্নিকে সাক্ষ্য করে বিকটবর্মাকে শপথগ্রহণ করতে বলেছেন- যা থেকে দিব্যপ্রমাণরূপে অগ্নির প্রচলনের কথা জানা যায়।[১১৬] *শুকসপ্ততিকথার* অষ্টাদশীকথা থেকে শস্যাদি দ্বারা প্রমাণ প্রসঙ্গটি জানা যায়।[১১৭] স্মৃতিতেও দিব্যরূপে অগ্নির প্রসঙ্গে শস্যবিশেষাদির প্রয়োগ দেখা যায়। অগ্নি দিব্যটি আচরণের যে পদ্ধতি স্মৃতিতে উল্লিখিত হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, ঐ ব্যক্তি যথাবিধি অগ্নিকে ধারণপূর্বক নির্দিষ্ট দুরত্ব অতিক্রম করার পর তার হাতে ধান ঘষে দেখা হবে যে তার হাত দগ্ধ হয়েছে কি না। যদি দগ্ধ না

---

[১১৫] যদ্যেকদেশব্যাপ্তাপি ক্রিয়া বিদ্যতে মানুষী।
সা গ্রাহ্যা ন তু পূর্ণাপি দৈবিকী বদতাং নৃণাম্।। কাত্যা.,২১৯

[১১৬] দশ.,পৃ.২৪৮-২৪৯

[১১৭] শুক.,পৃ.৯৮

হয় তবে জানতে হবে দিব্যকারী ব্যক্তি শুদ্ধ অন্যথায় সে অশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। নারদও বলেছেন, যখন দেখা যাবে দিব্যকারী ঐ ব্যক্তির করদুটি দগ্ধ হয়নি ধানগুলিকে তখন সাতবার ঘষে যদি দগ্ধ না হতে দেখা যায় তবে ন্যায়ালয়ে তাকে সভ্যগণ শুদ্ধ নির্ধারণ করে মুক্ত করবেন। কিন্তু দগ্ধ হলে দণ্ড দেবেন।[১১৮] *হিতোপদেশের* মিত্রলাভে তৃতীয়কথায় একটি দুষ্ট বিড়ালকে মাটি ছুয়ে নিজের সততার শপথ করতে দেখা যায়।[১১৯]

৮.বিচারব্যবস্থায় শপথের গুরুত্ব

আখ্যানগুলিতে দেখা যায়, কোথাও ধর্মের নামে শপথ করিয়ে সত্যকথা বলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আবার কোথাও অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো পবিত্র, দৈবসম্পর্কিত দ্রব্যাদি স্পর্শ করে নিজেই শপথ করেছে এবং নিজের নিরপরাধীতা প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছে। শপথ করানো হোক বা নিজে করা হোক উভয়ক্ষেত্রেই এইরূপ ধরে নেওয়া হত যে, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দুষ্ট, অসত্যবাদী হন তবে ঐ পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করে বা যার নামে শপথ করে অসত্য কথন করা হয়েছে তার দ্বারা ঐ দুষ্ট ব্যক্তি নিশ্চিত শাস্তি পাবেন। যেমন *হিতোপদেশের* সুহৃদভেদের পঞ্চম কথায় নাপিতের স্ত্রী নিজের সতীত্বের প্রমাণ করতে গিয়ে দেবতার নামে শপথ করে বলেছে যে সে যদি সতী হয় তবে তার নাসিকা অক্ষত থাকবে, না হলে তা ছিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হবে।[১২০] *শুকসপ্ততিকথার* একটি আখ্যানেও দেবতার নামে শপথ করে নিজের সততার প্রমাণ প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে।[১২১]

---

[১১৮] যথা তু ন বিভাব্যেত দগ্ধাবিতি কতৌ করৌ তদা।

...

মোচ্যঃ শুদ্ধঃ স সংস্কৃত্য দগ্ধো দণ্ড্যো যথাক্রমম্।। নারদ.,৪.৩০২-৩০৩

[১১৯] হিতো.,পৃ.৭২

[১২০] তদেব, পৃ.৭৬

[১২১] শুক.,পৃ.৮৯

অসত্যকথন, দুষ্টাচার করলে তার ফলাফল যে সবসময় সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যাবে এমন নয়। দুষ্ট ব্যক্তির উপরে দৈবের কোপ কিছু বিলম্বেও আসতে পারে। *হিতোপদেশের* মিত্রলাভে বলা হয়েছে, খুব সাংঘাতিক পাপের ফল এ জীবনেই তিন বৎসর, তিন মাস, তিন পক্ষ অথবা তিন দিনের মধ্যে পেয়ে থাকে।[১২২] কাল বিলম্বে হলেও দুষ্টকার্যের ফলভোগের বিষয়টি স্মৃতিতেও মেলে। কোশনামক দিব্যপ্রমাণের আলোচনায় এরূপ আলোচনা দেখা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, কোশ দিব্যের আচরণকারী ব্যক্তি 'এই কাজ আমি করিনি' – এরূপ বলে দেবতার অভিমুখ হয়ে সেই জল পান করার পর দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে যদি মারাত্মক রোগ, অগ্নিসংযোগ, আত্মীয়ের মরণ, দৈবকৃত বা রাজকৃত আতঙ্ক না ঘটে তবে দিব্যকারী ব্যক্তিকে নিঃসংশয়ে শুদ্ধ বলে জানতে হবে এবং এর অন্যথায় তাকে অশুদ্ধ বলা হবে (যাজ্ঞ.২.২১২)।

যে ব্যক্তি দিব্যপ্রমাণে দুষ্ট বলে বিবেচিত হত তাকে দৈব প্রমাণকালেই দণ্ড পেতে হত। কিংবা মিথ্যাবচনের জন্য রাজদণ্ড পেতে হত। কোশপান কিংবা জল দিব্যের আচরণকালে ব্যক্তির মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল। জীবিত থাকলে তবেই তাকে শুদ্ধ বলে মানা হত, মৃত্যু হলে সেটি তার মিথ্যাবাদীতার দণ্ড বলে বিবেচিত হত। শপথ করে মিথ্যাচারণে দণ্ডে এই ভয় আখ্যানগুলিতেও ধরা পড়েছে। *সিংহাসদ্বাত্রিংশিকার* প্রারম্ভিক কাহিনীতে দেখা যায় রাজা ভর্তৃহরি দেবতার আশীর্বাদ ধন্য একটি ফল রানী অনঙ্গসেনাকে দিয়েছেন। কিন্তু অনঙ্গসেনা তা তার প্রিয়পাত্র এক কিঙ্করকে দান করেছে। পরে রাজা ফলটি অন্বেষণ করলে, রানীকে ফলের সত্যতা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমে রানী সত্য গোপন করলেও পরে যখন রাজা তাকে শপথ গ্রহণপূর্বক ফলটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন তখন তিনি প্রকৃত কথা ব্যক্ত করেছেন।[১২৩] শপথের পরক্ষণেই রানীর সত্যকথন মিথ্যা শপথের দণ্ডের ভয়কেই প্রকাশ করেছে। দণ্ডের ভয়েই রানী সম্ভবতঃ সত্যঘটনা রাজাকে জানিয়েছেন।

---

[১২২] তদেব, পৃ.৮৭

[১২৩] সিংহাসন.,পৃ.৫

*দশকুমারচরিতে*র উপহারবর্মাচরিতে বিকটবর্মাকে উদ্দেশ্য করে উপহারবর্মা অগ্নিকে সাক্ষ্য করে শপথ করতে বলেছেন। তার সকল গোপন পরিকল্পনা না জানালে বা মিথ্যাভাষণ করলে অগ্নিদেবতার প্রভাবে বিকটবর্মার কার্যসিদ্ধি ঘঠবে না এরূপ সতর্কবার্তাও দিয়েছেন।[১২৪] এগুলির দ্বারা যেমন দিব্যপ্রমাণের গুরুত্ব বোঝা যায় তেমনি দিব্যপ্রমাণ আচরণে মিথ্যাচারণ করলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়-এরূপ সত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত *কথাসরিৎসাগরের* রত্নপ্রভা লম্বকের অষ্টম তরঙ্গের 'পরিত্যাগসেন ও তার দুই পুত্রের কাহিনি'তেও পাওয়া যায়। সেখানে দেবী দুর্গাপ্রদত্ত খড়্গটির প্রতি যথানুরূপ আচরণ না করার জন্য ইন্দীবরসেন দেবীর রোষে অচেতন হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছেন।[১২৫] দৈবের প্রভাবেই তার এমন অবস্থা হয়েছে। স্মৃতিতে কোশ দিব্যের যে প্রয়োগবিধি আলোচিত হয়েছে সেখানেও, দুর্গা, আদিত্যাদি উগ্র দেবতার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। এই উগ্র দেবতাগণের দৈব প্রভাবেই দুষ্ট, অশুদ্ধ দিব্যকারী উপরে কিংবা তার আত্মীয়ের উপরে সংকট নেমে আসে। এইভাবে স্মৃতিতে ও আখ্যানে বিভিন্ন প্রকার দিব্য ও তার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

[১২৪] দশ.,পৃ.৪৮-৪৯

[১২৫] কথা.,পৃ.১৯২-১৯৪

চতুর্থ অধ্যায়

ধনমূলক ব্যবহারবিধি ও আখ্যানসাহিত্যে তার প্রয়োগ প্রসঙ্গ

চতুর্থ অধ্যায়

ধনমূলক ব্যবহারবিধি ও আখ্যানসাহিত্যে তার প্রয়োগ প্রসঙ্গ

১.ঋণাদানের স্বরূপ

স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত বিবাদপদগুলির মধ্যে সর্ব প্রথম ঋণাদান নামক বিবাদপদটি আলোচিত হয়েছে। ঋণাদান শব্দটিতে দুটি শব্দ আছে, ঋণ ও আদান অথবা ঋণ ও অদান। ঋণ দান করে তা আদান বা আদায় করার উপায় যেমন ঋণাদান প্রকরণে আলোচিত হয়েছে তেমনি ঋণের অর্থ অধমর্ণ প্রদান না করলে তার প্রাপ্য দণ্ড বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। নারদ ঋণাদান বিবাদপদটির আলোচনার প্রারম্ভেই ঋণাদান বলতে কী বোঝায় তা উল্লেখ করেছেন- যার দ্বারা যেখানে যেভাবে ঋণ দেয়, অদেয়ে এবং ঋণ গ্রহণের ধর্ম সকল উক্ত হয় তাকেই ঋণাদান বলে।[১] *মিতাক্ষরা*কারও নারদকে অনুসরণ করে কি প্রকার ঋণ শোধ করা উচিত, কোন ঋণ শোধ করার যোগ্য নয়, কে ঋণদানের অধিকারী, কোন সময়ে ঋণ শোধ করতে হবে, কিভাবে ঋণ শোধ করতে হবে এই পাঁচটি নিয়ম অধমর্ণের জন্য বিহিত করেছেন। উত্তমর্ণের জন্য দুটি বিধি নির্দিষ্ট কার হয়েছে- দানবিধি ও আদানবিধি। ঋণ আদায়ের বিষয়ে স্মৃতিকারদের মধ্যে মনুর মনোভাব সর্বাপেক্ষা কঠোর বলে প্রতিভাত হয়। ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ সদুপদেশ প্রভৃতির মাধ্যমে, ব্যবহার বা মামলার মাধ্যমে, ছলনার আশ্রয় নিয়ে কৌশল অবলম্বন করে, আচরণ অর্থাৎ অধমর্ণের স্ত্রী- পুত্রকে ধরে বা তার পথ অবরোধ করে, বলপ্রয়োগ দ্বারা অর্থাৎ যে কোনো উপায় অবলম্বন করে উত্তমর্ণ অধমর্ণের কাছ থেকে তার প্রাপ্য অর্থ আদায় করবে।[২]

---

[১] ঋণং দেয়মদেয়ঞ্চ যেন যত্র যথা চ যত্ ।
দানগ্রহণধর্মাভ্যামৃণাদানমিতি স্মৃতম্।। নারদ,৯.১.১
দ্র. মিতা., ২.৩১

[২] ধর্মেণ ব্যবহারেণ ছলেনাচরিতেন চ।
প্রযুক্তং সাধয়েদর্থং পঞ্চমেন বলেন চ।। মনু.,৮.৪৯

ঋণ দুই প্রকার হতে পারে- সবন্ধক ঋণ ও অবন্ধক ঋণ। যেখানে ঋণ গ্রহণের সময় বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কোনো মূল্যবান দ্রব্য বন্ধকরূপে স্থাপন করা হয় তা হল সবন্ধক ঋণ। যে ঋণ গ্রহণের সময় বন্ধক বা আধি রাখা হয় না তাকে অবন্ধক ঋণ বলা হয়। সবন্ধক ঋণরে ক্ষেত্রে প্রতি মাস শতকরা আশি ভাগের একভাগ বৃদ্ধি রূপে গণ্য হবে। অবন্ধক ঋণে ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকে শতভাগের দুইভাগ, ক্ষত্রিয়কে তিনভাগ, বৈশ্যকে চারভাগ ও শূদ্রকে পাঁচভাগ সুদ দিতে হবে।[৩]

ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিভূ বা জামিনদার একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। *মনুসংহিতায়* দর্শনপ্রতিভূ, দানপ্রতিভূ ও প্রত্যয়প্রতিভূ – এই তিন প্রকার প্রতিভূর উল্লেখ পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি যার পক্ষে দর্শনপ্রতিভূ হবেন, তিনি টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার সময় উপস্থিত হলে অধমর্ণকে উত্তমর্ণের কাছে যথা সময়ে উপস্থিত করিয়ে দেওয়ার জন্য উত্তমর্ণের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকেন। যদি তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধমর্ণকে দিয়ে উত্তমর্ণের টাকা ফেরত দেওয়াতে অসমর্থ হন তবে তিনি নিজে উত্তমর্ণের প্রাপ্য সমস্ত ধন পরিশোধ করবেন। যদি তিনি মারা যান তবে তার পুত্রকে কিংবা দায়াদ্ গণকে ঋণের অর্থ প্রদান করতে হবে না। একই নিয়ম প্রত্যয়প্রতিভূর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু যদি কেউ দানপ্রতিভূ বা মালজামিন হয়ে মারা যান তবে পুত্রাদি দায়াদ্ গণ তা পরিশোধ করতে বাধ্য। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে – দর্শনপ্রতিভূ এবং প্রত্যয়প্রতিভূ যদি অধমর্ণের কাছ থেকে কোনো ধন নিয়ে তা না দিয়েই অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের যোগ্য কোনো ধন প্রদান করার পূর্বেই মারা যায় তবে উত্তমর্ণ কীভাবে তার প্রাপ্য অর্থ পাবেন ? কারণ তাদের পুত্ররা তা দিতে বাধ্য থাকবে না – এমনটাই স্মৃতির বিধান। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, এই দুই প্রতিভূর ক্ষেত্রে যদি পর্যাপ্ত ধন অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ প্রতিভূকে দেওয়া হয় তবেই তার পুত্রগণ উত্তমর্ণকে তার প্রাপ্য অর্থ দিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু যদি তাকে অল্প পরিমাণ ধন দেওয়া থাকে অথচ যা পরিশোধ করতে হবে তার পরিমাণ অনেক বেশি

---

[৩] অশীতিভাগো বৃদ্ধিঃ স্যান্মাসি সবন্ধকে।

বর্ণক্রমাচ্ছতং দ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চকমন্যথা।। যাজ্ঞ.,২.৩৭

দ্র. দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কং পঞ্চকং শতং বর্ণানুক্রমেণ..। বি.ধ.সূ.,৬.২

তবে প্রতিভূর পুত্রগণকে উত্তমর্ণের প্রাপ্য ধন দিতে বাধ্য করা চলবে না।[৪] উত্তমর্ণ যাতে তার প্রাপ্য ধন ফেরত পায় শাস্ত্রে সব সময় সেই প্রচেষ্টায় করা হয়েছে। মনু বলেছেন যে, যদি পরিবারের কোনো ধন না থাকে তবে পরিবারের কোনো ব্যক্তি ঋণদাতার সেবা করে ঋণ পরিশোধ করবে। ঋণী ঋণদাতার চেয়ে উচুজাতির হলে সে কিস্তিতে ধীরে ধীরে ঋণ শোধ করতে পারবে।[৫] ব্রাহ্মণের পক্ষে কর্ম দ্বারা ঋণ পরিশোধ নিষিদ্ধ।

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট যে, ঋণের লেন-দেন বিষয়ে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ যুক্তিযুক্ত নিয়ম নির্ধারণ করেছেন যাতে ঋণ আদায় করতে ঋণদাতার সুবিধা হয় ও সামাজিক ব্যবস্থাটিও সুরক্ষিত থাকে।

১.১.আখ্যানে ঋণাদান

শুকসপ্ততিকথার পঞ্চপঞ্চাসত্তম কথায় ঋণ বিষয়ক বেশ কিছু তথ্যাদি মেলে যা থেকে আলোচ্য বিবাদপদটির সম্পর্কে বেশকিছু নিয়মবিধি অনুমান করা যায়। আখ্যানটিতে একজন ব্রাহ্মণ দূরে কোনো ভিন্ন গ্রামে ঋণের অর্থ আদায়ে গমন করেছিলেন। ফেরার সময় চোরেদের হাতে ধরা পড়েন। বাঁচার জন্য তিনি নিজেকে নয়, গলগ্রহ নামক এক যক্ষকে ঋণদাতা রূপে পরিচয় দিয়েছেন এবং নিজেকে যক্ষনিযুক্ত কর্মী বলে পরিচয় দিয়েছেন। তার কাজ যক্ষের দেওয়া ঋণ ও বৃদ্ধি আদায় করে যক্ষকে নিবেদন করা।[৬] আলোচ্য কাহিনিতে যে যে বিষয়গুলি আলোকপাত করা প্রয়োজন তা হল – প্রথমতঃ- এই কাহিনি থেকে জানা যায় ঋণদাতা যে কোনো বর্ণেরই হতে পারেন। অর্থাৎ ঋণাদানমূলক অর্থাগমের এই জীবিকায় সকল বর্ণেরই অধিকার ছিল। এখানে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ঋণদাতারূপে দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ- ঋণদাতা ভিন্ন গ্রাম – দূরবর্তী স্থানেও ঋণ প্রদান করতে পারতেন। তৃতীয়তঃ- একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বৃদ্ধির অর্থ ঋণদাতা

---

[৪] মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *মনুসংহিতা,* পৃ..৭৯০

[৫] কর্মণাপি সমং কুর্যাদ্ধনিকায়াধমর্ণিকঃ।
সমোঽপকৃষ্টজাতিস্তু দদ্যাচ্ছ্রেয়াংস্তু তচ্ছনৈঃ।। মনু.,৮.১৭৭

[৬] রমাকান্ত ত্রিপাঠী, *শুকসপ্ততিকথা,*পৃ.২২৩

ঋণগ্রহণকারীর নিকট হতে প্রাপ্ত হতেন। যা থেকে বোঝা যায় নির্দিষ্ট দিনে কিংবা সময়ে ঋণের বৃদ্ধি (সুদ) ধার্য হত। এই সুদ সম্ভবত পূর্বে ঋণ প্রদানকালেই দাতা ও গ্রহীতা কর্তৃক নির্দিষ্ট করা হত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্মৃতিকারগণ ঋণাদান প্রসঙ্গে নানাপ্রকার বৃদ্ধি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। লাভের আশাতেই ঋণ দেওয়া হয়। ঋণদানের ব্যবসায় এই লাভকে কুসীদ বলা হয়। এই কুসীদের দ্বারাই ঋণদাতা জীবিকা নির্বাহ করেন। এই কুসীদের নাম হল বৃদ্ধি বা সুদ। উত্তমর্ণ কিছু ধার দিলে তার উপর শতকরা কিছু ভাগ অতিরিক্ত তাকে দিতে হয়। একেই বৃদ্ধি বলা হয়। ঋণ দেওয়ার সময় কুসীদ নির্ণয়ে উত্তমর্ণকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হত। কুসীদ কোনো অবস্থাতেই মূলধনের দ্বিগুণ থেকে বেশি হতে পারে না। যদি অধমর্ণ মূলধনের দ্বিগুণ সুদ মিটিয়ে দিয়ে থাকে এবং রাজা বা ন্যায়াধীশের গোচরে বিষয়টি আসে তবে অধমর্ণকে দিয়ে তিনি কেবল মূলধনই ফেরৎ দেওয়াবেন।

শাস্ত্রে চার প্রকার বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। তা হল কায়িকাবৃদ্ধি, কালিকাবৃদ্ধি, কারিতাবৃদ্ধি ও চক্রবৃদ্ধি।[৭] দেশ-কাল, কার্য এবং অবস্থার ভিত্তিতে যে কম বা বেশি সুদ অধমর্ণ নিজেই উত্তমর্ণের সঙ্গে কথা বলে স্থির করে নেয় তাকে কারিতা বৃদ্ধি বলে। সময়কে ভিত্তি করে যে বৃদ্ধি হয় তা হল কালিকাবৃদ্ধি। মাসিক বা বার্ষিক সুদ হল কালিকা। শারীরিক শ্রম দ্বারা সুদ পরিশোধ করা হলে তা হল কায়িকাবৃদ্ধি। বৃদ্ধির বৃদ্ধি হল চক্রবৃদ্ধি। মূলধনের উপর সুদ এবং সেই সুদের উপর সুদকে মিশ্রিত করে সুদের যে গণনা হয় তা হল চক্রবৃদ্ধি।[৮] কাত্যায়ন শিখাবৃদ্ধি রূপ অপর একটি বৃদ্ধি বা সুদের কথা উল্লেখ করেছেন, যা প্রতিদিন গ্রহণ করা হয়।[৯] বন্ধকী বস্তু ঋণদাতা কর্তৃক উপভোগ করা হলে তার আর অন্য সুদ দিতে হত না। একে উপভোগ বৃদ্ধি বলে। শাসন দ্বারা অনুমোদিত দরের অধিক সুদ নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে কীরূপ সুদ

---

[৭] কায়িকা কালিকা চৈব কারিতা চ তথাপরা।
চক্রবৃদ্ধিশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্ বৃদ্ধিদৃষ্টা চতুর্বিধা।। নারদ.,৪.১.১০২

[৮] বৃদ্ধেরপি পুনর্বৃদ্ধিশ্চ চক্রবৃদ্ধিস্তদুদাহৃতা।। তদেব,৪.১.১০৪

[৯] প্রতিকালং দদাত্যেব শিখাবৃদ্ধিস্তু সা স্মৃতা। কাত্যা.,৪৯৯

নিতে হবে তা ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উক্ত হয়েছে। প্রায় সকলেই যেখানে স্ত্রী-পশুকে বন্ধক রাখা হয়েছে তার শাবকটিকে সুদরূপে ধার্য করেছেন। চতুর্থতঃ- যদি কোনো ব্যক্তি ঋণদাতাকর্তৃক ঋণের অর্থ কিংবা বৃদ্ধির অর্থ আদায়ের জন্য নিযুক্ত হন তবে তাকে আদায়কৃত সম্পূর্ণ অর্থ সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে ঋণদাতাকে প্রদান করতে হত। ঐ অর্থে তার কোনো অধিকার থাকতো না।

ঋণদান যেমন ঋণদাতার অর্থাগমের পথটি প্রশস্ত করে তেমনি অর্থকষ্টে জর্জরিত মানুষের প্রয়োজনও সিদ্ধ করে। ঋণকৃত অর্থের দ্বারাই তিনি অর্থের কারণে বাধাপ্রাপ্ত তার কাজটি সম্পাদন করতে সমর্থ হন। *হিতোপদেশের* মিত্রলাভে যে দেশে ঋণদাতা নেই এমন স্থানকে বাসের অযোগ্য বলা হয়েছে।[১০] যেখানে অর্থের প্রয়োজন হলেই ঋণ পাওয়া যায় না সেই স্থানে যে কোনো কার্যই অর্থাভাবে বিঘ্নিত হয়। এমন স্থান মানুষের জীবনধারণের জন্য অনুপযুক্ত।

যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট হারে সুদের অর্থ প্রদান করা ঋণগ্রহীতার কর্তব্য। যথাবিধি ঋণ পরিশোধ না করলে তাকে শাস্তিও পেতে হত। দণ্ডব্যবস্থা কিংবা সুদের হার সম্পর্কে আখ্যানে তেমন আলোচনা না মিললেও, ঋণপরিশোধ করা ঋণগ্রহীতার আবশ্যক কর্ম তা উল্লেখ করা হয়েছে। *হিতোপদেশের* মিত্রলাভে একটি শ্লোকের মাধ্যমে এবিষেয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।[১১] সেখানে বলা হয়েছে, যিনি সঠিক সময়ে ঋণপরিশোধ করেন তিনি সজ্জন ব্যক্তি বলে বিবেচিত হন। অর্থাৎ যথাসময়ে ঋণপরিশোধ না করা অসৎ কর্ম। যিনি এমনটা করেন তিনি দুর্জন এবং যিনি যথাসময়ে ঋণপরিশোধ করেন তিনিই সজ্জন ব্যক্তি বলে বিবেচিত হন।

স্মৃতিকারগণ নানা বিধানের মাধ্যমে উত্তমর্ণের ঋণরূপে প্রদত্ত অর্থ ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। স্মৃতিতে উল্লিখিত ঋণাদান বিধিঅনুযায়ী, অধমর্ণ যতটা সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করবে বলে অঙ্গীকার করেছে যদি সেই সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করতে পারে তবে, উত্তমর্ণ ধর্মানুসারে তা আদায় করবে। এ ব্যাপারে রাজা বাধা দেবেন না এবং দেয়

---

[১০] সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী,*হিতোপদেশ*,পৃ.৯৯

[১১] তদেব,পৃ.৭৯

অর্থবিষয়ে অধমর্ণ নালিশ করলে তাকে দণ্ড দেবেন এবং তাকে দিয়ে দেয় অর্থ উত্তমর্ণকে প্রদান করাবেন।

ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে স্মৃতিতে বর্ণক্রম অনুসরণ করার নির্দেশ মেলে। সমান জাতীয় উত্তমর্ণ যদি সংখ্যায় অনেক হয় তাহলে ঋণ শোধ করতে হবে ক্রম অনুসারে। যার কাছ থেকে পূর্বে ঋণ নেওয়া হয়েছে তার টাকা পূর্বে শোধ করতে হবে। কিন্তু ভিন্নজাতীয় উত্তমর্ণ অনেক সংখ্যক হলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণক্রম অনুসারে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।[১২] সেক্ষেত্রে কে পূর্বে ঋণদান করেছে তার ঋণ পূর্বে পরিশোধের নিয়মটি প্রযুক্ত হবে না। রাজা কোন জাতির অধমর্ণের কাছ থেকে কী প্রকারে ঋণের অর্থ ফেরৎ দেওয়াবেন সেক্ষেত্রেও বর্ণব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। রাজা ব্রাহ্মণ অধমর্ণকে সুমিষ্ট বাক্যের দ্বারা বুঝিয়ে ঋণ শোধ করাবেন। দেশাচার অনুসরণ করে অন্যজাতীয় দুষ্ট ব্যক্তিদের পীড়ন করে ঋণ পরিশোধ করাবেন- এমন নির্দেশই স্মৃতিতে মেলে।[১৩] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, উত্তমর্ণ যদি নিজে ঋণ আদায় করতে না পারে, বিষয়টি যদি বিচারাধীন হয় এবং রাজা অধমর্ণকে দিয়ে উত্তমর্ণের প্রাপ্য ধন পরিশোধ করান তবে তার থেকে দণ্ডবাবদ কিছু অর্থ রাজারও প্রাপ্য ছিল। এই অর্থের অধিকার সকল স্মৃতিকারগণই রাজাকে দিয়েছেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, নারদ সকলেই রাজকোষে অর্থাগমের এই পথটি সুনিশ্চিত করেছেন। তবে স্মৃতিভেদে অর্থব্যবস্থার নিয়মটি ভিন্ন ভিন্ন।

একান্নবর্তী পরিবারে কুটুম্বভরণের জন্য ঋণ করে কোনো ব্যক্তি যদি মারা যান তবে তার সম্পদের ভাগীদার সকল ব্যক্তিরা ঐ ঋণ পরিশোধ করবেন।[১৪] যদি সিদ্ধ হয় যে ঋণ করা ধন সম্মিলিত পরিবারের জন্য খরচ করা হয়েছে তবে পরিবারের সদস্যগণ পৃথক হলেও সেই ঋণ

---

[১২] গৃহীতানুক্রমাদ্ দাপ্যো ধনিনামধর্ণিকঃ।

দত্ত্বা তু ব্রাহ্মণায়ৈব নৃপতেস্তদনন্তরম্।। যাজ্ঞ.,২.৪১

[১৩] রাজা তু স্বামিনে বিপ্রং সান্ত্বেনৈব প্রদাপয়েৎ। দেশাচারেণ চান্যাংস্তু দুষ্টান্ সংপীড্য দাপয়েৎ। মিতা.,২.৪০

[১৪] পিতরি প্রোষিতে প্রেতে ব্যসনাভিপ্লুতেঽপি বা।

পুত্রপৌত্রর্ণং দেয়ং নিহ্নবে সাক্ষিভাষিতম্।। যাজ্ঞ.,২.৫০

দ্র. সপুত্রস্য বাপ্যপুত্রস্য যো রিক্থগ্রাহী ঋণং দদ্যাৎ। বি.ধ.সূ.,৬.২৯

শোধ করতে তারা বাধ্য থাকবেন।[১৫] তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুত্র, পত্নী ঋণীব্যক্তির ঋণ শোধ করতে বাধ্য থাকবে না। তারা ঋণীব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেও কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে পিতৃকৃত বা পতিকৃত ঋণ পরিশোধের হাত থেকে শাস্ত্র তাদের নিষ্কৃতি দিয়েছে। মদ্যপান, স্ত্রীসম্ভোগ, দ্যূতক্রীড়ার জন্য পিতা যে ঋণ করে, রাজদণ্ডরূপে পিতৃপ্রদেয় অদত্তধন, কন্যাদানাদি শুল্কের অবশিষ্ট পিতৃপ্রদেয় অর্থ এবং বৃথাদানবশতঃ পিতৃকৃত ঋণ পুত্র পরিশোধ করবে না।[১৬] অর্থাৎ নিজ সুখসম্ভোগের জন্য কৃত পিতৃঋণের দায় পুত্রের উপর বর্তায় না। আবার যা কেবলই পিতার দায়িত্ব ভ্রাতার নয়, যেমন কন্যাদানাদি শুল্ক ইত্যাদি এবং ব্যক্তির দোষের শাস্তি তারই প্রাপ্য তাই রাজদণ্ডাদিরূপ অদত্তদণ্ড- এগুলি পুত্রের পরিশোধ করা কর্তব্য নয়। কুটুম্বপোষণের কারণ ছাড়া অন্য কারণে যদি স্বামী বা পিতা বা পুত্র ঋণ করে তবে পত্নী বা পুত্র বা মাতা তা শোধ করবে না। স্ত্রীর কৃত ঋণও স্বামী পরিশোধ করবে না। কিন্তু যে সকল জীবিকাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যুক্ত থাকে, যেখানে জীবিকানির্বাহ করার ক্ষেত্রে স্ত্রীগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে সেই সকল ক্ষেত্রে স্ত্রীকর্তৃক কৃত ঋণ স্বামী পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। যাজ্ঞবল্ক্য গোপালক, মদ্যব্যবসায়ী, নাট্যজীবি, রজক ও ব্যাধ এইসকল জীবিকার কথা বললেও *মিতাক্ষরা*কার আলোচ্য শ্লোকের টীকায় স্ত্রীর অধীন সকল জীবিকাকেই এই নিয়মের আওতাভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে অন্য যাদের যাদের জীবিকা স্ত্রীর অধীন তারাও স্ত্রীকৃত ঋণ শোধ করবে।[১৭]

*শুকসপ্ততিকথা*র ষষ্ঠ কথায় ঋণী ব্যক্তির পীড়ার কথাটি উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আখ্যানটিতে ঋণগ্রহণকে একটি ব্যধিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋণী ব্যক্তিকে ব্যধি

---

[১৫] গ্রহীতা যদি নষ্টঃ স্যাৎ কুটুম্বার্থং কৃতো ব্যয়ঃ।
দাতব্যং বান্ধবৈস্তৎ প্রবিভক্তৈরপি স্বতঃ।। মনু.,৮.১৬৬

[১৬] সুরাকামদ্যূতকৃতং দণ্ডশুল্কাবশিষ্টকম্।
বৃথাদানং তথৈবেহ পুত্রো দদ্যান্ন পৈত্রিকম্।। যাজ্ঞ.,৪.৪৭

[১৭] যস্মাদ্ বৃত্তিস্তদাশ্রয়া ইতি হেতুব্যপদেশাদ্ অন্যেঽপি যে যোষিদধীনাঃ তেঽপি যোষিৎকৃতম্ ঋণং দদ্যুরিতি গম্যতে। মিতা.,২.৪৮

জর্জরিত পীড়িত ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে।[১৮] কঠিন ব্যধির বীজ কারো শরীরে একবার নিহিত হলে তা যেমন সদা সর্বদা তার পীড়ার উদ্রেগ করে, ঋণী ব্যক্তির অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয় হয়। কারণ যথাসময়ে ঋণপরিশোধ করতে সমর্থ না হলে বৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং ঋণের বোঝা বেড়েই চলে। ঋণী ঋণের জালে আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে পড়েন। মারণ ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় সেও মুক্তির পথ খুঁজে পায় না। এছাড়াও, ঋণী ব্যক্তির মানসিক শান্তিও থাকে না। আলোচ্য আখ্যানটিতে এমন ব্যক্তির মানসিক অস্থিরতা সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়েছে। ঋণী ব্যক্তি অনিদ্রায় রোগে ভোগেন। তার কোনো মানসিক শান্তি থাকে না। তিনি নিজেকে সর্বদা শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত বলে ভাবেন। যে কোনো সময়ে ঋণদাতা অর্থ আদায়ে উপস্থিত হতে পারে এমন আশঙ্কাতেই সম্ভবত সর্বদা ভীত থাকেন।

২.বিক্রীয়াসম্প্রদান

বিবাদপদটির নামের দ্বারাই এর বিষয় সম্বন্ধে সহজেই অনুমান করা যায় – বিক্রীত দ্রব্যের অসম্প্রদানই হল এই বিবাদপদটির আলোচ্য বিষয়। তবে স্মৃতিশাস্ত্রে কেবল বিক্রীত দ্রব্যের অসম্প্রদানই নয় ক্রেতাকে যথা সময়ে বিক্রীতদ্রব্য প্রদান না করা , অন্যদ্রব্য কিংবা অযথাযথ দ্রব্য প্রদান করাকেও অপরাধরূপে গণ্য করা হয়েছে। এগুলি সবই বিক্রীয়াসম্প্রদান বিবাদপদের আওতাধীন করে তার দণ্ডবিধান করা হয়েছে। মনু ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত সকল বিবাদকে ক্রয়-বিক্রয়ানুশয় একটি বিবাদপদরূপে আলোচনা করলেও, নারদ ও যাজ্ঞবল্ক্য ক্রীত্বানুশয় ও বিক্রীয়াসম্প্রদান এই দুটি পৃথক বিবাদপদরূপে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য বিবাদপদটির স্বরূপ নির্ণয়প্রসঙ্গে নারদ বলেছেন – মূল্য নিয়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে, ক্রেতাকে যখন তা প্রদান না করা হয় তাকে বিক্রীয়াসম্প্রদাননামক বিবাদপদ বলা হয়।[১৯] সাধারণভাবে দ্রব্যসমূহ দুই প্রকার – স্থাবর

---

[১৮] শুক.,পৃ.৪২

[১৯] বিক্রীয় পণ্যং মূল্যেন ক্রেত্রে যন্ন প্রদীয়তে।

বিক্রীয়াসম্প্রদানং তদ্বিবাদপদমুচ্যতে।। নারদ., ৪.৮.১

ও জঙ্গম। যা চলনাত্মক গুণযুক্ত তা হল জঙ্গম। আর যা নিশ্চল তা হল স্থাবর। এই দুই প্রকার দ্রব্যই পণ্যপদবাচ্য। এবং বিক্রয়ের যোগ্য। ক্রেতা যে দ্রব্যটি মূল্যদ্বারা ক্রয় করে বিক্রেতা ঐ দ্রব্যটি যথাসময়ে ক্রেতাকে হস্তান্তর করবেন। কিন্তু তিনি যদি তা – না করেন তবে তিনি অপরাধী বলে বিবেচিত হন এবং যদি তার কাছে বিক্রীত দ্রব্যটি রেখে দেওয়ার সময় কোনোভাবে দ্রব্যটি নষ্ট হয় তবে এই ক্ষতি তার বলেই গণ্য হয় এবং ক্ষতিপূরণও তাকেই দিতে হবে।

বিক্রেতা যদি পণ্য বিক্রয় করার পর নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতাকে দ্রব্যটি ফেরৎ না দেন এবং দ্রব্যটি ভোগ করেন তবে, স্থাবর দ্রব্যাদি যেমন – ভোজন দ্রব্য, বস্ত্রাদির ক্ষেত্রে দ্রব্যের যে ক্ষয় হয় তাকে দ্রব্যের সাথে ফেরৎ দিতে হয়। এখানে দ্রব্যক্ষয় বলতে পণ্যদ্রব্যটি বিক্রেতা ভোগ করার ফলে যে ক্ষয় ঘটে তাকেই বুঝতে হবে। জঙ্গম অর্থাৎ চলনাত্মক পণ্যের ক্ষেত্রে যতদিন পর্যন্ত ক্রেতার পণ্যটি বিক্রেতা নিজের কাছে রেখেছে ততদিন যাবৎ তার কর্মের নিমিত্ত প্রাপ্ত মূল্য সমেত তাকে দ্রব্যটি ক্রেতাকে ফেরৎ দিতে হবে।[২০] বিষ্ণু এমন বিক্রেতাকে একশতপণ দণ্ড দেওয়ার কথা বলেছেন।[২১] তবে, বিক্রেতা দ্রব্যটি ক্রেতাকে দিতে চাইলেও ক্রেতা যদি তা গ্রহণ না করে এবং দ্রব্যটি রাজার দ্বারা বা দৈবের দ্বারা দ্রব্যটি বিনষ্ট হয় তবে ঐ ক্ষতি ক্রেতাকেই বহন করতে হবে, বিক্রেতা সেক্ষেত্রে তাকে ঐ দ্রব্য দেবে না। কিন্তু যদি ক্রেতা চাইলেও বিক্রেতা পণ্যটি ক্রেতাকে না দেয় এবং তারপর যদি রাজকৃত বা দৈবকৃত হানি ঘটে তবে সেই ক্ষতি বিক্রেতারই হবে। তাকে ক্রেতার দ্রব্যটি ফেরৎ দিতে হবে। কেবল যথাসময়ে বিক্রীত দ্রব্য প্রত্যর্পণই নয়, বিক্রয়কালে বিক্রেতা সম্পূর্ণরূপে সৎ থাকা উচিত- এমনটাই স্মৃতিতে বলা হয়েছে। ক্রেতাকে কোনোভাবে ঠকানো বিক্রেতার পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ। যাজ্ঞবল্ক্যও একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে যদি কেউ কোনো পণ্য একজনকে বিক্রয় করে তারপর অন্যব্যক্তিকে বিক্রয় করে অথবা দোষযুক্ত দ্রব্য দোষহীন বলে বিক্রয় করে তাহলে সেই বিক্রেতা পণ্য মূল্যের দ্বিগুণ অর্থ দণ্ডরূপে দেবে।[২২] নারদ অবশ্য এমন বিক্রেতার প্রতি বিশেষ কঠোর মনোভাব দেখিয়েছেন। তাঁর মতে,

---

[২০] মিতা.,২.২৫৪

[২১] রাজ্ঞা চ পণশতং দণ্ড্যঃ । বি.ধ.সূ.,৫.১২৮

[২২] অন্যহস্তে চ বিক্রীয় দুষ্টং বাঽদুষ্টবদ্ যদি।

এমন প্রতারক বিক্রেতা কেবল ক্রেতাকেই পণ্যমূল্যের দ্বিগুণ দেবে তা নয়। এমন কার্যের জন্যও রাজার দ্বারাও দণ্ডিত হবেন। ব্যবসায়ীরা যাতে অধিক লাভের আশায় ক্রেতাকে প্রতারণা না করতে পারে তাই এই দণ্ড ব্যবস্থা। এই সকল নিয়মগুলি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্যদ্রব্যটির মূল্য সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করেছে। কিন্তু যেক্ষেত্রে কেবল সমঝোতামাত্র হয়েছে সেক্ষেত্রে ক্রেতা – বিক্রেতার ক্ষেত্রে এই সকল নিয়মগুলি প্রযোজ্য হবে না।

২.১.সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে বিক্রীয়াসম্প্রদান প্রসঙ্গ

বিক্রীয়াসম্প্রদান বিবাদপদটির দৃষ্টান্ত আখ্যানগ্রন্থগুলিতেও মেলে। স্মৃতিতে ইহার দণ্ডবিধান ও আখ্যানগ্রন্থে তার উপস্থিতির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বিক্রয়জনিত এই অপরাধটি সমাজে প্রচলিত ছিল। *কথাসরিৎসাগর* গ্রন্থটির রত্নপ্রভা লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গের 'ভবশর্ম্মার কাহিনি' শীর্ষক আখ্যানটিতে ক্রেতাকে ছলনা করে অভীষ্ট বস্তু বিক্রয় না করে অন্য দ্রব্য বিক্রয় করা হয়েছে। মায়াবিদ্যায় পারদর্শী এক ব্রাহ্মণযুবতী পোষ্যউষ্ট্র ব্যবসায়ীর নিকট থেকে অভীষ্ট মূল্যের বিনিময়ে পোষ্য একটি বলদ বিক্রয় করার সময় ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। অভীষ্ট মূল্য নিয়েও তাকে দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়েই দ্রব্যটি বিক্রয় করেছে। যার ফল স্বরূপ ব্যবসায়ীটিকে পরবর্তীকালে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।[২৩] ব্যবসায়ীর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে বিক্রেতা ব্রাহ্মণযুবতী তাকে প্রতারণা করেছে যা স্মৃতির বিধান অনুসারে একটি দণ্ডনীয় অপরাধ।

কথাসরিৎসাগর গ্রন্থেরই উল্লিখিত লম্বকের নবম তরঙ্গের 'অর্থলোভ বণিক ও তার সুন্দরী ভার্যার কাহিনি'তেও একই রূপ দৃষ্টান্ত মেলে। যেখানে এক বিদেশী ব্যবসায়ীর ক্রেতার সহিত দুষ্ট ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। দূরদেশ থেকে আগত সুখধন নামক এক বণিক অশ্ব ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করার জন্য কাঞ্চী রাজ্যে আগমন করেন। মানপরা নামের এক বণিক পত্নী

বিক্রীণীতে দমস্তত্র মূল্যাৎ তু দ্বিগুণো ভবেৎ।। যাজ্ঞ.,২.২৫৭

দ্র.,নির্দোষং দর্শয়িত্বা তু সদোষং যঃ প্রযচ্ছতি।

সোঽপি তদ্দ্বিগুণং দাপ্যো বিনযং চৈব রাজনি।।নারদ.,৪.৮.৭৮

[২৩] হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস, *কথাসরিৎসাগর,* পৃ.২১৪

পঞ্চ সহস্র অশ্ব ও মনোরম বস্ত্রাদি ক্রয় করবার উদ্দেশ্যে ঐ বণিকের কাছে উপস্থিত হন এবং উপযুক্ত মূল্য দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু যথার্থ মূল্যের বিনিময়েও বণিক মানপরাকে দ্রব্যাদি বিক্রয় করতে অস্বীকার করেন, এমনকি মানপরাকে পণ্যগুলির জন্যও অনুচিত মূল্য দিতে বাধ্য করে তবেই অশ্বাদি পণ্যগুলি তাকে বিক্রয় করেছে।[২৪]

বণিকগণ লাভের নিমিত্তই ব্যবসা করেন, কিন্তু ক্রেতাকে ঠকিয়ে কিংবা অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবসা করা উচিত নয়। এখানে বণিকটি সকলের জন্য অশ্বাদির যে মূল্য ধার্য করেছিল মানপরা তা প্রদান করে অশ্বাদি ক্রয় করতে চাইলে সে মানপরার কাছে পূর্বনির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা ভিন্ন মূল্য দাবি করেন – যা অনুচিত। স্মৃতিতে বলা হয়েছে ব্যবসায়ীরা লাভের নিমিত্ত ব্যবসা করেন, এই লাভ কিছু কম বা বেশি হতে পারে। তাই তারা দেশ-কালানুসারে দ্রব্যমূল্য স্থির করেন, কিন্তু এই বিক্রয় কার্যে কোনোরূপ কুটিলতা বা কপটতা অবলম্বন করা উচিত নয়। বাণিজ্যে ক্ষেত্রে ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ।[২৫]

বিক্রেতা কর্তৃক প্রতারণার আর দৃষ্টান্ত *শুকসপ্ততিকথা* গ্রন্থটিতে মেলে। আলোচ্য গ্রন্থটির বত্রিশসংখ্যক আখ্যানেও একইরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। সেখানে বসবাসকারী এক শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ বাজারে গিয়ে গম ক্রয় করে। কিন্তু ক্রীত পণ্যটি বিপণিতেই ভুলে সে অন্যত্র চলে যায়। এই সুযোগে বিক্রেতা গমের পাত্রটি ধূলি দ্বারা পূর্ণ করে যথাস্থানে রেখে দেয় এবং শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ তা ফেরৎ নিতে আসলে তাকে গমের পরিবর্তে ঐ ধূলি পরিপূর্ণ পাত্রটি প্রদান করে।[২৬] আলোচ্য আখ্যানটির দুটি বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, বিক্রেতা সম্পূর্ণ দ্রব্যমূল্য নিয়েও ক্রেতাকে সেই পণ্যটি প্রত্যর্পণ না করে তাকে মূল্যহীন ধূলি প্রদান করেছেন। ক্রেতার সামান্য উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে তাকে যেভাবে ঠকিয়েছে তা অনুচিত। দ্বিতীয়তঃ, বিক্রেতা গমের

---

[২৪] তদেব,পৃ.২৭৪

[২৫] লাভার্থে বণিজাং সর্বপণ্যেষু ক্রয়বিক্রয়ঃ।

...

ন জিহ্মং চ প্রবর্তেত শ্রেয়ানেবং বণিকপথঃ।। নারদ, ৪.৮.১১-১২

[২৬] শুক.,পৃ.১৪৯

পাত্রটি শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূকে মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করেছে কিন্তু ঐ ক্রেতা তা গ্রহণ করেনি। তাই স্মৃতিতে উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে তার দ্রব্যের ক্ষতির দায় তারই। বিক্রেতার এক্ষেত্রে কোনো দায় নেই। তবে এক্ষেত্রে একথাও উল্লেখ করা প্রযোজন যে, ক্রেতার দ্রব্যটি রাজা কিংবা দৈবের কারণে নষ্ট হলে তবেই বিক্রেতা দায়মুক্ত হন। কিন্তু এক্ষেত্রে রাজার কারণে কিংবা দৈবের কারণে শ্রেষ্ঠীপুত্রবধূর দ্রব্যহানি ঘটেনি। বিক্রেতা তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঠকিয়েছে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, পণ্য কিনে তা উদাসীনতাবশতঃ ফেলে আসা ক্রেতার উচিত নয়। তাই এই ক্ষতি তাকেই স্বীকার করতে হবে। এই কারণেই শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ গৃহে এসে গমের পরিবর্তে ধূলি দেখে কেবল আফসোস করেছে।

যদি বিক্রয়ের পূর্বে বিক্রেতা বায়না স্বরূপ ক্রেতার কাছ থেকে কোনো মূল্য নিয়ে থাকে এবং দ্রব্যটি অন্য কাউকে বিক্রয় করে দেয় কিংবা অন্য কোনো কারণে ক্রেতাকে দ্রব্যটি প্রত্যর্পণ না করতে পারে তবে তাকে ঐ বায়না মূল্যের দ্বিগুণ ধন ক্রেতাকে দিতে হবে। কিন্তু ক্রেতা যদি বায়না করার পর দীর্ঘদিন তা নিতে না আসে তবে ক্রেতা বায়নামূল্য ও মূলদ্রব্য দুটিই হারায়। বায়না সম্বন্ধিয় এই নিয়মের প্রতিফলন আখ্যান গ্রন্থে দেখা যায়। সেখানেও কাহিনির মাধ্যমে বায়না নিলে বিক্রেতার কি করা উচিত তার দিক্ নির্দেশ পাওয়া যায়। *শুকসপ্ততিকথার* পঁয়ত্রিতশ সংখ্যক আখ্যানে একজন তিলব্যবসায়ী ও ভাণ্ডব্যবসায়ীর কথা বর্ণিত হয়েছে। ভাণ্ডব্যবসায়ীর তার একটি অঙ্গুরীয়ক তিলব্যবসায়ীর নিকট তিলের বায়নাস্বরূপ আছে বলে দাবি করে। তিলব্যবসায়ীর কাছে এমন কোনো বায়না না থাকায় সে ঐ ব্যক্তিকে প্রথমে তিল দিতে অস্বীকার করেছে। কিন্তু পরে যখন সে জানতে পারে বায়নাস্বরূপ অঙ্গুরীয়কটি তার স্ত্রীর কাছে রয়েছে তখন তিল দিতে অস্বীকার করলেও, সে ঐ ভাণ্ডব্যবসায়ীকে বায়নামূল্যরূপ অঙ্গুরীয়কটি ফেরৎ দিতে বাধ্য হয়েছে।[২৭] যেহেতু তিল ব্যবসায়ী তিল দিতে পারেনি অথচ ভাণ্ড ব্যবসায়ী বায়না করার সঠিক প্রমাণ দিতে পেরেছে তাই সে তাকে বায়নার মূল্যটি ফেরৎ দিয়েছে। যদিও স্মৃতিতে

[২৭] শুক.,পৃ.২৫৭

দ্বিগুণ মূল্য ফেরৎ দেওয়ার বিধান দেখা যায় তবে দ্রব্য দিতে অসমর্থ হলে বায়নাকৃত মূল্য প্রত্যর্পণের এই দস্তুর উভয় ক্ষেত্রেই মেলে।

৩.ক্রীতানুশয়

অনুশয় কথার অর্থ হল পশ্চাতাপ বা অনুশোচনা। কোনো পণ্য ক্রয় করে ক্রেতার তার অনুশোচনা হলে তার কী করণীয়, কী তার অধিকার এই সম্পর্কে স্মৃতিতে বিশেষ কিছু নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে। মনু কেবল ক্রেতা নয় বিক্রেতারও অনুশোচনা হলে তার কী করণীয় একই সাথে উল্লেখ করেছেন। কোনো ব্যক্তির অধিকার ছিল যে, সে নিজদ্রব্য বিক্রয় করে বা ক্রয় করে দশ দিনের মধ্যে ফেরৎ দিতে বা নিতে পারত। দ্রব্য বিক্রয় করে যদি তার অনুশোচনা হয় তবে সাত দিনের মধ্যে ফেরত নিতে পারত। যদি ক্রেতার কোনো দ্রব্য ক্রয় করার পর অনুশোচনা হত তবে দশ দিনের মধ্যে তা প্রত্যর্পণ করতে পারতো। এই নিয়মের বিরুদ্ধ আচরণকারী দণ্ডনীয় হত। মনু বলেছেন, যদি ক্রেতা বা বিক্রেতার কোনো দ্রব্য কিনে বা বেচে অনুশয় হয় তবে সে দশ দিনের মধ্যে তা ফেরৎ দিতে কিংবা ফেরত নিতে পারে। কিন্তু দশ দিনের পর আর ক্রীত বস্তু বিক্রীত বস্তু ফিরিয়ে নিতে পারবে না। যদি বলপূর্বক ফিরিয়ে দেয় কিংবা নেয় তবে, যে এরকম করবে তাকে রাজা ছয়শতপণ দণ্ড দিতে বাধ্য করবেন।[২৮]

মনু, অনুশয় হলে দ্রব্য প্রত্যর্পণের অধিকার ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে দিলেও নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য কেবল ক্রেতার কথাই উল্লেখ করেছেন। নারদ আলোচ্য বিবাদপদটির সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভেই বিবাদপদটির স্বরূপটি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, যেখানে মূল্য দিয়ে পণ্য ক্রয় করার পর ক্রেতার সেই ক্রীত দ্রব্য সম্পর্কে অনুশোচনা হয় তাকেই ক্রীতানুশয় বিবাদপদ

---

[২৮] ক্রিত্বা বিক্রীয় বা কিঞ্চিদ্ যস্যানুশয়ো ভবেৎ।

...

আদদানো দদচ্চৈব রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্।। মনু.,৮.২২৩-২২৪

বলা হয়।[২৯] কোনো পণ্য ক্রয় করার পূর্বে পণ্যটির দোষ-গুণ বিচার করে তবেই ক্রেতার ঐ দ্রব্য ক্রয় করা উচিত। সঠিকভাবে পরীক্ষা করে তবেই পছন্দসই পণ্য ক্রয় করা উচিত। কিন্তু যদি ক্রেতার পণ্যটি কেনার পর অনুশয় বা পশ্চাতাপ হয় তবে তার ঐ দ্রব্যটি ঐ দিনই ফেরত দেওয়া উচিত। নারদ বলেছেন দ্বিতীয় দিনে ক্রীত দ্রব্যটি প্রত্যর্পণ করা হলে তাকে মূল্যের ত্রিশভাগ এবং তৃতীয় দিনে প্রত্যর্পণ করলে তার দ্বিগুণ মূল্য দিতে হবে। তিন দিনের পর কোনো দ্রব্য আর প্রত্যর্পণ করা যাবে না।[৩০]

স্মৃতিতে ক্রেতাকে কখনও সতর্ক হয়ে দ্রব্য ক্রয় করতে বলা হয়েছে আবার কোথাও তার অনুশোচনার জন্য নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে দ্রব্য বদলানোর বা ফেরত দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে – এইভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে। ক্রীত দ্রব্য ঐ দিন ফেরত দেওয়াই শ্রেয় কারণ সেক্ষেত্রে বিক্রেতা দ্রব্যটি অন্যত্র বিক্রয় করতে পারে। তাছাড়া দ্রব্য যদি দীর্ঘদিন ক্রেতা নিজের কাছে রেখে দেন তবে তা ফেরৎ দিলে দ্রব্যটির হানি, মাধুর্য্য নষ্টেরও সম্ভাবনা থাকে। তাই স্মৃতিতে দ্রব্য দ্রুত প্রত্যর্পণের বিধি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তবে কিছু কিছু দ্রব্যের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেখানে ক্রেতা পরীক্ষামূলকভাবে পণ্যটি নিজের কাছে রেখে, ব্যবহার করে তারপর তা বিক্রেতাকে প্রত্যর্পণ করতে পারতেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, ধান প্রভৃতির বীজ, লোহা, বাহনযোগ্য বলদ, রত্ন, দাসী স্ত্রীলোক, দোহনীয় গো-মহিষ প্রভৃতি ও ভৃত্য পুরুষগণকে ক্রয় করে যথাক্রমে দশ, এক, পাঁচ ও সাতদিন, একমাস, তিনদিন ও অর্ধমাস পরীক্ষা করে দেখা যাবে।[৩১] কিন্তু ঐ সময় অতিক্রান্ত হলে আর ক্রীত দ্রব্য ফেরত দেওয়া যাবে না। কাত্যায়নও ক্রীতবস্তুর পরীক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন। দুগ্ধবতী পশুর ক্ষেত্রে

---

[২৯] ক্রীত্বা মূল্যেন যঃ পণ্যং ক্রেতা ন বহু মন্যতে।
ক্রীতানুশয় ইত্যেতদ্বিবাদপদমুচ্যতে।। নারদ.,৪.৯.১

[৩০] দ্বিতীয়েঽহ্নি দদত্ ক্রেতা মূল্যত্রিংশাংশমাহরেৎ।
দ্বিগুণং তু তৃতীয়েঽহ্নি পরতঃ ক্রেতুরেব তৎ।। নারদ.,৪.৯.৬

[৩১] দশৈকপঞ্চসপ্তাহমাসত্র্যহার্দ্ধমাসিকম্।
বীজায়োবাহ্যরত্নস্ত্রীদোহ্যপুংসাং পরীক্ষণম্।। যাজ্ঞ., ২.১৭৭

তিনদিন, অন্যপশুর ক্ষেত্রে পাঁচদিন, প্রবাল ইত্যাদি রত্নের জন্য সাতদিন, বীজের জন্য দশদিন ও বস্ত্রাদির পরীক্ষা একদিনের ভেতর করতে আদেশ করেছেন। এই সকল দ্রব্যাদি পরীক্ষামূলকভাবে ক্রেতা নিজের কাছে রাখতে পারত, পরীক্ষা করে পছন্দ না হলে ফেরত দিতে পারত। নারদও বিভিন্ন বস্তুর পরীক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্ধারণ করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদ দ্রব্যের নাম উল্লেখপূর্বক কোন দ্রব্যের কতপরিমাণ ক্ষয় হয় তা নির্দিষ্ট করেছে এবং এই নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষয় দেখালে শিল্পীর দণ্ড হবে এমন ব্যবস্থা করেছেন।

বস্তুতঃ এই বিধি বা ব্যবস্থাগুলির দ্বারা ক্রেতার স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে। বস্ত্রাদি পরীক্ষার জন্য ক্রেতা নির্দিষ্ট সময় অবধি তা নিজের কাছে রাখতে পারলেও বস্ত্র যদি ঐ সময়ের মধ্যে পরিধান করে কিংবা কোনো কারণে যদি বস্ত্রটি মলিন হয়ে যায় তবে সময়সীমা থাকলেও ঐ বস্ত্রটি ক্রেতা প্রত্যর্পণ করতে পারতেন না। এর দ্বারা বোঝা যায় শুধু ক্রেতা নয় বিক্রেতার স্বার্থরক্ষার দিকেও স্মৃতিকারগণ যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। বৃহস্পতি মত্ত, উন্মত্ত দ্বারা কম মূল্যে, বাস্তবিক মূল্যের কম মূল্যে বা ভয়ের কারণে বিক্রীত বস্তুকে সর্বদাই ফেরতযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[৩২]

৩.১.আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে ক্রীতানুশয়ের দৃষ্টান্ত

আখ্যানগুলিতেও ক্রীতানুশয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেখানে ক্রেতাকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে অনুশোচনাবশতঃ দ্রব্যটি বিক্রেতাকে প্রত্যর্পণ করতে দেখা যায়। বিক্রেতা অসম্মত হলে বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য ন্যায়ালয়ে গমন করতেও দেখা যায়। *কথাসরিৎসাগরের* লাবাণক লম্বকের পঞ্চম তরঙ্গের 'দেবদাসবৃত্তান্ত' শীর্ষক আখ্যানে জমি ক্রয়ের পর তা ফেরত দেওয়া প্রসঙ্গে বিবাদের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। আখ্যানটিতে ধনলোভী এক বণিক অর্থের বিনিময়ে দেবদাসের গৃহ ক্রয় করে, কারণ সে ভেবেছিল দেবদাসের গৃহে ধনসম্পদ প্রোথিত আছে। কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে যখন ঐ গৃহ থেকে কোনো সম্পদ পেল না তখন সে দেবদাসকে গৃহ ফেরত

---

[৩২] যত্রোন্মত্তেন বিক্রীতং হীনমূল্যং ভয়েন বা।
অস্বতন্ত্রেণ মূঢ়েন ত্যাজ্যং তস্য পুনর্ভবেৎ।। বৃহ.,১৮.৯

দিতে চাইল এবং প্রদত্ত ক্রয়মূল্য দেবদাস কর্তৃক প্রত্যর্পণ করতে বলল। গৃহ বিক্রয় করার পর এবং বণিককে তা হস্তান্তর করার পরও বণিক গৃহ পছন্দ নয় এইরূপ কারণ দেখিয়ে গৃহ ফেরত দেওয়ার দাবী করলে দেবদাস তা প্রত্যাখ্যান করে । এইরূপ বিবাদ চলতে থাকলে তারা উভয়ে বিবাদের নিরসনের জন্য ন্যায়ালয়ের শরণাপন্ন হয়। রাজা উভয় পক্ষের কথা শুনে বণিককেই দণ্ড দেন ও তাকেই তিরস্কার করেন। রাজা দণ্ডস্বরূপ ঐ বণিকের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন ও তার যথাবিধি শাস্তিবিধান করেন।[৩৩]

আলোচ্য গল্পটিতে স্মৃতিবিহিত ক্রীতানুশয় বিবাদপদটির একাধিক বিধির প্রতিফলন দেখা যায়। এক্ষেত্রে ঐ বণিক দেবদাসের গৃহটি যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ করে ক্রয় করেছে, তা সত্ত্বেও সে পরে গৃহটি ফেরৎ দিতে চেয়েছে। দেবদাস তা ফেরৎ নেয়নি, এমনকি রাজাও তাকে গৃহটি ফেরত দেওয়ার অনুমতি দেয়নি। স্মৃতিতেও বলা হয়েছে ক্রেতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দ্রব্য ক্রয় করলে তা আর বিক্রেতার হয় না। নারদ বলেছেন, ক্রেতা স্বয়ং দ্রব্যের দোষ-গুণ বিচার করে তবেই দ্রব্যটি ক্রয় করবেন, এইভাবে পরীক্ষাপূর্বক নিজের রুচি অনুযায়ী কোনো দ্রব্য ক্রয় করলে তা আর বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া যাবে না।[৩৪] তবে, স্মৃতিশাস্ত্রে এমন ক্রেতার কী দণ্ড প্রাপ্য সে সম্পর্কে কিছু না বলা হলেও আলোচ্য আখ্যানটিতে এমন দুষ্ট ক্রেতাকে যথাবিধি দণ্ড ভোগ করতে দেখা যায়। রাজা তার এমন কার্যের জন্য উপযুক্ত দণ্ডবিধান করেছেন।

ক্রীতানুশয়ের আর একটি দৃষ্টান্ত *কথাসরিৎসাগরের* চতুর্দ্দারিকা নামক পঞ্চম লম্বকের প্রথম তরঙ্গে দেখা যায়। প্রথম তরঙ্গের 'শিব ও মাধবের আখ্যান'-এ শিব, একজন চতুর ব্যক্তি উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে কিছু বহুমূল্য রত্নসমূহ সে পুরোহিতকে বিক্রয় করে। বিক্রয়ের পূর্বে তিনি পূরোহিতকে রত্নসমূহের পরীক্ষা করে তার মূল্য নির্ধারণ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু লোভী পুরোহিত রত্নরাজির মূল্য গণনাতীত হবে এরূপ মনে করে তার সর্বস্ব ধন শিবকে

---

[৩৩] কথা.,পৃ.১৭৪

[৩৪] ক্রেতা পণ্যং পরীক্ষেত প্রাক্ স্বয়ং গুণদোষতঃ।
পরীক্ষাভিমতং ক্রীতং বিক্রেতুর্ন ভবেৎ পুনঃ।। নারদ.,৪.৯.৪

প্রদান করেন। কিন্তু বেশকিছু দিন অতিক্রান্ত হওযার পর পুরোহিত একটি রত্ন বিক্রয় করতে গেলে জানতে পারেন ঐ সকল রত্নরাজি নকল, কাঁচ নির্মিত, তখন পুরোহিত প্রথমে শিবের কাছে ক্রয়মূল্য বাবদ প্রদত্ত অর্থ ফেরত চাইলে শিবের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিচারের জন্য ন্যায়ালয়ের শরণাপন্ন হন।[৩৫] আলোচ্য আখ্যানটিতে এক দুষ্ট ব্যক্তির চক্রান্তে পুরোহিত কৃত্রিম রত্ন ক্রয় করে পরে পশ্চাতাপ করেছে। পুরোহিত যেহেতু রত্নরাজি পরীক্ষা করে ক্রয় করেনি তাই তাকে ঠকতে হয়েছে। স্মৃতিতেও ক্রেতাকে দ্রব্য ক্রয়ের পূর্বে কারো দ্বারা অথবা স্বয়ং পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে। পুরোহিত ক্রয় করার স্বল্প দিনের মধ্যে রত্নগুলি ফেরত দিতে না যাওয়ায় ন্যায়ালয়ের বিচারকর্তাও তাকে তার দ্রব্যমূল্য ফেরত দেওয়াতে পারেনি কারণ দীর্ঘদিন পরে আসায় তার ক্রীতদ্রব্য পরীক্ষণের সময় উত্তীর্ণ হয়েছে।

স্মৃতিতে বলা হয়েছে, যে বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় খুব বেশি, ব্যবহারকালে যা সহজে নষ্ট হয় না এবং যার মূল্যও বাজারে কমে না কিন্তু স্থির থাকে যেমন – তামা প্রভৃতির পাত্র ইত্যাদি এরূপ দ্রব্য ক্রয় করার পর ব্যবহার না করা হলে তা দশ দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়া চলবে। কিন্তু যে বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বিরল, যার মূল্যও স্থির নয় সেটি সেই দিনেই বা তার পরের দিনেই ফেরত দেওয়া কর্তব্য। আর ফলপুষ্পাদির মতো বস্তুর 'অনুশয়' তৎক্ষণাৎই কর্তব্য। তাই স্মৃতির বিধান অনুযায়ী সর্বাধিক দশ দিনের মধ্যে রত্নসমূহ পুরোহিত ফেরত দিতে পারতো। কিন্তু সে এমন না করায় দ্রব্য হানি তাকেই স্বীকার করতে হয়েছে। যদিও নষ্ট দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য শিবই রাজার কাছে দণ্ডার্হ কিন্তু পুরোহিত যথাসময়ে অভিযোগ না করায় এবং তার অজ্ঞানতার জন্য তাকেই ফল ভুগতে হয়েছে।

উপরের এই আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, স্মৃতিতে ও আখ্যানে ক্রেতার সুবিধার্থে একাধিক নিয়ম নির্দিষ্ট করা হলেও উভয়ক্ষেত্রে ক্রেতাকেই সচেতন হয়ে দ্রব্য ক্রয় করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। *দশকুমারচরিতে*র উপহারবর্মাচরিত নামক তৃতীয় উচ্ছ্বাসে ক্রেতার প্রতি একটি বিশেষ উপদেশ পাওয়া যায়। সেখানে বিকটবর্ম্মা খন্তিনামের এক যবনের কাছে মহামূল্যবান

---

[৩৫] কথা.,পৃ.৪৯-৫১

রত্ন আছে এমনটা জানতে পারেন এবং অর্ধমূল্যের বিনিময়ে ছলনা করে তা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য উদ্যত হন। উপহারবর্ম্মা তার এই সংকল্পের কথা ও অন্যান্য সকল গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জ্ঞাত হন। বিকটবর্ম্মাকে হত্যার পর তিনি বিকটবর্ম্মার সকল ষড়যন্ত্র ও অন্যায্য সংকল্পাদি নিরসন করার জন্য তৎপর হন। খন্তিনামক যবনের থেকে অর্ধমূল্যে রত্নাদি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য নগর বৃদ্ধদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিকটবর্ম্মার মৃত্যুর পর উপহারবর্ম্মা নগরবৃদ্ধদের এমন অন্যায্য কাজ থেকে বিরত করেন। তিনি এই সময় নগরবৃদ্ধদের উদ্দেশ্যে স্পষ্টতই জানিয়েছেন- বিক্রেতাকে ছলনা করে স্বল্পমূল্যে বা অর্ধমূল্যে দ্রব্যক্রয় অনুচিত। দ্রব্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করে দ্রব্য যাচাই করে তবেই দ্রব্য ক্রয় করা উচিত।[৩৬] যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে ঠকিয়ে যথাযথ মূল্য না দিয়ে দ্রব্য ক্রয় করেন তবে তার ধর্মহানি ঘটে অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে যথাবিধি দ্রব্যমূল্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করবেন ইহাই ধর্মের পথ।

৪.প্রনষ্টস্বামিক রিক্থ ও তার ব্যবহারবিধি

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় অসাধারণ ব্যবহারমাতৃকা প্রকরণে পথে, শুল্কশালায় অথবা অন্য কোনো স্থানে পতিত সুবর্ণাদি মূল্যবান বস্তু যদি হারিয়ে যায় এবং পরে পাওয়া যায় সেগুলির ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা আলোচনা করা হয়েছে। মনুও হারিয়ে যাওয়া ধন প্রাপ্তি হলে তাকে তাতে রাজা, দ্রব্যস্বামী ও যে দ্রব্যটি প্রাপ্ত হয়েছে তাদের দ্রব্যটিতে অধিকার কি হবে সে বিষয়ে আলোচনা করার পর নিধি সম্পর্কিত নিয়মাবলীর উল্লেখ করেছেন। যে রিক্থের মালিক প্রনষ্ট অর্থাৎ অবিজ্ঞাত এইরকম প্রনষ্ট স্বামিক ধনাদি বেওয়ারিশ অবস্থাতে পথে বা অন্য কোনো স্থানে পড়ে থাকলে রাজা প্রকাশ্য স্থানে ঘোষণা করে সেই জিনিসটি তিন বৎসর রক্ষা করবেন। তিন বৎসরের মধ্যে যদি ঐ ধনের মালিক এসে উপস্থিত হয়, তাহলে সে ঐ ধন লাভ করবে আর যদি

[৩৬] জ্যোতিভূষণ চাকী, *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার.* ৭ম খণ্ড. *দশকুমারচরিত,* পৃ.৭৫

তিন বৎসর অতিক্রম করে যায় অর্থাৎ তিন বৎসরের মধ্যে ঐ ধনের মালিক উপস্থিত না হয় তবে নিজে তা গ্রহণ করবেন- এইরকম বিধানই স্মৃতিতে নির্ধারিত হয়েছে।

৪.১.আখ্যানসাহিত্যে প্রনষ্টস্বামিকরিক্থ

সংস্কৃত আখ্যানগুলিতেও প্রনষ্টস্বামিকরিক্থ প্রত্যর্পণ সম্বন্ধিয় এইরূপ বিধান দেখা যায়। স্বয়ং, যে দ্রব্যটির মালিক নয় এমন কোনো দ্রব্য কেউ পেলে তা রাজাকে জানাতে হত। যদি কেউ রাজাকে না জানিয়েই নিজে লব্ধ দ্রব্য ভোগ করত তবে, তা ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। *পঞ্চতন্ত্রের* কাকোলূকীয়ম্ এর চতুর্দশ সংখ্যক আখ্যান 'সুবর্ণপুরীষপক্ষীকথা'য় এমনই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আখ্যানটিতে একজন ব্যাধ অত্যন্ত মূল্যবান একটি পক্ষী প্রাপ্ত হয়। পক্ষীটি মূল্যবান কারণ পক্ষীর ত্যাগ করা পুরীষ মৃত্তিকাতে পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা সুবর্ণে পরিণত হত। এমন আশ্চর্য মূল্যবান পক্ষী নিশ্চয় কেউ সৃষ্টি করেছে, এমন চিন্তা করে ব্যাধ পক্ষীটিকে গৃহে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তার বোধোদয় হয় যে, এমন বিচিত্র পক্ষী সে রাজাকে না জানিয়েই নিয়ে এসেছে। রাজা জানলে তার প্রাণসংকট ঘটবে, তাই সে তৎক্ষণাৎ পক্ষীটি রাজাকে প্রত্যর্পণ করেছে।[৩৭] মূল্যবান পক্ষীটি প্রাপ্ত হয়ে দরিদ্র ব্যাধ ধনী হয়ে যেতে পারত। শাস্তির ভয়ে ব্যাধের দ্বারা পক্ষীটি রাজাকে প্রদান- একথাই প্রমাণ করে যে, বেওয়ারিশ দ্রব্য রাজাকে না জানানো ও ভোগ একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। আলোচ্য আখ্যানটিতে এই অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দণ্ড অর্থাৎ প্রাণদণ্ডও হতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা উল্লিখিত হয়েছে। যা থেকে বোঝা যায় এটি গুরুতর অপরাধ হিসেবেই গণ্য হত।

প্রনষ্টস্বামিকরিক্থ দৃষ্টান্ত *দশকুমারচরিতের* অপহারবর্মাচরিতেও পাওয়া যায়। সেখানে ধনমিত্র রাজাকে জানিয়েছে সুবর্ণে পূর্ণ হয়ে যায় এমন একটি বিচিত্র মূল্যবান চর্মথলিটির মালিক যেহেতু সে নয় তাই সে চর্মথলিটি রাজাকে অর্পণ করতে চায়। কারণ রাজাকে না জানিয়ে

[৩৭] সুধাকর মালবীয়, *পঞ্চতন্ত্র.*, পৃ.৫৭৫

তা ভোগ করা অনুচিত।[৩৮] অর্থাৎ যে দ্রব্যের মালিক স্বয়ং নয় তা কেবল ভোগ নয়, নিজের কাছে রাখাও অনুচিত। এখানে রাজা ধনমিত্রের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে চর্মথলিটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

স্মৃতিতেও হারানো দ্রব্যের প্রাপ্তির কথা রাজাকে কেউ জানালে তার সততার জন্য ঐ অধিগন্তার পুরষ্কারস্বরূপ দ্রব্যটির কিছু অংশ প্রাপ্তির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হারানো দ্রব্যের বিধানে অধিগন্তার অংশের কথা না বললেও, যাজ্ঞবল্ক্যের বচনের ব্যাখ্যাকালে *মিতাক্ষরা*কার অধিগন্তা অর্থাৎ যে হারিয়ে যাওয়া দ্রব্যটি পেয়েছে তার জন্য কিছু অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। টীকাকার এপ্রসঙ্গে মনুর বচন উল্লেখ পূর্বক রাজা নিজে কখন কত অংশ নেবে এবং কাকে কত দেবেন সে বিষয়ে নিধি নির্দিষ্ট করেছেন। মনুর মতে, ঐ হারিয়ে যাওয়া জিনিসটি যখন মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তখন রাজা সাধুব্যক্তিদের ধর্ম স্মরণ করে ধনস্বামীর কাছ থেকে ঐ ধনের ছয় ভাগের একভাগ বা দশভাগের একভাগ বা বারোভাগের একভাগ গ্রহণ করবেন।[৩৯] দ্রব্যস্বামীর অসাবধানতার জন্যই সে সম্পূর্ণ দ্রব্যটি ফেরৎ পাবে না। জরিমানাস্বরূপ কিছু অংশ রাজা গ্রহণ করবেন- এমনটা বলা যায়। *মিতাক্ষরা*কারের মতে, দ্রব্যস্বামী যদি একবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আসে তাহলে রক্ষণমূল্যরূপে কিছু অংশ রেখে বাকীটি দ্রব্যস্বামীকে দিতে হবে। প্রথমবর্ষে আসলে সম্পূর্ণ অংশই দেবেন। দ্বিতীয়বর্ষে দ্বাদশভাগ, তৃতীয়বর্ষে দশমভাগ, চতুর্থবর্ষে ষষ্ঠভাগ গ্রহণ করে অবশিষ্টাংশ ফেরৎ দেবেন। রাজা নিজের ভাগে থেকে চতুর্থাংশ অধিগন্তাকে দেবেন। যদি তিনবছরেও দ্রব্যস্বামী না আসে তবে সমগ্র ধনের চতুর্থাংশ অধিগন্তাকে দিয়ে বাকীটা রাজা গ্রহণ করবেন।[৪০] হারানো দ্রব্যটিতে দ্রব্যস্বামীর অধিকার, তার অনুপস্থিতিতে রাজার। কোনো দ্রব্যের

---

[৩৮] দশ.,পৃ.৫৯

[৩৯] আদদীতার্থষডভাগং প্রণষ্টাধিগন্তান্নৃপঃ।
দশমং দ্বাদশং বাপি সতাং ধর্মমনুস্মরন্।। মনু.,৮.৩৩

[৪০] যদা পুনঃ সংবৎসরাদ্ উর্ধ্বম্ আগচ্ছতি তদা কিঞ্চিদ্ ভাগং রক্ষণমূল্যং গৃতীত্বা শেষং স্বামিনে দদ্যাত্।...তত্র প্রথমে বর্ষে কৃৎস্নমেব দদ্যাত্। দ্বিতীয়ে দ্বাদশং ভাগং তৃতীয়ে দশমং চতুর্থাদিষু ষষ্ঠং ভাগং গৃহীত্বা শেষং দদ্যাত্। রাজভাগস্য চতুর্থঃ অংশঃ অধিগন্ত্রে দাতব্যঃ।...। মিতা.,২.৩৩

প্রকৃত মালিক যাতে তার হারিয়ে যাওয়া দ্রব্যটি ফেরৎ পায় তার প্রচেষ্টা স্বরূপই রাজাকে জানানোর বিধানগুলি করা হয়েছে। দ্রব্যস্বামীকে দ্রব্য পাইয়ে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা আখ্যানে ও স্মৃতিতে অনুরূপভাবেই দৃষ্ট হয়।

তবে, এর পাশাপাশি কোনো ঠক, চতুর ব্যক্তি যাতে মিথ্যাভাবে দ্রব্যটি অধিকার না করতে পারে তার জন্যও এই দুইক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এমন ব্যক্তি যে দণ্ডার্হ তার দৃষ্টান্ত আখ্যানে মেলে। *দশকুমারচরিতে*র তৃতীয় উচ্ছ্বাস সোমদত্তচরিতে সোমদত্ত বনভূমিতে একটি জলাশয়ে জল পান করতে গিয়ে একটি মহামূল্যবান রত্ন প্রাপ্ত হন। ঐ দ্রব্যটি তিনি পরে একজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। ব্রাহ্মণ রাজরক্ষীগণের কাছে ঐ রত্নটি প্রথমে নিজের বললেও পরে সেটি সোমদত্ত তাকে দিয়েছে একথা তাদের জানিয়ে দেন। রাজভৃত্তরা সোমদত্তকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করে।[৪১] আলোচ্য আখ্যানটিতে সোমদত্ত যে রত্নটি প্রাপ্ত হয়েছিল তা ছিল রাজার। চোরেদের দ্বারা অপহৃত অন্যান্য ধন উদ্ধার হলেও ঐ রত্নটি নিখোঁজ ছিল। সোমদত্ত ঐ রত্নটি পেয়ে রাজাকে কিছু না জানিয়ে নিজেকেই দ্রব্যটির মালিক এরূপ পরিচয় দিয়ে দ্রব্যটি দান করেছেন। অথচ রাজরক্ষীগণের কাছে ধৃত হয়ে 'রত্নটির স্বামী সে স্বয়ং' – এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি। দ্রব্যস্বামী নয় অথচ রাজাকেউ কিছু জানায়নি তাই, তার এই অপরাধের জন্য তাকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছে। এখানে সোমদত্তকে চোরে ন্যায় কারারুদ্ধ করা হলেও স্মৃতিতে এই অপরাধের ভিন্নরূপ দণ্ডবিধান দেখা যায়। মনুর মতে, যে হারিয়ে যাওয়া বস্তুটিকে এই ধন আমার এরূপ পরিচয় দেয়, অথচ নষ্ট দ্রব্যের স্থান, কাল, বর্ণ, রূপ বা পরিমাণ সঠিক বলতে পারে না। রাজা তখন যে পরিমাণ দ্রব্যের ওপর লোকটি মিথ্যা দাবী জানিয়েছে তাকে তার সমপরিমাণ অর্থদণ্ডও দিতে বাধ্য করবেন।[৪২] যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, যে সুবর্ণাদি হারিয়ে যাওয়া ধন অধিগত হয় তা

---

[৪১] দশ.,পৃ.৩৫

[৪২] অবেদয়ানো নষ্টস্য দেশং কালঞ্চ তত্ত্বতঃ।
বর্ণং রূপং প্রমাণঞ্চ তৎসমং দণ্ডমর্হতি।। মনু.,৮.৩২

রাজা ধনস্বামীকে ফেরৎ দেবেন। ধনস্বামী যদি তা তার ধন বলে ঘোষণা করেও চিহ্ন প্রদর্শন করে প্রমাণ করতে না পারে তাহলে সে দণ্ড পাবে।[৪৩]

৫.স্মৃতিতে নিধির স্বরূপ

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় অসাধারণ ব্যবহারমাতৃকা প্রকরণে পথে, শুল্কশালায় অথবা অন্য কোনো স্থানে পতিত সুবর্ণাদি মূল্যবান বস্তু যদি হারিয়ে যায় এবং পরে পাওয়া যায় সেগুলির ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ? তা আলোচনার পর নিধি প্রাপ্তির বিষয়ে বিধান দেওয়া হয়েছে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য নিধির প্রাসঙ্গিক আলোচনায় নিধির স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা না করলেও *মিতাক্ষরা*কার টীকায় নিধির স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। ভূমি খনন করে তার অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল গোপনে যে ধন রক্ষিত থাকে তাকেই নিধি বলা হয়।[৪৪]

রাজা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নিধি প্রাপ্ত হলে কত ভাগ গ্রহণ করবেন এবং অন্য কোনো বর্ণের ব্যক্তি নিধি প্রাপ্ত হলে তার কী করণীয় এই সকল বিষয়ে স্মৃতিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধুতাই নয় নিধিপ্রাপ্ত হয়ে রাজাকে না জানালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দণ্ডব্যবস্থাও স্মৃতিতে করা হয়েছে।

৫.১.আখ্যানের আলোকে নিধি

'নিধি' এই শব্দটির উল্লেখ কেবল স্মৃতিতেই নয় আখ্যানগ্রন্থগুলিতেও মেলে। *পঞ্চতন্ত্রের* অপরীক্ষিতকারক এর 'ক্ষপণককথা' আখ্যানটি থেকে নিধির স্বরূপ বিষয়ে জানা যায়। এখানে নিধি বলতে পূর্বপুরুষের দ্বারা দীর্ঘদিন যাবৎ সঞ্চিত ধনরাশিকেই বোঝানো হয়েছে। দরিদ্রতার ভয়ে ভীত এক বণিক স্বপ্নে পদ্মনিধি নামের একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দেখা পেয়েছেন,

---

[৪৩] প্রনষ্টাধিগতং দেয়ং নৃপেণ ধনিনে ধনম্।
বিভাবযেন্ন চেল্লিঙ্গৈস্তৎসমং দণ্ডমর্হতি।। যাজ্ঞ.,২.৩৩

[৪৪] ভূমৌ চিরনিখাতস্য সুবর্ণাদের্নিধিশব্দবাচ্যস্য...। মিতা.,২.৩৪

যিনি নিজেকে ঐ বণিকের পূর্বপুরুষের দ্বারা সঞ্চিত ধনরাশি বা নিধি বলে পরিচয় দিয়েছেন।[৪৫] *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* ঊনত্রিংশ উপাখ্যানেও 'নিধি' এই পারিভাষিক শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানেও নিধি বলতে দীর্ঘদিন যাবৎ সঞ্চিত ধনরাশিকে বোঝানো হয়েছে। একজন স্তুতিপাঠক রাজার অনুগ্রহে প্রভূত ধনসম্পদ প্রাপ্ত হয়ে, সেগুলিকে নিধি বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৬] স্মৃতিতে দীর্ঘদিন যাবৎ মাটির নীচে প্রোথিত ধনরাশিকেই নিধি বলা হয়েছে কিন্তু আখ্যানে নিধির যে স্বরূপ পাওয়া যায় তাতে কেবল দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ধনরাশিকেই নিধি হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। মাটির নীচে প্রোথিত এই বৈশিষ্ট্যটির উল্লেখ নেই।

কোনো ব্যক্তি নিধি প্রাপ্ত হলে তিনি রাজাকে তা জানাবেন এবং ঐ সম্পদের থেকে রাজাকে কিছু অংশও প্রদান করবেন – বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যানে নিধি বিষয়ক কাহিনিগুলি পর্যালোচনা করে এমন বিধানই দৃষ্ট হয়। কেউ রাজার অংশ প্রদান না করলে কিংবা রাজাকে না জানালে তাকে যথাবিধি দণ্ড পেতে হত। তাই দণ্ডের ভয়ে রাজাকে তার অংশ দেওয়ার দৃষ্টান্ত আখ্যানগুলিতে মেলে। *কথাসরিৎসাগরের* রত্নপ্রভা লম্বকের দ্বিতীয় তরঙ্গের 'পবনসেনের কাহিনি'তে পবনসেন ও তার সঙ্গীরা খনিতে রত্নপ্রাপ্ত হয়ে, পূর্বেই রাজাকে তার অংশ প্রদান করেছেন।[৪৭] এই গ্রন্থেরই এই লম্বকের প্রথম তরঙ্গের 'সত্ত্বশীল ও রত্নদ্বয়ের কাহিনি'তে সত্ত্বশীল উদ্যানে ভ্রমণ করতে করতে ও রাজপ্রাসাদে প্রতিক্ষারত অবস্থায় প্রভূত নিধি প্রাপ্ত হন। রাজা এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়ে তাকে রাজসভায় ডেকে তার কাছ থেকে আপন অধিকারের সম্পদ গ্রহণ করে তাকে বাকী ধনরাশি ভোগ করার অনুমতি দেন।[৪৮] দুটি আখ্যানেই প্রাপ্ত নিধিতে রাজার অধিকারের কথা স্বীকার করা হয়েছে তবে রাজা সম্পূর্ণ ধন গ্রহণ করবেন না একথাও স্পষ্টতই বোঝা যায়। তবে আলোচ্য আখ্যানগুলিতে রাজা নিধির কত অংশ গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা না হলেও স্মৃতিতে এবিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, রাজা যদি

---

[৪৫] পঞ্চ.,পৃ.৭০৮

[৪৬] মলয়েন্দ্র কুমার সেন,*সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা*, পৃ.৮৪

[৪৭] কথা.,পৃ.২০২ (২য় খণ্ড)

[৪৮] তদেব,পৃ.১৮৯

নিধি লাভ করেন তবে তার অর্ধেক ব্রাহ্মণগণকে দান করে বাকী অংশ রাজকোষে রেখে দেবেন। রাজা ও বিদ্বান ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেউ নিধি পেলে রাজা তার ছয়ভাগের একভাগ গ্রহণ করবেন, বাকিটা যিনি নিধি পেয়েছেন তার হবে।[৪৯] তবে আলোচ্য শ্লোকটির টীকায় *মিতাক্ষরা*কার রাজা নিধি লাভকারীকে ষষ্ঠাংশ দিয়ে সম্পূর্ণ নিধি রাজা গ্রহণ করবেন এমন বিধান দিয়েছেন।[৫০] নিধিতে কোন বর্ণের কী পরিমাণ অধিকার তা স্থাপনের ক্ষেত্রে আখ্যান ও স্মৃতিতে ব্রাহ্মণের প্রাধান্যতাই স্থাপিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ তার গুরুত্ব অন্য সকল বর্ণের অপেক্ষা বেশি। *কথাসরিৎসাগরের* 'সত্ত্বশীল ও রত্নদ্বয়ের কাহিনি'তে দেখা যায় সত্ত্বশীল নিধি প্রাপ্ত হয়ে, রাজাকে প্রদানের পূর্বে এমনকী রাজার আদেশের পূর্বে স্বেচ্ছায় ধনের কিছু অংশ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেছেন।[৫১] বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ জগতের প্রভু। তিনি নিধি প্রাপ্ত হলে সমগ্র অংশই গ্রহণ করবেন। স্মৃতিতে ব্রাহ্মণের স্থান রাজারও উপরে স্থাপিত হয়েছে। আখ্যানগুলিতে নিধি প্রাপ্তির বিষয়ে যে সকল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে সেখানেও ব্রাহ্মণের সর্বোচ্চ প্রাধান্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রাহ্মণের নিধিতে কারও অধিকার নেই স্মৃতির এমন বিধি আখ্যানেও মেলে।

কথাসরিৎসাগরের ষষ্ঠ লম্বক মদনমঞ্জুকার সপ্তম তরঙ্গের 'নৃপতি প্রসেনজিৎ ও ধনবঞ্চিত দ্বিজের কাহিনি'তে রাজা প্রসেনজিৎ একজন ব্রাহ্মণের হারিয়ে যাওয়া নিধি উদ্ধার করেন এবং নিধির সমগ্রভাগই তাকে প্রদান করেছেন। আখ্যানটিতে ব্রাহ্মণ অরণ্যে একটি বৃক্ষের তলদেশে তার ধনরাশি প্রোথিত করে রাখেন। কিন্তু ঐ স্থান থেকে তা কেউ অপহরণ করেছে। ব্রাহ্মণ নিধি অন্বেষণের জন্য রাজার দ্বারস্থ হন। রাজাও তাকে ধন ফেরৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তিনি যদি ব্রাহ্মণকে তা পায়িয়ে দিতে অসমর্থ হন তবে তার সমপরিমাণ ধন কোষাগার

---

[৪৯] রাজা লব্ধ্বা নিধিং দদ্যাদ্ দ্বিজেভ্যোঽর্ধং দ্বিজঃ পুনঃ।

...

ইতরেণ নিধৌ লব্ধে রাজা ষষ্ঠাংশম্ আহরেৎ।। যাজ্ঞ.,২.৩৪-৩৫

[৫০] ইতরেণ তু রাজবিদ্বদ্ব্রাহ্মণব্যতিরিক্তেন অবিদ্বদ্ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিনা নিধৌ লব্ধে রাজা ষষ্ঠাংশম্ অধিগন্ত্রে দত্ত্বা শেষং কোশে নিবেশয়েৎ। মিতা.,২.৩৫

[৫১] কথা.,পৃ.১৮৯

থেকে ব্রাহ্মণকে দেবেন এমন প্রতিজ্ঞা করেছেন।[৫২] রাজা ব্রাহ্মণের ধনরাশির সমগ্র অংশই তাকে ফেরৎ দিয়েছেন, যা থেকে বোঝা যায় যে ব্রাহ্মণের নিধিতে কারও অধিকার ছিল না এমনকি রাজারও নয়। আবার ব্রাহ্মণের নিধি না পাওয়া গেলে তাকে কোষাগার থেকে ব্রাহ্মণের হারিয়ে যাওয়া ধনের সমপরিমাণ অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থেকেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্যতা স্পষ্টই বোঝা যায়। এবিষয়ে স্মৃতিতেও একই রূপ নিয়ম দেখা যায়। সেখানে অপহৃত নিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাজা যদি চোরের হাত থেকে দ্রব্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেও সফল না হন তবে নিজের রাজকোষ থেকে তা দ্রব্যস্বামীকে প্রত্যর্পণ করবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য স্মৃতিতে রাজা এমন প্রতিশ্রুতি কেবল ব্রাহ্মণকেই করবেন, অন্য বর্ণের ব্যক্তিকে নয় – এমন উল্লেখ করা হয়নি। রাজা যে কোনো ব্যক্তির নিধি উদ্ধার করে দেবেন অথবা তা পুনঃস্থাপন করে প্রত্যর্পণ করবেন এমন বলা হয়েছে। আলোচ্য আখ্যানটিতেও রাজা নিধি অপহরণকারীকে অন্বেষণ করতে তৎপর হয়েছেন এবং নিজবুদ্ধিবলে অপহরণকারীকে সনাক্ত করে তার কাছ থেকে সকল নিধি উদ্ধার করেছেন। তিনি স্মৃতিবিহিত কর্মই করেছেন এমনটা বলা যায়। কারণ রাজা চোরের দ্বারা অপহৃত দ্রব্য নিজদেশবাসী দ্রব্যস্বামীকে ফিরিয়ে দেবেন, যদি তিনি না করেন তবে দ্রব্যস্বামী ও চোরের পাপ তিনি লাভ করেন – এমন বিধান স্মৃতিতে দেখা যায়।[৫৩]

অন্যের প্রোথিত ধন প্রাপ্ত হয়ে রাজাকে না জানিয়ে তা ভোগ করা কিংবা গুপ্তধন অন্বেষণ করে তা করায়ত্ত করা এগুলি অপরাধ। এমন অপরাধের দৃষ্টান্ত আখ্যানগুলিতে প্রায়শই চোখে পড়ে। *কথাসরিৎসাগরের* মদনমঞ্জুকা লম্বকের সপ্তম তরঙ্গের 'দ্বিজভাতৃদ্বয়ের কাহিনি'তে দেখা যায়, বিশ্বদত্ত ভূমিখনন করে স্বর্ণকলসি প্রাপ্ত হয়েছে এবং নিজের ভাতৃদ্বয়ের কাছে তা প্রদান করেছে। এমন কাজটি তারা গোপনে সম্পাদন করেছে যাতে রাজার কর্ণগোচর না হয়। আবার আলোচ্য গ্রন্থেরই এই লম্বকের অষ্টম তরঙ্গের 'যক্ষবিরুপাক্ষের কাহিনি'তেও এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে যার জীবিকা ছিল গুপ্তধন অন্বেষণ করে তা অপহরণ করা। আখ্যানটিতে এমন

---

[৫২] কথা.,পৃ.১২-১৪ (২য় খণ্ড)

[৫৩] দেয়ং চৌরহৃতং দ্রব্যং রাজ্ঞা জানপদায় তু।

অদদদ্ধি সমাপ্নোতি কিল্বিষং যস্য তস্য তৎ।। যাজ্ঞ.,২.৩৬

পাপকর্মের জন্য মৃত্যদণ্ড বিহিত হয়েছে। স্মৃতিতেও এমন ব্যক্তি যে দণ্ডার্হ হবেন সেকথাই বলা হয়েছে।[৫৪] অর্থাৎ উপরের এই আলোচনা থেকে বলা যায় গুপ্তধন কিংবা নিধিতে রাজার অংশ আখ্যানে এবং স্মৃতি উভয় ক্ষেত্রেই স্বীকৃত হয়েছে।

৬.স্মৃতিশাস্ত্রে স্বামিপালবিবাদবিধি

স্বামী শব্দের অর্থ হল পশুর মালিক। পাল শব্দের দ্বারা পশুদের রক্ষায় নিযুক্ত রক্ষক বা পালককে বুঝতে হবে। এই দুয়ের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদকে স্বামিপালবিবাদ বলা হয়েছে। এই বিবাদপদটির আলোচনাবসরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষেত্রস্বামীর সাথে পশুর মালিক কিংবা পশুপালকের বিবাদের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে স্মৃতিকারগণ তারজন্যও উপযুক্ত দণ্ডবিধান করেছেন। পালিত পশু শস্যনাশ করলে কখন পালকের দণ্ড হবে, কখন পশুর মালিক দোষী বলে বিবেচিত হবেন, এমনকি কখন কেউ-ই দণ্ডিত হবেন না এই সকল বিষয়ই বিবাদপদটির আলোচ্য বিষয়। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* এই প্রসঙ্গে পালকের বেতন কেমন হবে তা আলোচিত না হলেও মনু পশুপালকের বেতন সম্পর্কে বিধান দিয়েছেন।

পালকের অনবধানতাবশতঃ মহিষী, গাভী, ছাগল ও মেষ অন্যের ক্ষেত্রের শস্যনাশ করলে পালক যথাক্রমে আটমাষা, চারমাষা, দুইমাষা পরিমাণ দণ্ড দেবে এমন দণ্ডব্যবস্থা ছিল।[৫৫] যদি দিবাভাগে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পালকের বা রাখালের তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন পশুর কোনো অনিষ্ট ঘটে তবে পালকটি দোষী হবে, রাত্রিকালে মালিকের বাড়িতে যদি পশুটি থাকে তবে পশুর মরণাদি অনিষ্ট ঘটে তবে মালিকের দোষ হবে। অন্যথায় পালকই দোষী বলে বিবেচিত হত।[৫৬]

---

[৫৪] অনিবেদিতবিজ্ঞাতো দাপ্যস্তং দণ্ডমেব চ। যাজ্ঞ.,২.৩৫

[৫৫] মাষানষ্টৌ তু মহিষী শস্যঘাতস্য কারিণী।
দণ্ডনীয়া তদর্ধন্তু গৌস্তদর্ধমজাবিকম্।। যাজ্ঞ.,২.১৫৯

[৫৬] দিবা বক্তব্যতা পালে রাত্রৌ স্বামিনি তদ্গৃহে।
যোগক্ষেমেঽন্যথা চেত্তু পালো বক্তব্যতামিয়াৎ।। মনু.,৮.২৩০

৬.১.আখ্যানগুলিতে স্বামী ও পালকের বিবাদ প্রসঙ্গ

*পঞ্চতন্ত্র*গ্রন্থটির লব্ধপ্রণাশের 'ঘণ্টোষ্ট্রকথা' আখ্যানটিতে পালকের বেতনব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। একজন উটমালিক তার উটের পালের রক্ষানিমিত্ত একজন রক্ষক নিয়োগ করেছেন। উটের পালের রক্ষক প্রতিদিন উটগুলিকে সমীপবর্তী বনভূমিতে বিচরণের জন্যও নিয়ে যেত এবং সায়ংকালে অক্ষত অবস্থায় তাদের পশুর স্বামীর গৃহে নিয়ে আসা তার কর্তব্য ছিল। প্রতিদিনের এই কাজের বিনিময়ে উটমালিক তাকে বেতনস্বরূপ বৎসরে একটি উটের শাবক ও পানের নিমিত্ত প্রত্যহ উটের দুধ প্রদান করতেন।[৫৭] আখ্যানটিতে প্রাপ্ত বেতন ব্যবস্থা অনুযায়ী পালক তার কর্মানুযায়ী উপযুক্ত বেতন প্রাপ্ত হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে পালকের জন্য কিরূপ বেতনব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা আলোচনা করা আবশ্যক। মনুর মতে, যে গোপালক ক্ষীরভৃত অর্থাৎ পারিশ্রমিকরূপে দুধ নিয়ে গরুচরায় সে দশটি গরুচরালে একটি শ্রেষ্ঠ গরুর দুধ সবটাই মালিকের অনুমতিক্রমে নেবে। বেতনভুক্ পশুপালক যদি অন্য কোনো বেতন না পায় তবে ঐ দুধই তার বেতন হবে।[৫৮] এখানে গোপালকের বেতন সম্পর্কে উল্লেখ করা হলেও এটি মূলতঃ দুগ্ধবতী অন্যান্য সকল পশুপালকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। যাদের দোহন করা হয় এমন পশুর পালক যদি অন্নাদি বেতনরূপে না পায় তবে দশটির মধ্যে শ্রেষ্ঠপশুটির দুগ্ধ বেতনরূপে গ্রহণ করতে পারত। আখ্যানটিতে শ্রেষ্ঠ উটের সমগ্র দুগ্ধই পালক পেত কিনা সেবিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা না গেলেও বেতনরূপে দুগ্ধপ্রদানের নিয়মটি যে স্মৃতিসম্মত তা স্পষ্টই বোঝা যায়। পশুর রক্ষার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তির প্রধান কার্যই হল পশুগুলিকে নিরাপদে পশুর স্বামীর গৃহে ফেরৎ নিয়ে আসা। কিন্তু সে যদি তার এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে অসমর্থ হয় তবে তাকে উপযুক্ত দণ্ড পেতে হত।

পশুপালকের উপস্থিতিতে তার অনবধানতার কারণে পশু হারিয়ে গেলে, হিংস্র পশুর দ্বারা পশু নিহত হলে তার দায় পালক বা রক্ষককেই নিতে হত। পালকের অনবধানতা তথা

---

[৫৭] পঞ্চ.,পৃ.৬৮৭

[৫৮] গোপঃ ক্ষীরভৃতো যস্তু স দুহ্যাদ্ দশতো বরাম্।
গোস্বাম্যনুমতে ভৃত্যঃ স্যাৎ পালকেঽভৃতে ভৃতিঃ।। মনু., ৮.২৩১

অসাবধানতার কারণে এমন অনিষ্ট ঘটার দৃষ্টান্ত বিভিন্ন আখ্যানে পাওয়া যায়। *পঞ্চতন্ত্রে* বর্ণিত উক্ত আখ্যানটিতেই রক্ষক উটের দলকে বনে নিয়ে গেলেও ফেরার সময় একটি উটের অনুপস্থিতি না দেখেই বাকি উটের পালকে গৃহে ফেরৎ নিয়ে আসে। একটি উট জঙ্গলে হারিয়ে যায় এবং সিংহের দ্বারা নিহত হয়। পালক বেতন নিয়েও তার কার্যটি এক্ষেত্রে সঠিকভাবে পালন করতে অসমর্থ হয়েছে, এবং পশুটি তার জন্য প্রাণ হারিয়েছে। আখ্যানটি থেকে পালকের দণ্ডবিধান সম্পর্কে কোনো তথ্যাদি না পাওয়া গেলেও অপরাধমূলক এমন কার্য যে ঘটত তা জানা যায়। মনুর মতে, যদি রক্ষকের চেষ্টার অভাবে কোনো পশু হারিয়ে যায়, কীটাদির দ্বারা নাশিত হয়, শ্বাপদ ইত্যাদি কর্তৃক নিহত হয় কিংবা গর্ত প্রভৃতিতে পড়ে মারা যায় তাহলে যে রক্ষক তার জন্য দায়ী সে ঐরকম একটি পশু মালিককে দিতে বাধ্য থাকবে।[৫৯] রক্ষকের চেষ্টা বলতে বোঝায় যেমন – রক্ষক পশুপালের নিকটে আগত বৃক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে তাড়িয়ে দেবে, এটি তার কর্তব্য। কিন্তু যদি সে এরূপ করেও ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণিকে আটকাতে সমর্থ না হয়, কিংবা যদি কোনো একটি পশু হঠাৎ অতর্কিতভাবে দল থেকে ছুটে পালিয়ে গর্তাদির মধ্যে পড়ে এবং পালক তাকে ফেরাতে না পারে তবে পালকের কোনো দোষ হবে না। যদি পালক পশুটির মৃত্যুর ব্যাপারে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে পারে তবে সে দোষযুক্ত হবে না।

গোচারণ ক্ষেত্রে পশুর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হলে পালক পশুটির দুটি কান, চামড়া, পুচ্ছের লোম, বস্তি (মুত্রাশয়), স্নায়ু এবং শৃঙ্গাদির মূল জাত চূর্ণ পদার্থবিশেষ ইত্যাদি কোনো একটি অঙ্গ নিয়ে ঐ পশুর মালিককে দেবে - যাতে ঐ পশুর মৃত্যুতে প্রত্যয় হয় পশুটির এমন কোনো পরিচায়ক চিহ্ন দেখাবে। এরকম করলে পালকটি মালিককে পশুটির স্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত করতে পারেন এবং উল্লিখিত চিহ্ন দেখে পশুস্বামীর এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হবে যে, এটি সে পশুই নিশ্চিত। পালকটিও দণ্ডের থেকে রেহাই পাবেন।

---

[৫৯] নষ্টং বিনষ্টং কৃমিভিঃ শ্বহতং বিষমে মৃতম্।
হীনং পুরুষকারেণ প্রদদ্যাৎ পাল এব তু।। মনু., ৮.২৩২

*কাত্যায়নস্মৃতি*তে এ প্রসঙ্গে পালকের জন্য একটি বিশেষ সতর্কতামূলক বিধান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই পালকদ্বারা পশুতাড়নার সম্ভাবনা থাকায় তিনি দণ্ডবিধি নির্দিষ্ট করে পশু পালককে অধিক মাত্রায় পশুতাড়ন থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, পশু শস্যক্ষেত্রে, উদ্যানে, সংরক্ষিত এলাকায়, কারো গৃহে, গোশালায় প্রবেশ করলে পালক তাড়ন করতে পারেন। তবে এই সকল ক্ষেত্রের বাইরে অন্যত্র বিনা কারণে পশুকে অত্যধিক আঘাত করলে পশুকে আঘাতের পরিমাণানুসারে তাকে দণ্ড দিতে হবে।[৬০] পশুস্বামী পশুর দেহে ক্ষত দ্বারাই আঘাতের পরিমাণ বুঝতে পারেন। প্রয়োজনাতিরিক্ত এবং শাস্ত্রোক্ত অনুমতি অতিরিক্ত আঘাতে জন্য পালককে দোষী বলে গণ্য করা হবে। পশুটির ক্ষতির আধিক্য-ন্যূনতা অনুযায়ী তার দণ্ড নিশ্চিত করা হবে।

পালিত পশু দ্বারা ক্ষেত্রের শস্যনাশ হলে ক্ষেত্রের মালিকের যে আর্থিক ক্ষতি হত তার জরিমানা তাকে দিতে হবে, কখন দিতে হবে না সে বিষয়ে স্মৃতিতে সুনির্দিষ্ট বিধি নিশ্চিত করা হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রের* ও *হিতোপদেশের* কয়েকটি আখ্যানেও পশু দ্বারা শস্যনাশের প্রসঙ্গটি দেখা যায়। শাস্তি প্রসঙ্গটি সেখানে উল্লিখিত না হলেও অপরাধটির উল্লেখ মেলে। *পঞ্চতন্ত্রের* লব্ধপ্রণাশের 'ব্যাঘ্রচর্মগর্দভকথা' আখ্যানটিতে শুদ্ধ পট নামক একজন ধোপার একটি পালিত গর্দভ ছিল। খাদ্যের অভাবে দুর্বল মৃতপ্রায় গর্দভটিকে ধোপা রাত্রিকালে ব্যাঘ্রচর্মাচ্ছাদিত করে নিকটস্থ যবের ক্ষেত্রে যবভক্ষণের নিমিত্ত ছেড়ে দিত। গর্দভটি সারারাত্রি যাবৎ যথা ইচ্ছা যবভক্ষণ করতো। শস্যনষ্ট হওয়ায় ক্ষেত্রপালের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হত। একদিন ব্যাঘ্রবেশী গর্দভটিকে ক্ষেত্রপাল সনাক্ত করতে সমর্থ হন এবং গর্দভটিকে হত্যা করেন।[৬১]

অনুরূপ একটি আখ্যান *হিতোপদেশের* বিগ্রহবিভাগেও মেলে। সেখানে রজক পালিত গর্দভটিকে শস্যভক্ষণের জন্য অন্যের ক্ষেত্রে রেখে এসেছে এবং গর্দভটি ক্ষেত্রের মালিক

---

[৬০] ক্ষেত্রারামবিবীতেষু গৃহেষু পশুবাটিষু।
গ্রহণং তৎপ্রবিষ্টানাং তাড়নং বা বৃহস্পতিঃ।। কাত্যা.,৬৬৪

[৬১] পঞ্চ.,পৃ.৬৭০

কর্তৃক নিহত হয়েছে।[৬২] আখ্যান দুটিতেই গর্দভটিকে দুষ্ট বলা হয়েছে। ক্ষেত্রের শস্যনাশের জন্য তাকেই দায়ী করা হয়েছে। যার দণ্ডস্বরূপ তার পরিণতি হয়েছে তার মৃত্যু। মালিকই তাকে অন্যের ক্ষেত্রে শস্যভক্ষণে লিপ্ত করেছে তাই শাস্তির দায় কেবল তার নয়। স্মৃতিতে পালিত পশু শস্যনাশ করলে তার দায় মালিককেই নিতে হবে এমন বলা হয়েছে। পশুর দ্বারা পরশস্যনাশে পশুর স্বামীই দণ্ড দেবে। আর যে পরিমাণ শস্য বিনষ্ট হল তাও তাকে দিতে হবে। পশুপালককে ঐ অপরাধের জন্য কেবল তাড়ন করা হবে। মনুও বলেছেন যদি কোনো পশু পথের ধারে বা গ্রামের ধারে যে ক্ষেত আছে তছাড়া অন্য ক্ষেত্রের অনিষ্ট করে বা শস্যভক্ষণ করে তাহলে পশুপালকের সওয়াপণ দণ্ড হবে। কিন্তু সকল স্থানেই ক্ষেত্রের যে শস্যাদির ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের জন্য গবাদি পশুর মালিক ক্ষেত্রের মালিককে উপযুক্ত অর্থ দেবে।[৬৩]

*মিতাক্ষরা*কার এপ্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের বচনের টীকায় নারদের উক্তি উদ্ধৃত করে একটি ভিন্নধর্মী বিধান দিয়েছেন। তাঁর মতে, পশুর দ্বারা ক্ষেত্রের যে পরিমাণ শস্য নষ্ট হয়েছে বলে সামন্তগণ নিরূপণ করবেন সেটি হল ক্ষেত্রফল, তা পশুর স্বামী ক্ষেত্রস্বামীকে দেবে। পালকের জন্য শস্য নষ্ট হলে তাকে তাড়নের পাশাপাশি অর্থদণ্ডও দিতে হবে। পশুস্বামীর দোষে শস্যনাশে তাকেই অর্থদণ্ড দিতে হবে। পশুস্বামীকে কখনই তাড়নাদি করা হবে না। সকল ক্ষেত্রেই পরের শস্যভক্ষণ করে পুষ্ট মহিষী প্রভৃতি দুগ্ধপান করার কারণে ঐ ফল প্রকারান্তরে পশুর স্বামীই ভোগ করেন তাই মধ্যস্থ ক্ষেত্রফলের যে মূল্য নির্ধারণ করবে তাই তাকে দিতে হবে। পশুর ভক্ষণের পরে অবশিষ্ট শস্যও পশুস্বামী গ্রহণ করবে। কারণ মূল্য দেওয়ায় তা প্রায় কেনা হয়ে গেছে। পশুস্বামী ধান্যাদি ফেরৎ দিলেও পলালাদি সেই নেবে।[৬৪] অর্থাৎ শস্যনাশে পশুস্বামী অবশ্যই দণ্ডার্হ।

---

[৬২] হিতো.,পৃ.৮

[৬৩] ক্ষেত্রেষ্বন্যেষু তু পশুঃ সপাদং পণমর্হতি।
সর্বত্র তু সদো দেয়ঃ ক্ষেত্রিকস্যেতি ধারণা।। মনু.,৮.২৪১
তুল. যাবচ্ছস্যং বিনশ্যেত্তু তাবৎ স্যাৎ ক্ষেত্রিণঃ ফলম্।
গোপস্তাভ্যশ্চ গোমী তু পূর্বোক্তং দণ্ডমর্হতি।। যাজ্ঞ.,২.১৬১

[৬৪] মিতা.,২.১৬১

পশুর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে মনু আলোচ্য বিবাদপদটির আলোচনা প্রসঙ্গে পশুদের বিচরণের জন্য গ্রামের ও নগরের চারধারে অনাবাদি জমি রাখতে বলেছেন। যাতে পশু অনায়াসেই সেখানে বিচরণ করতে পারে। এইভাবে স্মৃতিতে ও আখ্যানে পশুস্বামী, পশুপালক, পশু ও ক্ষেত্রস্বামীর স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে এবং তাদের করণীয় বিধি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৭.দত্তাপ্রদানিক বিধি ও নিষেধসমূহ

দত্তাপ্রদানিক প্রকরণটি দানসম্বন্ধিয়। নারদের মতে, অন্যায়ভাবে কোনো বস্তু দান করে তা ফেরৎ নেওয়া – এবিষয়ে যে বিবাদ তাকে বলা হয় দত্তাপ্রদানিক।[৬৫] আবার ন্যায়সঙ্গত পথে দান করে তা প্রত্যর্পণ না করাকে বলে দত্তানপকর্ম। এই দুটি বিষয় নিয়েই বিবাদ হতে পারে। এই দুটিকে একসঙ্গে দানসম্বন্ধীয় বিবাদ প্রকরণ বলে আলোচনা করা যেতে পারে।

এই দান নামক ব্যবহারপদটি চার প্রকার হয়। যথা – দেয়, অদেয়, দত্ত এবং অদত্ত। দেয় হল যা নিষিদ্ধ নয় এবং দান করার যোগ্য। অদেয় হল যা অনিচ্ছা বা নিষেধহেতু দানের অযোগ্য। দত্ত হল সেই বস্তুটি, যা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত এবং যা অব্যবর্তনীয় অর্থাৎ যা আর কোনো দিন ফেরৎ নেওয়া হবে না। অদত্ত হল যা ফেরৎ নেওয়া হতে পারে। ন্যায়ের পথে যা দেওয়া হয় তা সাত প্রকার এবং অদত্ত হল ষোল প্রকার। যথা- পণ্য ক্রয় করে মূল্যবাবদ প্রদত্ত অর্থ, কাজ করিয়ে কাউকে বেতন দেওয়া, কারোর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে কিছু দেওয়া, স্নেহবশতঃ পুত্রকন্যাদিকে অর্থদান, উপকারির উপকার নিমিত্তদান, বিবাহকালে কন্যার জ্ঞাতিদের যা দেওয়া হয় এবং পূজনীয় ব্যক্তিকে ভক্তিভরে যা দেওয়া হয় - এগুলি যথার্থদানের উদাহরণ। অদত্তধন ষোল প্রকার হয় বলে স্মৃতিতে জানা যায়। যথা- ভয়-ক্রোধ-দ্বেষ-শোকাবেগ-রোগবশতঃ প্রদত্ত ধন, উৎকোচরূপে প্রদত্ত ধন, পরিহাসপূর্বক, দানব্যত্যাসরূপে (প্রতিদানরূপে), ছলনাপূর্বক,

---

[৬৫] দত্ত্বা দ্রব্যমসম্যগ্ যঃ পুনাদাতুমিচ্ছতি।

দত্তাপ্রদানিকং নাম ব্যবহারপদং হি তৎ।। নারদ.,৪.১

অপ্রাপ্তবয়স্কদ্বারা প্রদত্ত, মূঢ়, পরাধীন, বিপন্ন, মদ্যপ ও উন্মত্ত অবস্থায় দত্ত, প্রতিকারলাভের আশায় দত্ত- এই ষোল প্রকারভাবে দত্ত ধন অযথার্থ বলে চিহ্নিত হয়েছে।[৬৬]

৭.১.গল্পে গল্পে দত্ত-অদত্তের আলোচনা

আখ্যানগ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন আখ্যান ও উপাখ্যানে দান সম্বন্ধিয় নানা বিধিনিষেধ পাওয়া যায়। এই সকল বিধির উল্লঙ্ঘনকে পাপ-অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* চতুর্বিংশতি উপাখ্যানে প্রতিশ্রুত দ্রব্য দান করাকে পরম কর্তব্য বলা হয়েছে। প্রতিশ্রুত দ্রব্য দান না করলে অধর্ম হয়, পাপ হয় –তাই যা প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তা দান করাই শ্রেয়।[৬৭] এই গ্রন্থের ষোড়শ উপাখ্যানেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেখানে একজন ব্রাহ্মণ নিজের কন্যার বিবাহকালে কন্যার দেহপরিমাণ সুবর্ণ দান করবেন বলে দেবী জগদম্বার নিকটে সংকল্প করেছেন। কিন্তু কন্যার বিবাহসময়ে তার অর্থাভাব থাকায় সে দান করতে অসমর্থ হবে ভেবে তার মন পাপবোধে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তাই সে রাজা বিক্রমাদিত্যের শরণাপন্ন হয়ে দান ভিক্ষা করে পাপ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন। রাজাও যে যা চাইবে তাকে তা দেবেন এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় ব্রাহ্মণকে তার কন্যার দেহপরিমাণ সুবর্ণ দান করেছেন এবং ধর্মের পথে অবিচল থেকেছেন।[৬৮] আখ্যান দুটিতেই দেখা যায় যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দ্রব্য দান না করা অধর্ম। যিনি পূর্বে কোনো কিছু দান করবেন এমন প্রতিজ্ঞা করে যদি তা পূরণ না করেন তাহলে ঐ ব্যক্তির পাপ হয়, যে পাপের ফল তাকে পরলোকে ভোগ করতে হয়। তাই কেউ-ই এমন অধর্মাচরণ করে পাপের ভাগীদার হতে চাননি। রাজা বিক্রমাদিত্য যেহেতু যাচককে তার ঈপ্সিত বস্তু দান করবেন বলে পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছেন তাই নিজের ক্ষতি করেও তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন (১৪তম আখ্যানে)। এর দ্বারাই বোঝা যায় দান বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে তা বাস্তবায়ন আবশ্যক। স্মৃতিতে

---

[৬৬] ...অথ দেয়মদেয়ঞ্চ দত্তং বা দত্তমেব চ। ব্যবহারেষু বিজ্ঞেয়ো দানমার্গশ্চতুর্বিধঃ।। ইতি। তত্র দেয়ম্ ইত্যনিষিদ্ধদানং ক্রিয়াযোগ্যমুচ্যতে।... মিতা.,২.১৭৫

[৬৭] সিংহাসন.,পৃ.৭৪

[৬৮] তদেব.,পৃ.৫৪

দানের বিষয়ে যে ব্যবহারবিধি নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেখানেও একই কথা বলা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, যা দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা দিতে হবে এবং দান করে আবার ফেরৎ নেওয়া উচিত নয়।[৬৯] কাত্যায়নের মতে, প্রতিজ্ঞাত দ্রব্য দান না করলে, কিংবা দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া হলে সেই ব্যক্তি শত কোটি কল্প পর্যন্ত নিম্ন যোনি (জন্ম) প্রাপ্ত হন।[৭০]

গৃহস্থ ব্যক্তির প্রধান কর্তব্য হল পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করা। পরিবার-পরিজনের প্রতিপালন গৃহস্বামী কর্তব্য। যে ব্যক্তি কুটুম্বভরণের ব্যবস্থা না করেই সব ধন দান করে দেয় তাকে দোষী বলে গণ্য করা হবে। স্মৃতিকারগণ কুটুম্বভরণের অসুবিধা না করে দান করতে বলেছেন। কুটুম্বপোষণের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি দান করা যাবে। যদি তা না করা হয় তাকে অপহরণ বলা হয় এবং এই দানে কুটুম্বপোষণ কর্তার দোষ হয়।[৭১] দান প্রসঙ্গে উল্লিখিত পরিবার প্রাপ্তিপালনের ও রক্ষার এই আর্তি তথা নির্দেশ সংস্কৃত আখ্যানগুলিতে মেলে। *পঞ্চতন্ত্রের* অপরীক্ষিতকারকের 'মন্থরকৌলিককথা' ও মিত্রভেদের 'উষ্ট্র-কাক-সিংহ-দ্বীপি-শৃগালাদীনাং কথা'য় পরিবার পরিপালনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যে কোনো উপায়ে পরিবার প্রতিপালন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।[৭২] *কথাসরিৎসাগরের* কথাপীঠ লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গের প্রারম্ভিক অংশে পরিবারের ভরণ-পোষণ যে করে না, আপৎকালে আত্মীয়-পরিজনের কথা মনে রাখে না এমন ব্যক্তিকে নৃশংস বলা হয়েছে।[৭৩] *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* একাদশ সংখ্যক কথায় শত কুকার্য

---

[৬৯] দেয়ং প্রতিশ্রুতং চৈব দত্ত্বা নাপহরেৎ পুনঃ। যাজ্ঞ.,২.১৭৬

[৭০] প্রতিশ্রুতস্যাদানেন দানস্যাচ্ছাদনেন চ।

কল্পকোটিশতং মর্ত্যস্তির্যগ্ যোনৌ চ জায়তে।। কাত্যা.,৬৪৩

[৭১] স্বয়ং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারসুতাদৃতে। যাজ্ঞ.,২.১৭৩

তুল. কুটুম্বভরণাদ্ দ্রব্যং যৎকিঞ্চিদতিরিচ্যতে।

তদ্দেয়মপরহৃত্যান্যৎ কুটুম্বী দোষমাপ্নুয়াৎ।। নারদ.,৪.৬

[৭২] পঞ্চ.,পৃ.৭৫৬,২০২

[৭৩] কথা.,পৃ.৩২

করেও বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী, সন্তান ও পরিবার প্রতিপালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে।[৭৪] *মনুসংহিতায়*ও পরিবার প্রতিপালনের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আখ্যানটির অনুরূপ উক্তি এই স্মৃতিগ্রন্থেও দেখা যায় (মনু.১১/১০)।

স্মৃতিতে দেয়-অদেয় বিভাগ করে কোনটি দানের যোগ্য কোনটি দান নিষিদ্ধ তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। আখ্যানগুলিতে দানবিষয়ক আলোচনায় কিছু দ্রব্যকে দানের অযোগ্য এবং কিছু দানকে শ্রেষ্ঠদান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *বেতালপঞ্চবিংশতির* সপ্তদশ উপাখ্যানে, স্বামী তার স্ত্রীকে দান করতে চাইলে রাজা তাকে এমন শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করা থেকে বিরত করেছেন। যদি রাজা স্ত্রীদান রূপ এমন কার্যকে অনুমোদন করেন তবে তার অপযশ হবে এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭৫] অর্থাৎ যিনি অদেয় বস্তু দান করেন এবং যিনি অদেয় বস্তুর দানে অনুমোদন বা সমর্থন করেন তারা উভয়েই দোষী বলে বিবেচিত হন এবং তাদের অপযশ হয়। এমন কার্য দ্বারা অবিনশ্বর যশঃশরীরের অপক্ষয় কাম্য নয়- তাই রাজা শাস্ত্রেরই অনুসরণ করেছেন। এখানে স্ত্রীদানকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলা হয়েছে – তার স্বপক্ষে প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্যেই মেলে। তাঁর মতে, স্ত্রী-পুত্র এদের কোনো পরিস্থিতিতেই দান করা চলবে না।[৭৬] *পঞ্চতন্ত্রের* মিত্রভেদের 'উষ্ট্র-কাক-সিংহ-দ্বীপি-শৃগালাদীনাং কথা'য় অন্নদান, ভূমিদান, আশ্রয়দান তথা অভয়দানকে শ্রেষ্ঠদান বলা হয়েছে। তন্মধ্যেও অভয়দানকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দানের দ্বারা দান কর্তার স্বসত্ত্বনিবৃত্তিদ্বারা দ্রব্যটিতে দানগ্রহীতার সত্ত্ব উৎপন্ন হয়। তাই যে বস্তুটি দান করা হচ্ছে তা দাতার হওয়া আবশ্যক। যদি তা না হয় তবে দাতা দোষী বলে বিবেচিত হন। নিজের নয় এমন দ্রব্য দান করা অপরাধ, তা *দশকুমারচরিতের* অপহারবর্মাচরিত থেকে জানা যায়। সেখানে অপরের দ্রব্য দানের কথা জানতে পেরে রাজা বিচারালয়ে তার বিচার করে শাস্তি বিধান করেছেন। অর্থপতি একটি চর্মথলিকার মালিক না হয়েও তা দান করেছেন তাই

---

[৭৪] সিংহাসন.,পৃ.৪২

[৭৫] দামোদর ঝা,*বেতালপঞ্চবিংশতি.,*পৃ-১৫৬

[৭৬] স্বয়ং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারসুতাদৃতে। যাজ্ঞ.,২.১৭৩

রাজা তার সর্বস্ব হরণ করে তাকে নির্বাসন দিয়েছেন।[৭৭] রাজা গ্রহীতাকে বিচারালয়ে ডেকে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অদেয় বস্তু দানকারী অর্থপালকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। যা থেকে দান বিষয়ক মামলা নিষ্পত্তির ধরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। অধিকারহীন বস্তু যে অদেয় হয়, তা *দশকুমারচরিতের* সোমদত্তচরিতেও উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে সোমদত্ত নিজের নয় এমন একটি রত্ন একজন বৃদ্ধকে দান করে, রক্ষীপুরুষের দ্বারা ধৃত হয়েছেন। এই কাহিনিতেও একই উপদেশ মেলে।[৭৮] স্মৃতিতে দেয়-অদেয়রূপ উল্লিখিত যে দ্রব্যগুলির তালিকা মেলে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যোগ্য দানের অন্যতম শর্তই হল দাতার ঐ নির্দিষ্ট দ্রব্যে স্বস্বামিত্ব।

আখ্যানে প্রতিজ্ঞাত দ্রব্যের দান আবশ্যক একথা বলার পাশাপাশি যে কোনো প্রকার দানকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এমনকি যাচককে দান না করলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়- এমন উপদেশ শোনা যায়। সেখানে বলা হয়েছে যাচককে না দান করলে ভিক্ষুক হয়ে জন্মাতে হয়। এরূপ সতর্কীকরণ বার্তা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে যথার্থ যাচককে দান করার কথাই বলা হয়েছে।[৭৯]

মনু বলেছেন, কোনো একটি বস্তুর কোনো একটি অংশকে একবারই বিভাগ করতে হবে। সজ্জন ব্যক্তি একবারই কর্ম করে। যাজ্ঞবল্ক্য (২.১৭৫), কাত্যায়ন (৬৩৮) ও নারদ (৭.৩-৫) এরা বলেছেন যা অপরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অন্যকে দেওয়া অনুচিত। এর অন্যথায় বিবাদ সৃষ্টি হয়। ইহার একটি উদাহরণ *বেতালপঞ্চবিংশতির* পঞ্চম উপাখ্যানে দেখা যায়। একই কন্যা দান করার ক্ষেত্রে হরিদাস, তার পুত্র ও তার স্ত্রী তিন জন ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং কে এই কন্যার গ্রহীতা হবে তা নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। আলোচ্য আখ্যানটির শেষেও বেতাল রাজাকে এই বিবাদের সঠিক নিরসন করতে বলেছেন-এরূপ দেখা যায়।[৮০]

---

[৭৭] দশ.,পৃ.৬২

[৭৮] দশ.,পৃ.৩৪

[৭৯] শুক.,পৃ.১২

[৮০] বেতাল.,পৃ.৪৫

কোনো ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে তার কাছে কোনো দ্রব্য রাখা হলে তাকে আমরা সাধারণভাবে গচ্ছিত ধন বলে থাকি। দ্রব্যস্বামী চাইলে তাকে দ্রব্যটি যথোপযুক্তভাবে ফিরিয়ে দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। কখনও দ্রব্যস্বামীকে দ্রব্যটি দিতে অস্বীকার করা হয়, কখনও হীনদ্রব্য প্রত্যর্পণ করা হয়- যা অনুচিত। অপরের কাছে বিশ্বাস করে নিক্ষিপ্ত দ্রব্যকে স্মৃতিশাস্ত্রে নিক্ষেপ বলা হয়েছে এবং এটিকে একটি ব্যবহারপদ রূপেও উল্লেখ করা হয়েছে। *নারদস্মৃতি*তে নিক্ষেপের একটি স্পষ্ট স্বরূপ নির্দেশিত হয়েছে।[৮১] *মিতাক্ষরা*কারের মতে, ধনস্বামী গৃহস্বামীর উপস্থিতিতে তার কাছে কোনো দ্রব্য গচ্ছিত রাখলে তা নিক্ষেপ(মিতা.,২.৬৭)। স্মৃতিতে কাকে বিশ্বাস করে তার কাছে দ্রব্য গচ্ছিত রাখা যায় তা উল্লেখের পাশাপাশি নিক্ষেপ প্রত্যর্পণবিধি, নিক্ষিপ্তদ্রব্য ফেরৎ না দিলে তার শাস্তি এবং কোন কোন সময়ে গচ্ছিত দ্রব্যের রক্ষা কর্তা দ্রব্য প্রত্যর্পণ না করলেও তার শাস্তি হবে না- সে সকল বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। নারদের মতে, যিনি যেভাবে যার কাছে দ্রব্য অর্পণ করবেন, তিনি সেভাবে তার কাছ থেকে ঐ দ্রব্যটি গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ যেমন নিক্ষেপ করা হবে তেমনই গ্রহণ হবে।[৮২]

৮.একটি বিবাদপদরূপে নিক্ষেপ

কোনো ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে তার কাছে কোনো দ্রব্য রাখা হলে তাকে আমরা সাধারণভাবে গচ্ছিত ধন বলে থাকি। দ্রব্যস্বামী চাইলে তাকে দ্রব্যটি যথোপযুক্তভাবে ফিরিয়ে দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। কখনও দ্রব্যস্বামীকে দ্রব্যটি দিতে অস্বীকার করা হয়, কখনও হীন দ্রব্য প্রত্যর্পণ করা হয়- যা অনুচিত। অপরের কাছে বিশ্বাস করে নিক্ষিপ্ত দ্রব্যকে স্মৃতিশাস্ত্রে নিক্ষেপ বলা হয়েছে এবং এটিকে একটি ব্যবহারপদ রূপেও উল্লেখ

---

[৮১] স্বং দ্রব্যং যত্র বিশ্রম্ভান্নিক্ষিপত্যবিশঙ্কিতঃ।
নিক্ষেপো নাম তত্ প্রোক্তং ব্যবহারপদং বুধৈঃ।। নারদ.,৩.১

[৮২] যো যথা নিক্ষিপেদ্ধস্তে যমর্থং যস্য মানবঃ।
স তথৈব গ্রহীতব্যো যথা দাযস্তথা গ্রহঃ।। তদেব, ৩.২

করা হয়েছে। *নারদস্মৃতি*তে নিক্ষেপের একটি স্পষ্ট স্বরূপ নির্দেশিত হয়েছে।[৮৩] *মিতাক্ষরা*কারের মতে, ধনস্বামী গৃহস্বামীর উপস্থিতিতে তার কাছে কোনো দ্রব্য গচ্ছিত রাখলে তা নিক্ষেপ(মিতা.,২.৬৭)। স্মৃতিতে কাকে বিশ্বাস করে তার কাছে দ্রব্য গচ্ছিত রাখা যায় তা উল্লেখের পাশাপাশি নিক্ষেপপ্রত্যর্পণবিধি, নিক্ষিপ্তদ্রব্য ফেরৎ না দিলে তার শাস্তি এবং কোন কোন সময়ে গচ্ছিত দ্রব্যের রক্ষা কর্তা দ্রব্য প্রত্যর্পণ না করলেও তার শাস্তি হবে না- সে সকল বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। নারদের মতে, যিনি যেভাবে যার কাছে দ্রব্য অর্পণ করবেন, তিনি সেভাবে তার কাছ থেকে ঐ দ্রব্যটি গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ যেমন নিক্ষেপ করা হবে তেমনই গ্রহণ হবে।[৮৪]

৮.১.আখ্যানে নিক্ষেপ প্রসঙ্গ

স্মৃতিশাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সংস্কৃত আখ্যান সমূহে নিক্ষেপ বিষয়ক একাধিক নির্দেশিকা মেলে। নিক্ষিপ্ত দ্রব্য প্রত্যর্পণের বিধি আখ্যানেও রয়েছে। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* ত্রিংশৎ আখ্যানে এক ব্যক্তি রাজার কাছে বিশ্বাস করে তার স্ত্রীকে গচ্ছিত রেখে গেছে। পরে ফিরে এসে রাজার কাছে স্ত্রীকে ফেরৎ চাইলে রাজা তার স্ত্রীকে প্রত্যর্পণ করতে অসমর্থ হয়েছেন কারণ তার স্ত্রী পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেছেন। গচ্ছিত ধন প্রত্যর্পণে অসমর্থ হওয়ার রাজা তথা রাজার সভার সকলেই নিজেদের অপরাধী বলে মেনেছেন এবং অপরাধীর ন্যায় তার সামনে নতমস্তকে মৌনভাবে উপস্থিত থেকেছে।[৮৫] সভাসদ সহ রাজার এই অপরাধবোধ একথাই স্পষ্ট করেছে যে, নিক্ষিপ্ত ধন প্রত্যর্পণ সকলেরই কর্তব্য- এমনকি রাজাও এই একই বিধানের আওতাভুক্ত।

আলোচ্য আখ্যানটি থেকে কার কাছে দ্রব্য গচ্ছিত রাখা যায় সেবিষয়েও ইঙ্গিত মেলে। এখানে স্ত্রীকে গচ্ছিত রাখার পূর্বে ঐ ব্যক্তি রাজার কাছে স্ত্রীকে গচ্ছিত রাখার সপক্ষে

---

[৮৩] স্বং দ্রব্যং যত্র বিশ্রম্ভান্নিক্ষিপত্যবিশঙ্কিতঃ।
নিক্ষেপো নাম তত্ প্রোক্তং ব্যবহারপদং বুধৈঃ।। নারদ.,৩.১

[৮৪] যো যথা নিক্ষিপেদ্ধস্তে যমর্থং যস্য মানবঃ।
স তথৈব গ্রহীতব্যো যথা দাযস্তথা গ্রহঃ।। তদেব,৩.২

[৮৫] সিংহাসন.,পৃ.৪৩

একাধিক যুক্তি দেখিয়েছেন। রাজা জিতেন্দ্রিয়, ধার্মিক, বিশ্বাসের পাত্র তিনি পরস্ত্রীদের প্রতি সহোদরের স্ত্রীরূপ আচরণ করেন তাই তার কাছে স্ত্রীকে গচ্ছিত রেখেছেন। গচ্ছিত দ্রব্যের রক্ষাকর্তার চারিত্রিক গুণাবলী এই দিক নির্দেশ স্মৃতিশাস্ত্রেও মেলে। কার কাছে দ্রব্য গচ্ছিত রাখা যায় তার স্পষ্ট উল্লেখ স্মৃতিতে পাওয়া যায়। মনু ও নারদের মতে উত্তমকূলে জাত, সদাচার সম্পন্ন, ধর্মজ্ঞ, সত্যবাদী, মহৎ হৃদয়সম্পন্ন, ধনী ব্যক্তির নিকট নিক্ষেপ দ্রব্য রাখা যায়।[৮৬] অর্থাৎ নিক্ষেপের রক্ষাকর্তার গুণাবলী আখ্যান ও স্মৃতিতে সমানরূপ। গচ্ছিত ধনের রক্ষাকর্তার যোগ্যতার বিষয়ে আখ্যান ও স্মৃতিতে প্রায় একই কথা বলা হয়েছে। ধনী, সজ্জন, উচ্চবংশজাত ব্যক্তির কাছে দ্রব্য গচ্ছিত রাখার যে নির্দেশ স্মৃতিতে মেলে *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* আলোচ্য আখ্যানটিতেও তারই প্রতিফলন দেখা যায়। কারণ ইহ জগতে রাজার ন্যায় চরিত্রবান কে-ই বা হতে পারে। স্থাপক যদি কোনো অযোগ্য, অসৎ ব্যক্তির কাছে নিক্ষেপ দ্রব্য রাখে এবং দ্রব্যটি যথানুপূর্বক ফেরৎ না পায় তবে তার দায় কার হবে ? সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ স্মৃতিতে ও আখ্যানে মেলে না।

মনু, নারদ কার কাছে দ্রব্যাদি গচ্ছিত রাখা যায় তার উল্লেখ করলেও স্থাপক অজ্ঞতাবশতঃ কোনো দুরাচারী ব্যক্তির কাছে নিক্ষেপ রাখলে এবং তার ঐ দ্রব্যটি স্থাপক ফেরৎ না দিলে সেক্ষেত্রে নিক্ষেপ প্রত্যর্পণের বিধি কি হবে ? তার উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ রাজা দুরাচারী রক্ষককে শাস্তি দিয়ে সম্পূর্ণ দ্রব্যই স্থাপককে ফেরৎ দেবেন নাকি তার অজ্ঞতার মাসুল স্বরূপ নিক্ষেপের কিছু অংশ গ্রহণ করে বাকিটা ফেরৎ দেবেন এরূপ নির্দেশও স্মৃতিতে ও আখ্যানে মেলে না। স্মৃতিশাস্ত্রে ও আখ্যানগুলিতে নিক্ষেপের রক্ষাকর্তার বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দ্বারা বোঝা যায় যে, স্মৃতি ও আখ্যান উভয় ক্ষেত্রেই নিক্ষেপকারীকে সতর্ক হয়ে সঠিক লোকের কাছে দ্রব্য গচ্ছিত

---

[৮৬] কুলজে বৃত্তসম্পন্নে ধর্মজ্ঞে সত্যবাদিনি।

মহাপক্ষে ধনিন্যার্যে নিক্ষেপং নিক্ষিপেদ্বুধঃ।। মনু.,৮.১৭৯

তুল. কূলজে বৃত্তসম্পন্নে ধর্মজ্ঞে সত্যবাদিনি।

মহাপদ্যে ধনিন্যার্যে নিক্ষেপং নিক্ষিপেদ্ বুধঃ।। নারদ.,৩.২

রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। *নারদস্মৃতি*তে যে ব্যক্তি নিক্ষেপ প্রত্যর্পণ করেন না কিংবা যে নিক্ষেপ না করেই দ্রব্য ফেরৎ চায় তাদের উভয়কেই চোরের ন্যায় দণ্ড দিতে বলা হয়েছে।[৮৭]

সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যে নিক্ষেপের সম্পর্কে এক অভিনব মতামত পাওয়া যায়। *পঞ্চতন্ত্র*গ্রন্থের মিত্রভেদে নিক্ষেপকে সম্মানজনক ধনোপার্জনের অন্যতম সাধন বলা হয়েছে। বিষ্ণুশর্মার মতে গচ্ছিত দ্রব্য যার কাছে রাখা হয় তিনি ইষ্টদেবতার কাছে প্রার্থনা করেন যাতে স্থাপক কোনোভাবে মারা যান এবং যাতে ঐ নিক্ষিপ্ত দ্রব্যটি তার হয়ে যায়। এই জন্য সে ইষ্টদেবতাকে দেবতার ইপ্সিত বস্তু দ্বারা তুষ্ট করারও অঙ্গীকার করে।[৮৮] অর্থাৎ আখ্যান থেকে নিক্ষেপবিষয়ক প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী স্থাপকের মৃত্যুতে নিক্ষিপ্তদ্রব্য রক্ষাকর্তারই হবে- এমনটাই নিয়ম। এর পাশাপাশি ধনস্বামীর জীবদ্দশাতে তার অনুমতি ছাড়া স্থাপিত দ্রব্য কাউকে দেওয়া অনুচিত এমন নির্দেশও আখ্যানে মেলে। *বেতালপঞ্চবিংশতি*গ্রন্থের পঞ্চদশ উপাখ্যানে ধনস্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যকে দ্রব্য প্রত্যর্পণ করাকে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলা হয়েছে। অন্যের দ্রব্য ফেরৎ না দেওয়া ও স্থাপক ব্যতীত অন্যকে প্রদান করাকে লোকাচার বিরুদ্ধ বলা হয়েছে। এমন দুষ্কর্ম প্রাণান্তেও সম্পাদন করা অনুচিত।[৮৯] এই অপরাধটি দমনের জন্য আখ্যানগুলিতে যেমন দণ্ডবিধি নির্দিষ্ট করা হয়েছে স্মৃতিতেও ঠিক একই প্রয়াস চোখে পড়ে।

স্মৃতিতে অপরের ধন যাচিত হলে তা ফেরৎ না দেওয়া, স্থাপকের বিনা অনুমতিতে অপরকে প্রদান এগুলি অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছে। অপরের বিশ্বাসভঙ্গ ও বঞ্চনার জন্য প্রভূত দণ্ডও বিহিত হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্র*গ্রন্থের মিত্রভেদে 'লৌহতুলা-বণিকপুত্রকথা' গল্পে জীর্ণধন নামক একজন বণিক এক শ্রেষ্ঠীর নিকট তার তুলাদণ্ড নিক্ষেপরূপে রাখেন কিন্তু পরে নিজের দ্রব্যটি ফেরৎ চাইলে শ্রেষ্ঠী তা দিতে অস্বীকার করে। তুলাদণ্ডটি ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে এমন অযৌক্তিক

---

[৮৭] যো নিক্ষেপং নার্পয়তি যশ্চানিক্ষিপ্য যাচতে।
তাবুভৌ চৌরবচ্ছাস্যৌ দণ্ডং দাপ্যৌ চ তৎসমম্।। তদেব,২.১৩

[৮৮] নিক্ষেপে পতিতে হর্মে শ্রেষ্ঠী স্তৌতি স্বদেবতাম্।
নিক্ষেপী ম্রিয়তে তুভ্যং প্রদাস্যামুপযাচিতম্।। পঞ্চ.,পৃ.১৭

[৮৯] বেতাল.,পৃ.১২৮

যুক্তি পেশ করে। তাদের এই বিবাদ বিচারসভায় বিচারকালে রাজা শ্রেষ্ঠীকে দোষী জেনে দ্রব্যটি প্রত্যর্পণের আদেশ দিয়েছেন।[৯০] আলোচ্য আখ্যানটিতে শ্রেষ্ঠী লৌহদ্রব্য প্রত্যর্পণে অস্বীকার করেছে এবং তার স্বপক্ষে একটি অবাস্তব যুক্তি দেখিয়েছে। বাস্তবে অসম্ভব এমন যুক্তি দেখানোর জন্যই তার প্রতারণা ধরা পড়েছে এবং সে দ্রব্য প্রত্যর্পণস্বরূপ দণ্ড দিতে বাধ্য হয়েছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এমন কিছু সময় আছে যে ক্ষেত্রে দ্রব্যরক্ষক স্থাপককে দ্রব্যটি প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য থাকে না। এমনকি রক্ষকের এই অসমর্থতার জন্য সে দণ্ডভাক্‌ও হয় না।

স্মৃতিতে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বিধি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, নিক্ষিপ্ত দ্রব্য রাজা গ্রহণ করলে অথবা দৈববশতঃ নষ্ট হলে বা অজ্ঞাতসারে চোরের দ্বারা অপহৃত হলে ঐ দ্রব্য রক্ষক স্থাপককে প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য থাকবে না। কিন্তু স্থাপক ঐ দ্রব্য ফেরৎ চাইবার পর যদি তা উক্ত কারণগুলির কোনোটির দ্বারা নষ্ট হয় তবে রক্ষক দ্রব্যস্বামীকে ঐ দ্রব্যের মূল্য ফেরৎ দেবে এবং রাজাকেও সমপরিমাণ অর্থ দণ্ডস্বরূপ দেবেন।[৯১] নারদের মতে যদি গচ্ছিত দ্রব্য হারিয়ে যাওয়া কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়ে রক্ষক কোনো কুটিলতা অবলম্বন না করে থাকেন তবে দৈবযোগে কিংবা রাজযোগে নিক্ষিপ্তদ্রব্য নষ্ট হলে ঐ নষ্ট নিক্ষেপকারীর বলেই বিবেচিত হবে।[৯২]

অন্যের বস্তুকে দায়িত্ব সহকারে নিজের দ্রব্যের ন্যায় রক্ষা করা ও তা যাচিত হলে যথাবিধি প্রত্যর্পণ করা অবশ্যই এক মহৎ কর্ম। স্মৃতিতে নিক্ষেপের রক্ষাকারী ব্যক্তি নিক্ষিপ্তদ্রব্য প্রত্যর্পণের বিষয়ে ছলনা করলে তাকে পাপী বলা হয়েছে ও তার এমন কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু যিনি সঠিকভাবে অন্যের বস্তু রক্ষা করেন তাকে পুণ্যবান বলা হয়েছে। আখ্যানেও একই প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। সেখানে গচ্ছিত ধন রক্ষা করাকে রাজাও পরম কর্তব্য বলে মনে

---

[৯০] পঞ্চ.,পৃ-২৯৬

[৯১] ন দাপ্যোঽপহৃতং তন্তু রাজদৈবিকতস্করৈঃ।

ভেষশ্চেন্ মার্গিতেঽদত্তে দাপ্যো দণ্ডং চ তৎসমম্।। যাজ্ঞ.,২.৬৬

[৯২] গৃহীতুঃ সহ যোঽর্থেন নষ্টো নষ্টঃ স দায়িনঃ।

দৈবরাজকৃতে তদ্বদত্র চেত্তজ্জিহ্মকারিতম্।। নারদ.,৩.৯

করেছেন। অন্যের গচ্ছিত ধন যথানুপূর্বক প্রত্যর্পণ না করলে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হতে হয় এমন উল্লেখও দেখা যায়।[৯৩]

'দুঃখং ন্যাসস্য রক্ষণম্' অর্থাৎ পরের দ্রব্য রক্ষা করা অত্যন্ত দুঃখজনক- তাই যিনি এমন কাজ করেন তিনি সম্মানের দাবিদার। রক্ষাকর্তা সম্মানের বিষয়টি মনুর একটি বচনে সর্বাধিকভাবে বোঝা যায়। তাঁর মতে, রাজা নিক্ষেপ সম্বন্ধিয় বিচারকালে এমনভাবে বিচার করবেন যাতে নিক্ষেপধারী ব্যক্তি কোনোভাবেই উৎপীড়িত না হন।[৯৪] অর্থাৎ স্থাপককে দ্রব্য পায়িয়ে দেওয়া যেমন রাজার কর্তব্য তেমনি স্থাপকের স্বার্থ ও সম্মানরক্ষাও রাজার কর্তব্য।

---

[৯৩] বেতাল.,পৃ-১২৯-১৩১

[৯৪] নিক্ষিপ্তস্য ধনস্যৈবং প্রীত্যোপনিহিতস্য চ।

রাজা বিনির্ণযং কুর্যাদক্ষিণ্বন্ ন্যাসধারিণম্।। মনু.,৮.১৯৬

পঞ্চম অধ্যায়

হিংসামূলক বিবাদপ্রসঙ্গ শাস্ত্র ও আখ্যানসাহিত্যে

পঞ্চম অধ্যায়

হিংসামূলক বিবাদপ্রসঙ্গ শাস্ত্র ও আখ্যানসাহিত্যে

১.বাকপারুষ্য

মানুষের প্রতি মানুষের আচরণ প্রীতিপূর্ণ হওয়া উচিত । কিন্তু অনেক সময় তার ব্যতিক্রম দেখা যায় । একে অপরের প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করে তার মনোবেদনা সৃষ্টি করে । এধরণের অশোভন বা অশালীন আচরণকেই স্মৃতিশাস্ত্রে বাকপারুষ্য বলা হয়েছে । হিংসামূলক এই বিবাদটিকে সাহসের একটি ভেদ বলে স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে । বাকপারুষ্য এই শব্দটির অর্থ প্রসঙ্গে অভিধানে abusive words, insulting , using scurrilous language ইত্যাদি বলা হয়েছে ।[১] অর্থাৎ কাউকে অপমান করা বা কটূশব্দ বলে আঘাত করাকে বাকপারুষ্য বলে। সংহিতাগ্রন্থাবলীতে, নিবন্ধগ্রন্থে বাকপারুষ্য বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। সেখানে বাকপারুষ্যের সংজ্ঞা, প্রকার ভেদ, দণ্ডবিধান প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মতামত দেখা যায়।

বাকপারুষ্যের লক্ষণঃ

স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ নানাভাবে বাকপারুষ্য বিবাদপদটির লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। নারদ বলেছেন – কোনো ব্যক্তির দেশ, জাতি, কুল ইত্যাদি সম্পর্কে উচ্চস্বরে কোনো অশালীন মন্তব্য বা, যার দ্বারা ওই ব্যক্তির মানসিক কষ্টের উদ্রেক হয় তাকেই বাকপারুষ্য বলে ।[২] কাত্যায়নের মতে, কারো সামনে হুংকার করা, কাশা অথবা এমন করে কাউকে অনুকরণ করা যাকে গর্হিত বলা যায় তা-ই বাক্পারুষ্য বলা হয়।[৩] বৃহস্পতি যে কোনো প্রকার অপ্রিয় উক্তিকেই বাকপারুষ্য বলেছেন।

---

[১] মনিয়ার উইলিয়াম্, *স্যাঙ্সকৃট ইংলিশ ডিক্সনারী,* পৃ.৭৫৮

[২] দেশজাতিকুলাদীনামাক্রোশন্যঙ্গসংযুতমিতি ।
যদ্বচঃ প্রতিকূলার্থং বাকপারুষ্যং তদুচ্যতে।। নারদ., ১৫.১

[৩] হুংকারং কাসনং চৈব লোকে যচ্চ বিগর্হিতম্।
অনুকুর্যাদনুব্রুয়াদ্ বাকপারুষ্যং তদুচ্যতে।। কাত্যা.,৭৬৬

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বাকপারুষ্যের দণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করলেও বাকপারুষ্যের লক্ষণ বিষয়ে কিছু বলেননি।

যাজ্ঞবল্ক্য আলোচ্য বিবাদপদটির লক্ষণ নির্ণয় করলেও টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য এক্ষেত্রে নারদের মত (১৫/১) অনুসরণে বাক্পারুষ্যের লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। নারদোক্ত মতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি 'আক্রোশ' বলতে উচ্চস্বরে ভাষণকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, 'ন্যঙ্গম্' কথার অর্থ হল অকথনীয় উক্তি। অর্থাৎ অন্যের উদ্দেশ্যে করা প্রতিকূলবাক্য যা উদ্বেগ সৃষ্টি করে তাই বাকপারুষ্য।[৪] নারদ দেশ, জাতি, কুল বিষয়ে আক্রোশপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করাকে বাকপারুষ্য বললেও দেশ-জাতি-কুল সম্পর্কিত আক্রোশপূর্ণ বাক্য বলতে কী বোঝায় তা বলেননি। টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর তাঁর *মিতাক্ষরা* টীকায় দেশ,জাতি,কুল বিষয়ে আক্রোশপূর্ণ বাক্য বলতে কী বোঝায় তা উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন। তাঁর মতে, গৌড়দেশের বাসিন্দারা কলহপ্রবণ-এইরূপ বাক্য দেশবিষয়ক, ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত লোভী- এরূপ বাক্য জাতিবিষয়ক, বৈশ্বামিত্র কুলের ব্যক্তিরা ক্রূরচরিত্র হয়- এরূপ বাক্য কুলের প্রতি আক্রোশপূর্ণ বাক্যের উদাহরণ।[৫] নারদের বচনের 'কুলাদি'পদের 'আদি'শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টীকাকার বলেছেন- কেবল দেশ-জাতি-কুল সম্পর্কে আক্রোশপূর্ণ বাক্যই নয়, কারো বিদ্যা, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে নিন্দাজনক বাক্য বলাও বাকপারুষ্যের অন্তর্ভুক্ত।[৬]

বাকপারুষ্যের প্রকারভেদঃ-

নারদের মতে বাকপারুষ্য তিন প্রকার- নিষ্ঠুর, অশ্লীল এবং তীব্র। তাঁর মতে, কাউকে আক্ষেপপূর্ণ বাক্য বলা হল নিষ্ঠুর, অপশব্দ বা অকথনীয় কোনো বাক্য প্রয়োগ করা হল

---

[৪] উচ্চৈর্ভাষণমাক্রোশঃ ন্যঙ্গমবদ্যং তদুভয়যুক্তং যৎপ্রতিকূলার্থং উদ্বেগজননার্থং বাক্যং তদ্ বাকপারুষ্যং কথ্যতে। মিতা., ২.২০৭

[৫] তত্র 'কলহপ্রিয়াঃ খলু গৌড়াঃ' ইতি দেশাক্রোশঃ। 'নিতান্তং লোলুপাঃ খলু বিপ্রাঃ' ইতি জাত্যাক্রোশঃ।'ক্রূরচরিতা ননু বৈশ্বামিত্রা' ইতি কুলাক্ষেপঃ। তদেব,২.২০৭

[৬] আদিগ্রহণাত্ স্ববিদ্যাশিল্পাদিনিন্দয়া বিদ্বচ্ছিল্পাদিপুরুষাক্ষেপো গৃহ্যতে। তদেব,২.২০৪

অশ্লীল এবং তীব্র বলতে বোঝায় কাউকে মহাপাতক ইত্যাদি বলে আক্রোশ প্রকাশ।[৭] *বৃহস্পতিস্মৃতি*তেও বাকপারুষ্যকে তিনপ্রকার বলা হয়েছে, তবে সেখানে বাকপারুষ্যের প্রকারগুলি ভিন্ন। বৃহস্পতির মতে, কারো দেশ-জাতি-কুল বিষয়ে খারাপ উক্তি করা, কারো বিরুদ্ধে সে পাপকর্মে যুক্ত- এরূপ মিথ্যা আরোপ করা হল প্রথম প্রকার বাকপারুষ্য।[৮] কারো মা, বোনের সম্পন্ধে অশ্লীল কথা বলা হল মধ্যম প্রকার বাকপারুষ্য।[৯] যা অভক্ষণীয়, যে দ্রব্যাদি পান নিষিদ্ধ তা কোনো ব্যক্তি ভক্ষণ কিংবা পান করেছে, তার প্রতি এরূপ আরোপ করা, কারও প্রতি মহাপাতক এইরূপ উক্তি করা হল তীব্র বাকপারুষ্য।[১০]

মনু বাকপারুষ্যের প্রকারভেদ সম্পর্কে কিছু না বললেও ভাষ্যকার মেধাতিথি মনুভাষ্যে চার প্রকার বাকপারুষ্যের কথা বলেছেন। প্রথমটি হল নিষ্ঠুর বা অশ্লীল কথা বলে কাউকে আঘাত করা। কাউকে বিনা কারণে অভিশাপ দেওয়া হল দ্বিতীয় প্রকার বাকপারুষ্য। কাউকে 'তোমার কন্যা গর্ভবতী' এরূপ মিথ্যা কথা বলে অপমান করা হল তৃতীয় প্রকার বাকপারুষ্য। গুরুতর কিংবা সাধারণ কোনো অপরাধের আরোপ করে পাতক-উপপাতক বলে মানহানি করা হল চতুর্থ প্রকার বাকপারুষ্য।[১১] *মিতাক্ষরা*কার বিজ্ঞানেশ্বর নারদকে অনুসরণ করে তিনপ্রকার বাকপারুষ্য উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নারদের বাকপারুষ্য প্রকারভেদ সম্বন্ধিয়

---

[৭] নিষ্ঠুরাশ্লীলতীব্রত্বাত্তদপি ত্রিবিধং স্মৃতম্ ।

.....

সাক্ষেপং নিষ্ঠুরং জ্ঞেযমশ্লীলং ন্যঙ্গসংযুতম্।

পাতনীয়েরূপাক্রোশৈস্তীব্রমাহুর্মনীষিণঃ।। নারদ.,১৫.২-৩

[৮] দেশধর্মকুলাদীনাং ক্ষেপঃ পাপেন যোজনম্।

দ্রব্যং বিনা তু প্রথমং বাকপারুষ্যং তদুচ্যতে।। বৃহ.,২০.২

[৯] ভগিনীভ্রাতৃসম্বন্ধমুপপাতকশংসনম্।

পারুষ্যং মধ্যমং প্রোক্তং বাচিকং শাস্ত্রবেদিভিঃ।। তদেব,২০.৩

[১০] অভক্ষাপেয়কথং মহাতকশংসনম্।

পারুষ্যং তীব্রং প্রোক্তং বাচিকং শাস্ত্রবেদিভিঃ।। তদেব,২০.৪

[১১] পুরুষবচনমাক্রোশঃ। স চ বহুধা নৃশংসাশ্লীলভাষণান্মর্মণিতোদঃ। অভিশাপঃ 'অকরণহন্তা বৃষলভূয়া' । অসত্ উপন্যসনং 'কন্যা তে গর্ভিণোতি' । পাতকোপপাতকৈর্যাজনমিতি। মনুভা.,৮.২৬৭

শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন এবং নারদোক্ত 'নিষ্ঠুর' 'অশ্লীল' এবং 'তীব্র' এই তিন প্রকার বাকপারুষ্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে কাউকে ধিক্, মূর্খ- এই সকল কথা বলা হল সাক্ষেপ এবং এজাতীয় বাক্য নিষ্ঠুর বলে গণ্য। তোমার ভগিনীর প্রতি গমন করব- এইরূপ অকথনীয় অশোভনীয় কথা বলা হল ন্যঙ্গ এবং এরূপ বাক্য হল অশ্লীল বাকপারুষ্যের উদাহরণ। তুমি মদ্যপান করেছ – কাউকে এইরূপ বলে মহাপাতকাদি দোষে দুষ্ট করে আক্রোশ প্রকাশ করা হল তীব্র বাকপারুষ্য।[১২]

বাকপারুষ্যের দণ্ডবিধান

মনুর মতে ব্রাহ্মণকে গালাগালির অপরাধে ক্ষত্রিয়ের একশতপণ দণ্ড, বৈশ্যের দেড়শতপণ দণ্ড হবে এবং শূদ্র শারীরিক দণ্ড পাবে।[১৩] বিষ্ণু বলেছেন, শূদ্র যে অঙ্গদ্বারা উচ্চবর্ণের প্রতি অপরাধ করবে তার সেই অঙ্গের ছেদন করা হবে। থুথু দিলে ওষ্ঠাধর ছেদন করা হবে। বাতকর্ম করলে মলদ্বার ছেদন করা হবে। নারদ অবশ্য বাকপারুষ্যকারী শূদ্রের অঙ্গচ্ছেদন রূপ দণ্ডের কথা বলেননি। তাঁর মতে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে অপমানিত করলে একশতপণ দণ্ড দেবে, বৈশ্য সার্ধশতপণ দণ্ড দেবে এবং শূদ্র ব্রাহ্মণকে অপমানিত করলে তার বধদণ্ড হবে।[১৪] মনু ব্রাহ্মণের প্রতি বাকপারুষ্যকারী শূদ্রের দুই প্রকার দণ্ডের বিধান দিয়েছেন। তাঁর মতে, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে অপমান করে তবে তার শারীরিক দণ্ড হবে, কিন্তু যদি সে ব্রাহ্মণের নাম-জাতি উল্লেখপূর্বক গালি দেয় তবে তার মুখ দশ আঙ্গুল পরিমাণ লম্বা জ্বলন্ত লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।[১৫] মনু,

---

[১২] তত্র ধিঙ্ মূর্খ জাল্ম ইত্যাদি সাক্ষেপম্। অত্র ন্যঙ্গম্ ইত্যসভ্যম্ অবদ্যং ভগিন্যাদিগমনম্ তদযুক্তম্ অশ্লীলম্। সুরাপোহসি ইত্যাদিমহাপাতকাদ্যাক্রোশৈঃ যুক্তং বচঃ তীব্রম্। মিতা.,২.২০৮

[১৩] শতং ব্রাহ্মণমাক্রোশ্য ক্ষত্রিয়দণ্ডমর্হতি।
বৈশ্যহপ্যর্দ্ধশতং দ্বে বা শূদ্রস্তু বর্ধমর্হতি।। মনু., ৮.২৬৮

[১৪] শতং ব্রাহ্মণমাক্রোশ্য ক্ষত্রিয়দণ্ডমর্হতি।
বৈশ্যহধ্যর্ধং শতং দ্বে বা শূদ্রস্তু বধমর্হতি।। নারদ.,১৫.১৫

[১৫] নামজাতিগ্রহণং ত্বেষামভিদ্রোহেণ কুর্বতঃ।
নিক্ষেপ্যোহয়োময়ঃ শংকুজ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ।। মনু.,৮.২৭

বিষ্ণু, নারদ প্রমুখ শাস্ত্রকারগণ দ্বিজাতির প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগকারী শূদ্রের শারীরিক দণ্ডের বিধান দিলেও বৃহস্পতি বাকপারুষ্যকারী শূদ্রের অর্থদণ্ডের বিধান দিয়েছেন। তাঁর মতে, শূদ্র বৈশ্যকে অপমান করলে প্রথম সাহস দণ্ড দেবে, ক্ষত্রিয় অপমান করলে মধ্যম সাহস দণ্ড দেবে, ব্রাহ্মণকে অপমান করলে উত্তম সাহস দণ্ড দেবে।[১৬] মনু শুধু ব্রাহ্মণকে অপমান বা নাম-জাতি তুলে গালি দেওয়ার জন্যই নয়, ব্রাহ্মণকে ধর্ম বিষয়ে উপদেশকারী শূদ্রেরও দণ্ডবিধান করেছেন। তাঁর মতে, শূদ্র যদি দর্পের সাথে ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ দেয় তবে তার মুখে ও কানে গরম তেল ঢেলে দেওয়া হবে।[১৭] সংহিতাগ্রন্থসমূহে উচ্চবর্ণের প্রতি নিম্নবর্ণের ব্যক্তির অপব্যবহারের জন্য দণ্ডবিধানের পাশাপাশি উচ্চবর্ণের ব্যক্তি যদি অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের প্রতি কোনো অসম্মানজনক আচরণ করে তবে তার শাস্তিও বর্ণিত হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে পরুষবাক্য বলে তবে তার যথাক্রমে পঞ্চাশ পণ, পঁচিশ পণ ও সাড়ে বারো পণ দণ্ড হবে। ব্রাহ্মণ কর্তৃক অন্য তিন বর্ণের প্রতি অপব্যবহারের দণ্ড প্রসঙ্গে *মনুস্মৃতি* ও *নারদস্মৃতি*তে একই পরিমাণ দণ্ড বিহিত হয়েছে।[১৮] বিষ্ণু নিম্নবর্ণসমূহের প্রতি অসদাচরণের ক্ষেত্রে বর্ণানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ দণ্ডবিধান করেননি। তিনি বলেছেন, যে কোনো বর্ণের ব্যক্তি হীনবর্ণের প্রতি অন্যায্য আচরণ করলে ছয় পণ দণ্ড দেবে।

বিষ্ণু শূদ্রের ব্রাহ্মণের সাথে অপব্যবহারের পাশাপাশি একাসনে বসাকেও দণ্ডনীয় অপরাধ বলেছেন এবং বাকপারুষ্যের আলোচনায় তার উল্লেখ ও করেছেন।[১৯] বেশিরভাগ

---

[১৬] বৈশ্যমাক্ষারয়ন্শূদ্রো দাপ্য স্যাত্ প্রথমং দমম্।
ক্ষত্রিয়ং মধ্যমং চৈব বিপ্রমুত্তমসাহসম্।। বৃহ.,২০.১৫

[১৭] ধর্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রানামস্য কুর্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েত্ তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ।। মনু.,৮.২৭২

[১৮] পঞ্চাশদ্ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যে স্যাদর্দ্ধপঞ্চাশচ্ছূদ্রে দ্বাদশকোদমঃ।। তদেব,৮.২৬৮
তুলঃ পঞ্চাশদ্ ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যে স্যাদর্দ্ধপঞ্চাশচ্ছুদ্রে দ্বাদশকোদমঃ।। নারদ.,১৫.১৫

[১৯] একাসনোপবেশী কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্বাস্যঃ। বি.ধ.সূ.,৫.২০

সংহিতাগ্রন্থেই দণ্ড বিধান প্রসঙ্গে বর্ণব্যবস্থার অনুসরণ করে দণ্ডের পরিমাণের আধিক্য নূন্যতা প্রতিপাদিত হয়েছে। যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করা হয়েছে তার বর্ণগত অবস্থানের ভিত্তিতে দণ্ড বিহিত হয়েছে। এবিষয়ে একমাত্র *বিষ্ণুধর্মসূত্রে* ভিন্নরূপ দণ্ডবিধান দেখা যায়। তিনি অপরাধী ব্যক্তির গুণের ভিত্তিতে দণ্ডবিধান করেছেন। তিনি অপরাধী গুণসম্পন্ন হলে তার তিনপণ দণ্ডের বিধান দিয়েছেন এবং গুণহীন হলে ছয় পণ দণ্ডের বিধান দিয়েছেন। দণ্ড বিধানের ক্ষেত্রে এইরূপ বিশেষ দৃষ্টভঙ্গি *মনুভাষ্য*কার মেধাতিথিরও দেখা যায়। তিনি দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে বাকপারুষ্যে আহত ব্যক্তির বর্ণগত অবস্থানকেই গুরুত্ব দেননি তার সামাজিক অবস্থানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি সমান বর্ণের বিত্তবান ব্যক্তিকে গালি দেওয়ার অপরাধে সমবর্ণের সাধারণ ব্যক্তিকে গালি দিলে যা দণ্ড হয় তার দ্বিগুণ দণ্ড বিহিত করেছেন এবং ওই বিত্তবান ব্যক্তি যদি অধিক বন্ধুসম্পন্ন হয় তবে তিনগুণ দণ্ডের বিধান দিয়েছেন।[২০] মনু দণ্ডের যে বিধানটি সমবর্ণের ব্যক্তির সাথে অপব্যবহারের করেছেন মেধাতিথি দণ্ডের সেই নিয়মটিকে কেবল বর্ণগতভাবে সমান স্থানীয় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত করেননি তিনি বর্ণগত সাম্যের পাশাপাশি বিত্তগত দিক দিয়ে যারা সমানস্থানীয়, যারা একই কর্মে নিরত, যারা বিদ্যাগত দিক দিয়ে সমান স্থানীয় তাদের ক্ষেত্রে একই দণ্ডের বিধান দিয়েছেন।

বৃহস্পতি কারো ভগিনী, মাতাকে উদ্দেশ্য করে বলা খারাপ কথাকে মধ্যম প্রকার বাকপারুষ্য বলেছেন কিন্তু কেউ এইরূপ কথা বললে তার কি দণ্ড হবে সে সম্পর্কে কিছু বলেনি। মনু কারো ভগিনী মাতাকে উদ্দেশ্য করে কাউকে খারাপ কথা বলা হলে তার দণ্ড কি হবে সে সম্পর্কে কিছুই বলেননি। অন্যান্য সংহিতাকারগণের প্রায় সকলেই কারো ভগিনী, মাতা কে উদ্দেশ্য করে খারাপ কথা বলার দণ্ড বিষয়ে আলোচনা করলেও সেখানে তারা স্ত্রী জাতিকে কেউ খারাপ কথা বললে কী দণ্ড হবে তা বলেননি। কেবলমাত্র যাজ্ঞবল্ক্য পরস্ত্রীকে গালি দিলে পূর্বের দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড অর্থাৎ পঞ্চাশ পণ দণ্ড দিতে বলেছেন।[২১] তবে মেয়েদের কেউ খারাপ কথা বললে, তাদের সাথে অপব্যবহার করলে কি শাস্তি হবে সে প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা বাকপারুষ্য শীর্ষক

---

[২০] তত্র সমানজাতীয়ে বিত্তাধিকে দ্বিগুণং-তস্মিন্নেব বন্ধুত্বাধিকে ত্রিগুণং-যাবত্ সর্বগুণে নির্গুণস্য ষডগুণম্। মনু., ৮.২৬৯

[২১] অর্ধোঽধমেষু দ্বিগুণঃ পরস্ত্রীষূত্তমেষু। যাজ্ঞ., ২.২০৬

আলোচনায় দেখা যায় না। তবে কি সে সময়ে মেয়েদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করা হত না? এই প্রশ্নের উত্তরে কটূক্তি করা হত না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না কারণ সাহসের যে আলোচনা শাস্ত্রকারগণ করেছেন, সেখানে তারা পরস্ত্রীকে অভিমর্শন, বলপূর্বক গোপনে স্ত্রীগমনের দণ্ড বিধান করেছেন। তাই যে সমাজে স্ত্রীজাতিকে এইসকল অপরাধের শিকার হতে হত সেখানে নারীকে কটূক্তি ও অপব্যবহারের শিকার হতে হত না এমনটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে কেন বাকপারুষ্যের আলোচনায় সংহিতাকারগণ, টীকাকারগণ, ভাষ্যকারগণ এবিষয়ে আলোচনা করেননি তার যুক্তিসঙ্গত কারণ চির অন্ধকারে রয়ে গেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য, মনু কাউকে কষ্ট দিয়ে বলা সত্য কথাকেও বাকপারুষ্য বলেছেন এবং দণ্ড বিধান করেছেন। তবে বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন এবিষয়ে ভিন্নধর্মী দণ্ডের বিধান করেছেন। বৃহস্পতি সত্য উক্তিকে বাকপারুষ্য বলেননি। তবে তিনি অসাধু ব্যক্তির প্রসঙ্গেই কথাটি বলেছেন। তার মতে পতিত ব্যক্তিকে পতিত বলা হলে, চোরকে চোর বলা হলে কোনো দণ্ড হবে না।[২২] অসৎ সংসর্গেও পাপ বৃদ্ধি হয় তাই অসৎ সংসর্গ অবশ্যই পরিত্যজ্য। কাত্যায়ন বলেছেন অসৎ ব্যক্তির সংসর্গ পরিহার করার জন্য। যদি কোনো দোষ কীর্তন করা হয় তবে তা দোষের হবে না।[২৩] টীকাকার ভাষ্যকারদের মধ্যে একমাত্র মেধাতিথি শূদ্রের দণ্ডবিধান প্রসঙ্গে তার জন্মের প্রসঙ্গটি এনে তার অধিক দণ্ড প্রাপ্তির বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বর্ণসংকর জাতিকে খুব সুন্দরভাবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রতিপন্ন করেছেন। *মিতাক্ষরা*কার বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য অপরকে উপহাস করে কোনো কথা বলাকেও বাকপারুষ্য বলেছেন- এমন বিধান শাস্ত্রে অন্যত্র চোখে পড়ে না। সংহিতাকারগণ টীকাকারগণ ও ভাষ্যকারগণ সকলেই শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। সকলেরই আলোচনায় শারীরিকভাবে অক্ষম এই ব্যক্তিদের কষ্টপ্রদানকারী ব্যক্তির দণ্ড বিধান করা হয়েছে।

---

[২২] পতিতং পতিতেত্যুক্ত্বা চোরং চোরেতি বা পুনঃ বচনাত্ ন দোষো স্যাত্। বৃহ.,২০.৯

[২৩] যত্র স্যাত্ পরিহারার্থং পতিতস্তেন কীর্তনম্।
বচনাত্তত্র ন স্যাত্তু দোষো যত্র বিভাবয়েত্।। কাত্যা.,৭৭৫

১.১.আখ্যানসাহিত্যে বাকপারুষ্য

স্মৃতিশাস্ত্রের ন্যায় আখ্যানগ্রন্থগুলিতেও কটূকথা বলে কিংবা কুব্যবহার দ্বারা অপর ব্যক্তির মনে আঘাত দেওয়াকে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলে মানা হয়েছে। বিভিন্ন কাহিনির দ্বারা এমন আচরণের কুপ্রভাব তুলে ধরার পাশাপাশি এমন আচরণকারীকে ভৎর্সনা করে, তা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। স্মৃতির ন্যায় কঠোর দণ্ডবিধান দৃষ্ট না হলেও অপরের মনে কষ্ট উদ্রেক করাকে অপরাধরূপেই উল্লেখ করা হয়েছে। যে বাক্য অপ্রীতিকর, অনিষ্টকর, অযথাযথ এমন বাক্য কারোর থেকেই শোনা উচিত নয়। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* চতুর্থ উপাখ্যানে অপুত্রক ব্রাহ্মণ দম্পতির কথোপকথনের সময় এরূপ উপদেশই পাওয়া যায়। সেখানে ব্রাহ্মণ তার স্ত্রীকে বলেছেন- যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয় বাক্য বালক কর্তৃক উক্ত হলেও তা গ্রহণীয় কিন্তু যা যুক্তিযুক্ত নয় কষ্টদায়ক এমন বাক্য বৃদ্ধের নিকট হতেও শ্রবণ করা উচিত নয়।

পত্নী, মাতা কিংবা গৃহের কোনো স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে অপশব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আখ্যান উপাখ্যানগুলিতেও মেলে। এখানেও দুষ্কর্মকারী ব্যক্তিকে এমন কার্য থেকে বিরত থাকার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *বেতালপঞ্চবিংশতি* গ্রন্থটির প্রথম উপাখ্যানে রাজকুমারের বন্ধু অমাত্যপুত্র দ্বারা রাজকুমারে স্ত্রী পদ্মাবতীর স্বরূপ প্রকাশ প্রসঙ্গে অমাত্যপুত্র পদ্মাবতীর সম্পর্কে ‘স্বৈরিণী’ এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করতে দেখা যায়। নিজের স্ত্রী সম্পর্কে এমন শব্দ শ্রবণমাত্রই রাজকুমার তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং নিজের পরমপ্রিয় বন্ধুকেও ভৎর্সনা করতে ছাড়েনি। স্পষ্টভাষায় তাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যথাবিধি তিনি যার পাণিগ্রহণ করেছেন তার সম্পর্কে এমন উক্তি ন্যায়ানুগত নয়। রাজকুমারের এমন উক্তি দ্বারা সহজেই বোঝা যায় যে ন্যায়ালয়ের নিয়মে এমন কার্য নিষিদ্ধ। স্মৃতিতে উল্লিখিত দণ্ডবিধান তারই প্রমাণ।

স্মৃতিতে বর্ণশ্রেষ্ট ব্রাহ্মণকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণকে নীচজাতির কেউ কটূকথা বলে আঘাত করলে এমনকি একাসনে বসলেও তার জন্য সর্বোচ্চ দণ্ড বিহিত হয়েছে। স্মৃতিতে বাক্যদ্বারা আঘাতকারীর দণ্ডবিধানের পাশাপাশি কারোর সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দেওয়াকেও বাকপারুষ্যের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। স্মৃতিকারগণকর্তৃক বাকপারুষ্যের যে প্রকারভেদ করা হয়েছে সেখানেই তা উল্লিখিত হয়েছে। সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যে ব্রাহ্মণকে সমাজের

সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হলেও গুরু, সাধু, মহাজন বা সজ্জন ব্যক্তিকেও একই স্থান দেওয়া হযেছে, এমনকি কোথাও কোথাও আবার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে। আখ্যানে কেবল কটূকথা দ্বারা আঘাত দেওয়া কিংবা অপবাদ দেওয়াকেই নয় এসকল ব্যক্তির নিন্দা করাকেও গর্হিত কর্ম বলা হয়েছে। এমন কার্যকারী ব্যক্তিকে তার কার্যের জন্য করুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে- তা কাহিনির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

হিতোপদেশের 'সন্ধি'শীর্ষক বিভাগের অষ্টম কথায় ব্রাহ্মণের নিন্দাকারী ব্যক্তির প্রভূত নিন্দা করা হয়েছে। এমন কার্য যে ব্যক্তি করে সে সমাজে অন্যব্যক্তিদের সান্নিধ্য তথা সদ্ভাব পাবার যোগ্য নয়- এই তার দণ্ড। ব্রাহ্মণের নিন্দাকারী ব্যক্তির সঙ্গে রাজাকেও সন্ধি করতে নিষেধ করা হয়েছে।[২৪] *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা* গ্রন্থটির ত্রয়োদশ উপাখ্যানে আবার কিছুটা ভিন্নরূপ দণ্ডবিধান চোখে পড়ে। সেখানে এক ব্রাহ্মণ সর্বদা গুরু, সাধু ও মহাজনদের নিন্দা করার জন্য তাকে দশসহস্র বৎসর ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে অতিদুঃখে দিন কাটাতে হয়েছে। ব্রাহ্মণ নিজেই রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে নিজের অপরাধের সম্পর্কে অকপট স্বীকারোক্তি করেছে। এই সকল সজ্জন-সম্মানীয় ব্যক্তিদের নিন্দা করায় সে পাপ করেছে তাই-ই তাকে দণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে।[২৫]

হিতোপদেশোক্ত উপাখ্যানটির দুটি বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। প্রথমটি হল, সম্মাননীয় ব্যক্তির নিন্দা নিঃসন্দেহে এক গুরুতর অপরাধ যার দণ্ড নিন্দাকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই পেতে হবে। দ্বিতীয়ত, সজ্জন ব্যক্তির নিন্দাকারী ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণও হন তবে তিনিও দণ্ডভোগ করবেন। এখানে সমাজের সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থানাধিকারী বর্ণশ্রেষ্ট ব্রাহ্মণের দণ্ডবিধান বা শাস্তিভোগের কথা উল্লিখিত হওয়ায়, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর সকলকেই যে এমন কার্যের জন্য শাস্তিভোগ করতে হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই একই নিয়ম স্বামী-স্ত্রীসম্পর্কের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে। স্ত্রী স্বামীর সম্পর্কে কোনো কটূকথা কিংবা নিন্দাজনক বাক্য কারো কাছে উচ্চারণ করবে না। *বেতালপঞ্চবিংশতির* তৃতীয় উপাখ্যানে এভাবেই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার কেমন হবে তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। স্বামী তার কাছে সজ্জন ব্যক্তির তুল্য সম্মাননীয়। তাই

---

[২৪] সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, হিতো.,পৃ.৩৪

[২৫] মলয়েন্দ্র কুমার সেন,সিংহাসন.,পৃ.৪৯

পতিনিন্দা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য গল্পটিতে স্ত্রী তার পতির কু-কর্ম সম্পর্কে পথিকদের কিছু বলেনি, এমনকি তার পিতা-মাতার কাছেও পতিনিন্দা পাপ জনক বলে কিছু বলেনি।[২৬]

আখ্যানগ্রন্থে কেবল স্বামী নয় মাতা-পিতাকেও অত্যন্ত উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। সজ্জন ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ, স্বামী যেমন শ্রদ্ধার পাত্র, তাদের প্রতি কোনোরূপ কদাচার যেমন ঠিক নয়। মাতা-পিতার প্রতিও সমান শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। *শুকসপ্ততিকথার* শুককর্তৃক বণিকপত্নীকে শোনানো প্রথম আখ্যানে পিতা-মাতাকে পরমগুরুজন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শুক বণিকপত্নীকে তাদের প্রতি ক্রুরবাক্য বলতে নিষেধ করেছে, সর্বদা বিনয়শীল হতেই উপদেশ দিয়েছে। কেবল মাতা-পিতা নয় যে কোনো পূজনীয় ব্যক্তি ও মানী ব্যক্তির প্রতি এমন ব্যবহারই কাম্য। যদি কেউ এর বিরূপ আচরণ করে তবে সে সমাজের চোখে ঘৃণ্য ও নিন্দিত বলে বিবেচিত হন। মানুষ সমাজবদ্ধজীব, তাই সমাজের অন্যান্য লোকের চোখে ঘৃণ্য হয়ে থাকাকে ইহলৌকিক শাস্তিভোগই বলা চলে। আলোচ্য আখ্যানটিতে এমন ব্যক্তির কেবল ইহলৌকিক শাস্তিই নয় পরলৌকিক শাস্তিও বিহিত হয়েছে। এমন কর্মকারী ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর তার কর্মের জন্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।[২৭] স্মৃতিশাস্ত্রে বাকপারুষ্য এই বিবাদপদটির আলোচনায় কেবল পারুষ্যকারী ব্যক্তির দণ্ডবিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু পরুষবাক্য যার প্রতি প্রয়োগ করা হয় তার উপর কীরূপ প্রভাব ফেলে, তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি।

বস্তুত স্মৃতিতে অন্যের মনে আঘাত দেওয়ার জন্য দণ্ড বিহিত হয়েছে কিন্তু আখ্যান –উপাখ্যানগুলিতে বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। বিভিন্ন কাহিনি দ্বারা আহত ব্যক্তির কষ্টের পরিমাণ তুলে ধরার পাশাপাশি করুণ পরিস্থিতিও তুলে ধরা হয়েছে, কখনও তারা বিপথে চালিত হয়েছে। *কথাসরিৎসাগরের* দ্বিতীয় লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গের ‘চতুর বিকৃতাঙ্গ বালকের কাহিনি’তে বালবিনষ্টকের বিমাতা সর্বদা তার প্রতি কর্কশবাক্য প্রয়োগ করায় বালকটি

---

[২৬] দামোদর ঝা,বেতাল.,পৃ.২৬-২৭

[২৭] ...

জীবন্তি নিন্দমানাস্তে মৃতাঃ স্বর্গং ন যান্তি চ।। শুক.,পৃ.৬

নিদারুণ মনঃকষ্টে ভুগেছে। পরবর্তীকালে এই মানসিক যন্ত্রণা তাকে দুষ্কর্মের পথে চালিত করেছে। একটি সুস্থ স্বাভাবিক যুবক তার মায়ের প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহাবশতঃ অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়েছে। কৌশল অবলম্বন করে মিথ্যেভাবে বিমাতার প্রতি পিতার ক্রোধ উৎপন্ন করেছে। বিমাতাকে সে জানিয়েছে, মাতা যদি দুর্ব্যবহার পরিত্যাগ না করেন তবে সে তার প্রভূত অপকার করবে।[২৮] এইভাবে বাকপারুষ্যে মানসিকভাবে আহত ব্যক্তির অন্যায়ের পথে চালিত হওয়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

কথাসরিৎসাগরের চতুর্থ লম্বকে তৃতীয় তরঙ্গের 'সিংহপরাক্রমের কাহিনি'শীর্ষক আখ্যানে সিংহপরাক্রম নামের একজন রাজভৃত্য ছিলেন। যিনি নিজ কর্মের জন্য রাজার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। কিন্তু তার প্রতি তার পত্নীর ব্যবহার ছিল পীড়াদায়ক। কলহকারী ও বাক্য দ্বার পীড়া প্রদানকারী এমন পত্নীর ব্যবহারে তিনি নিদারুণ মানসিক যাতনা ভোগ করতেন। একদা এই পীড়া-যাতনা সহ্য করতে না পেরে সে গৃহত্যাগী হন এবং অনাহারে কালযাপন করতে থাকেন।[২৯] অপরের বাক্যাঘাত ও দুর্ব্যবহার মানুষকে কতটা কষ্ট দিতে পারে আলোচ্য আখ্যানটি তারই নিদর্শন। আলোচ্য আখ্যানটিতে দুর্ব্যবহারকারী এমন ব্যক্তিকে দৈহিক ও মানসিকভাবে বিকৃত বলা হয়েছে।

বাক্যদ্বারা আঘাতকারী এমন ব্যক্তি কুরূপা হয়- আখ্যানটির এরূপ উক্তির সাথে স্মৃতিতে বর্ণিত অপরাধীর মধ্যে দৃষ্ট নানাবিধ লক্ষণের সাদৃশ্য অনুমান করা যায়। স্ত্রীর পরুষপূর্ণবাক্য যেমন পীড়াদায়ক তেমনি স্ত্রী যদি প্রিয়বাদিনি হয় তবে স্বামীর জীবন ধন্য হয়ে যায়। *হিতোপদেশের* বিগ্রহবিভাগের একটি গল্পে এমন দৃষ্টান্তই মেলে।[৩০] এই দৃষ্টান্তের দ্বারা পরুষবাক্যে কঠোর প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ পুরুষবাক্যের অভাবেই জীবনে মানসিক শান্তি থাকে।

---

[২৮] হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস,কথা, পৃ.২২

[২৯] তদেব,পৃ.৩১

[৩০] হিতো.,পৃ-৩১

সাংসারিক জীবনেও অন্যের কুকথা, কুব্যবহার অপরজনকে সহ্য করতে হত। কেবল বহির্জগতে মানুষ অপরের বাক্যাঘাত দ্বারা আহত হত এমন নয়, গৃহের অভ্যন্তরেও অপরকে আঘাত দেওয়ার চল ছিল তা আখ্যানগুলিতে স্পষ্ট। *কথাসরিৎসাগরের* মদনমঞ্জুকা নামক ষষ্ট লম্বকের তৃতীয়তরঙ্গের 'কীর্তিসেনা ও তার নিষ্ঠুরা শ্বশ্রুমাতার কাহিনি'তে দেখা যায়, স্বামীর অবর্তমানে শ্বশ্রুমাতা ও অন্যান্য পরিজন কীর্তিসেনার প্রতি নানাকঠোর বাক্যবর্ষণ ও নির্দয় ব্যবহার করতো। তাদের এই ব্যবহারের কীর্তিসেনা সর্বদা নিদারুণ মনোকষ্ট ভোগ করতো। তার অবস্থা অতিশয় সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে।[৩১] বাকপারুষ্যের দৃষ্টান্ত সর্বত্রই ছিল। আলোচ্য এই অপরাধটি যে কতটা ভয়াবহ ছিল তা *হিতোপদেশের* একটি উক্তি দ্বারা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। গ্রন্থটির সন্ধিবিভাগে দ্বাদশ সংখ্যক কথায় বলা হয়েছে কারোর কাছ থেকে প্রাপ্ত কুব্যবহারে মানুষের মন একবার যদি ক্ষুন্ন হয়, তবে সে আর কাউকে কখন বিশ্বাস করতে পারে না।[৩২] তার মনের এই ক্ষত চিরদিনই থেকে যায়।

২.দণ্ডপারুষ্য

স্মৃতিশাস্ত্রে হিংসামূলক বিবাদপদের অন্যতম একটি হল দণ্ডপারুষ্য। শব্দটিকে অভিধানে নপুংশক শব্দ বলা হয়েছে এবং এই বিবাদপদটির অর্থ করা হয়েছে Actual Violence।[৩৩] কাউকে কোনো অস্ত্র বা অঙ্গদ্বারা আঘাত করা হলে তাকে দণ্ডপারুষ্য বলা হয়। ধর্মশাস্ত্রকারগণ তাঁদের আলোচনায় ব্যক্তি বা মানুষকে আঘাতের পাশাপাশি কোনো পশু , বৃক্ষাদির অনিষ্টসাধনকেও দণ্ডপারুষ্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

---

[৩১] কথা.,পৃ-১১৯

[৩২] হিতো.,পৃ.৭৭

[৩৩] মনিয়ার উইলিয়াম,*স্যান্সকৃট্ ইংলিশ ডিক্সনারী*, পৃ.৪৪৬

স্মৃতিশাস্ত্রে দণ্ডপারুষ্য নিয়ে বিশদে আলোচনা থাকলেও এ বিষয়ে আলোচনার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় *তৈত্তিরীয় উপনিষদে,* যদিও সেখানে দণ্ডপারুষ্য শব্দটির উল্লেখ নেই। ব্রাহ্মণকে কেউ আক্রমণ করলে তার সহস্র দণ্ড হবে এরূপ যে আলোচনা সেখানে রয়েছে তাকেই দণ্ডপারুষ্যের প্রথম উল্লেখ বলে মনে করা হয়। সেখানে আরও বলা হয়েছে, কেউ যদি আক্রমণ করে ব্রাহ্মণের রক্তক্ষয় ঘটায় তবে ঐ ব্রাহ্মণের রক্তে যত পরিমাণ ধূলিকণা মেশে তত পরিমাণ বর্ষ ঐ ব্যক্তিকে পরিবার থেকে দূরে থাকার অভিশাপ ভোগ করতে হবে।[৩৪]

দণ্ডপারুষ্যের লক্ষণ

সংহিতাগ্রন্থগুলির মধ্যে *মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, কাত্যায়নস্মৃতি, বৃহস্পতিস্মৃতি* ও *নারদস্মৃতি*তে দণ্ডপারুষ্য বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এই সংহিতাগ্রন্থগুলিতে অপরাধের শাস্তি হিসাবে দণ্ডবিধানের পাশাপাশি এই বিবাদপদের স্বরূপ, লক্ষণ, প্রকারভেদ বর্ণিত হয়েছে। নারদের মতে হাত, পা বা কোনো অস্ত্রদ্বারা কাউকে আঘাত করলে , ভস্ম ইত্যাদি নোংরা কারোর দেহে নিক্ষেপ করলে এছাড়াও অন্য কোনো উপায়ে একে অপরকে আঘাত করলে তাকে দণ্ডপারুষ্য বলা হয়।[৩৫] বৃহস্পতি বলেছেন, কাউকে হাত, পা, পাথর, লাঠি, অস্ত্রদ্বারা আঘাত করলে এবং ভস্ম, কাদা, ধূলি গায়ে নিক্ষেপ করলে তাকেও দণ্ডপারুষ্য বলা হবে।[৩৬] *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*র টীকাকার বিজ্ঞানেরশ্বরাচার্য তাঁর *মিতাক্ষরা* টীকায় দণ্ডপারুষ্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে নারদের বচনটি উদ্ধৃত করেছেন এবং নারদোক্ত শ্লোকের প্রতিপদব্যাবৃত্তি পূর্বক অর্থ ব্যাখ্যা করে দণ্ডপারুষ্য সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। নারদ 'পরগাত্রে' হস্ত, আয়ুধ দ্বারা আঘাত করাকে দণ্ডপারুষ্য বলেছেন। *মিতাক্ষরা*কার নারদের শ্লোকটির ব্যাখ্যাকালে 'পরগাত্র' বলতে স্থাবর

---

[৩৪] P.V.Kane, Hist.Dh.,vol.3, P.513

[৩৫] পরগাত্রেষ্বভিদ্রোহহস্তপাদায়ুধাদিভিঃ ।
ভস্মাদীনামুপক্ষেপৈর্দণ্ডপারুষ্যমুচ্যতে।। নারদ.,১৫.৪

[৩৬] হস্তপাষাণলগুডৈর্ভস্মকর্দমপাংশুভিঃ।
আয়ুধৈশ্চ প্রহরণং দণ্ডপারুষ্যমুচ্যতে।। বৃহ.,২১.১

জঙ্গমাত্মক যে কোনো দ্রব্যকে বুঝিয়েছেন। এছাড়াও শ্লোকস্থ আদি শব্দের দ্বারা তিনি একদিকে হস্ত, পাদ, আয়ুধ ছাড়াও গ্রাবাদির গ্রহণ করে এগুলি প্রয়োগ করে হিংসার মাধ্যমে দুঃখোৎপাদন করা এবং অন্যদিকে ভস্মাদি শব্দের পরে উল্লিখিত আদি শব্দদ্বারা রজঃ, পঙ্ক, পুরীষ ইত্যাদি গ্রহণ করেছেন, সেগুলি কারো দেহে স্পর্শ করানোর মাধ্যমে মনে দুঃখ উৎপাদন করা- এই উভয় প্রকারকেই দণ্ডপারুষ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৭]

দণ্ডপারুষ্যের প্রকারভেদ

নারদের মতে দণ্ডপারুষ্য প্রধানত তিন প্রকার- প্রথম, মধ্যম ও উত্তম। তাঁর মতে, অবগোরণ অর্থাৎ পদাঘাত করা, শস্ত্রাদি দেখিয়ে উল্লাস করা প্রথম প্রকার দণ্ডপারুষ্য, নিঃশঙ্কপাতন অর্থাৎ বলপূর্বক স্থানচ্যুত করা দ্বিতীয় প্রকার দণ্ডপারুষ্য এবং এমন আঘাত যার ফলে ক্ষতটি থেকে রক্ত নিষ্কাশিত হয়, সেটি উত্তম প্রকার দণ্ডপারুষ্য।[৩৮] আচার্য বৃহস্পতি প্রথম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন প্রকার দণ্ডপারুষ্যের লক্ষণ উল্লেখ করে তার দণ্ডব্যবস্থাও আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, কারো প্রতি ভস্ম প্রভৃতি প্রক্ষেপণ, করাদি দ্বারা তাড়ন প্রথম প্রকার দণ্ডপারুষ্য। এরূপ কার্যে পারুষ্যকারীর একমাষা পরিমাণ দণ্ড হবে।[৩৯] দুজন ক্ষুব্ধব্যক্তি পরস্পরকে শস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলে তা মধ্যম প্রকার দণ্ডপারুষ্য। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি, আঘাতের পরিমাণ ইত্যাদি বিবেচনা করে শাস্তি বিহিত হবে।[৪০] আর যদি কেউ আক্রমণ করে অপরের ত্বক কেটে দেয়, অস্থি ভেঙ্গে দেয় তবে তা উত্তম প্রকার দণ্ডপারুষ্য বলে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে অপরাধির একশত পণ দণ্ড হবে।

---

[৩৭] পরগাত্রেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকদ্রব্যেষু হস্তপাদায়ুধৈঃ আদিগ্রহণাদ্ গ্রাবাদিভিঃ যোঽভিদ্রোহো হিংসনং দুঃখোৎপাদনং তথা ভস্মনা আদিগ্রহণাদ্ রজঃপঙ্কপুরীষাদৈশ্চ য উপঘাতঃ সংস্পর্শরূপং মনোদুঃখোৎপাদনং তদুভয়ং দণ্ডপারুষ্যম্ । যাজ্ঞ.,২.২১২

[৩৮] তাস্যাপি দৃষ্টং ত্রৈবিধ্যং মৃদুমধ্যমোত্তমং ক্রমাত্।
অবগুরণনিঃশঙ্কপাতনক্ষতদর্শনৈঃ।। নারদ.,১৫.৫

[৩৯] ভস্মাদীনাং প্রক্ষিপণং তাড়নঞ্চ করাদিনা।
প্রথমং দণ্ডপারুষ্যং দমঃ কার্যোঽত্রমাষিকঃ।। বৃহ.,২১.৬

[৪০] মধ্যমঃ শাস্ত্রসন্ধানে সংযোজ্য ক্ষুব্ধয়োর্দ্বয়োঃ।
কার্যঃ কৃতানুরূপস্তুলগ্নেঘাতে দমো বুধৈঃ।। তদেব,,২১.৯

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য মনু, যাজ্ঞবল্ক্য দণ্ডপারুষ্যের দণ্ডবিধান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করলেও দণ্ডপারুষ্যের ভেদ সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেননি। যাজ্ঞবল্ক্য দণ্ডপারুষ্যের প্রকারভেদ সম্পর্কে কিছু না বললেও টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর নারদকে অনুসরণ করে উত্তম, মধ্যম ও প্রথম এই তিন প্রকার দণ্ডপারুষ্য স্বীকার করেছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে কেবলমাত্র অপরকে আঘাত করাই দণ্ডপারুষ্য বলে বিবেচিত হয়নি। নীচ বর্ণের বা জাতির ব্যক্তি উচ্চতর বর্ণের ব্যক্তির সাথে একাসনে বসলে তাকেও দণ্ডপারুষ্যের আওতাধীন করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি এরূপ করলে তার কোমরে ছেঁকা দিয়ে তাকে নির্বাসিত করা হবে (মনু.৮.২৮১ ও নারদ.১৫.২৬২৮)। সংহিতাগ্রন্থগুলিতে দণ্ডপারুষ্য সংক্রান্ত ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সংহিতাকারগণ জাতি,গুণ নির্বিশেষে সকলের জন্যই কতগুলি কর্ম কে গর্হিত বলে মেনেছেন এবং তা সংঘটন থেকে বিরত হতে বলেছেন। যেমন- কারও দিকে ছাই-কাদা-ধুলো-অপবিত্র শ্লেষ্মা-থুতু ইত্যাদি নিক্ষেপ করা বা পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করা বা কাউকে এমনভাবে আঘাত করা যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি গমন, ভোজন, ভাষণ ইত্যাদি স্বাভাবিক কর্ম না করতে পারে। সংহিতাগ্রন্থগুলিতে এই সকল কর্মের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডবিধান করা হয়েছে।

শারীরিকদণ্ড-

সংহিতাকারগণ বিভিন্ন প্রকার দণ্ডপারুষ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থদণ্ড বিহিত করলেও কোন কোন অপরাধীর কাছ থেকে রাজা অর্থদণ্ড নেবেন না তা নিশ্চিত করে দিয়েছেন। বৃহস্পতি রাজা কাদের থেকে অর্থদণ্ড নেবেন না তা নির্দিষ্ট করেছেন জাতিগত অবস্থানের ভিত্তিতে। তিনি নীচবর্ণের ব্যক্তি, প্রতিলোমজ জাতি, অন্ত্যজশ্রেণির মানষুকে অসৎ ও দুষ্ট বলেছেন এবং তাদের থেকে অর্থদণ্ড নেওয়াতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কাত্যায়ন জাতিগতভাবে নিম্নস্থানীয় ব্যক্তির পাশাপাশি পাপাচরণকারী ব্যক্তির অর্থদণ্ডের নিষেধ করেছেন। নারদ আবার যারা জীবিকার দিক দিয়ে হীনকর্মে লিপ্ত থাকে তাদের থেকে অর্থদণ্ড নিতে নিষেধ করেছেন।

যদি কোনো একজন ব্যক্তিকে অনেকে মিলে আঘাত করে, তার অঙ্গ প্রভৃতি ছেদন করে তবে তাদের প্রত্যেকের ঐ অপরাধের বিহিত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হবে।[৪১] এবিষয়ে *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*র বিধানের সাথে বিষ্ণুর মতের (৫.৭৩) সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। নারদের মতে, যদি দুজন একই সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় তবে বাকপারুষ্যের ন্যায় দণ্ডপারুষ্যের ক্ষেত্রেও যে আগে বিবাদে লিপ্ত হবে তার বেশি শাস্তি হবে। দুজন বিবাদকারীর মধ্যে যদি দুজনই সমান অপরাধ জনক কার্য করে তবে দুজনই সমান দণ্ড পাবে।[৪২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পরস্পর বিবাদের দণ্ড বিধানের বিষয়ে নারদ ও যাজ্ঞবল্ক্য ব্যতীত অন্য কেউ আলোচনা করেননি। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, পরস্পর অস্ত্র তুললে মধ্যমসাহস দণ্ড হবে।[৪৩] কাত্যায়ন বলেছেন (৮০০) যদি কেউ হত্যা করতে উদ্যত হয় তবে তাকে মারলে কোনো অপরাধ হয় না। কিন্তু যদি আক্রমণকারীকে ঘিরে ফেলা হয় তবে তাকে আর মারা উচিত নয়।

ক্ষতিপূরণ-

স্মৃতিশাস্ত্রে দণ্ডপারুষ্যের শাস্তি হিসাবে কেবল রাজাকে অর্থদণ্ড দেওয়ার কথাই বলা হয়নি, আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি অপরাধীর করণীয় কর্মেরও বিধান দেওয়া হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি অপরকে আঘাত করে, তাহলে তার ঔষধাদির ব্যয়ও তাকেই বহন করতে হবে যতদিন ওই আক্রান্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়। এর পাশাপাশি তাকে বিবাদের জন্য বিহিত দণ্ডও দিতে হবে।[৪৪] এবিষয়ে *বৃহস্পতিস্মৃতি*তে একই বিধান দেখা যায়। *বিষ্ণুধর্মসূত্রেও* বলা হয়েছে, আক্রান্ত ব্যক্তি যতদিন সুস্থ না হবে ততদিন অপরাধী ব্যক্তি আহতের ক্ষত চিকিৎসার

---

[৪১] একং ঘ্নতাং বহুনাংচ যথোক্তাদ্দ্বিগুণো দমঃ। যাজ্ঞ.,২.২২১

[৪২] দ্বয়োরাপন্নযোস্তুল্যমনুবধ্নাতি যঃ পুনঃ।
স তয়োর্দণ্ডমাপ্নোতি পূর্বো বা যদি বোত্তরাঃ।। নারদ.,১৫.১০

[৪৩] পস্পরং তু সর্বেষাং শস্ত্রে মধ্যমসাহসঃ।। যাজ্ঞ.,২.২১৬

[৪৪] দুঃখমুৎপাদয়েদ্ যস্তু স সমুত্থানজং ব্যয়ম্।
দাপ্যো দণ্ডং চ যো যস্মিন্ কলহে সমুদাহৃতম্।। তদেব,২.২২২

ব্যয়ভার বহন করবে।[৪৫] আহত ব্যক্তির ঔষধ, ভোজন তথা অন্যান্য ব্যয়গুলিও অপরাধী ব্যক্তিকে বহন করতে হবে যতদিন ঐ ব্যক্তি সুস্থ না হয়। কাত্যায়ন বলেছেন দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আঘাতের ক্ষেত্রে এরূপ কর্ম করার জন্য রাজা ঐ ব্যক্তিকে দণ্ড দেবেন। এছাড়াও ঐ ব্যক্তিকে পণ্ডিতগণের বিহিত নিয়ম অনুযায়ী ঐ অসুস্থ, আহত ব্যক্তির ক্ষত সারানোর জন্যও তাকে অর্থ দিতে হবে।[৪৬] পণ্ডিতগণ বলতে তিনি পূর্বাচার্যদের কথা বলতে চেয়েছেন।

পশুপীড়নকারী-

কোনো ব্যক্তিকে দৈহিকভাবে আঘাত করলে তার কী শাস্তি হবে তা বর্ণনার পাশাপাশি সংহিতাকারগণ কারও সম্পত্তিনাশ, পশুকে পীড়ন, পশুর অঙ্গছেদন ও শ্রান্তপশুকে দিয়ে কর্ম করানো ইত্যাদির দণ্ডবিধানও করেছেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ সংহিতাকারগণ পশুর কার্যকারিতার ওপর ভিত্তি করে দণ্ডবিধান করেননি। বিষ্ণু পশুর কার্যকারিতার ওপর ভিত্তির করে পশু আঘাতকারীর দণ্ডবিধান করেছেন। বিষ্ণুর মতে, কেউ আরণ্য পশু হত্যা করলে পঞ্চাশ কার্ষাপণ দণ্ড হবে। কিন্তু হস্তি-অশ্ব-উট হত্যাকারীর এক হস্ত ও এক পা ছেদন করা হবে। কারণ এই পশুগুলির ব্যবহার্যতা আরণ্যপশু অপেক্ষা বেশি। *বিষ্ণুধর্মসূত্রে* দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে দণ্ডের পরিমাণের তারতম্য হয়েছে পশুর ব্যবহারযোগ্যত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে। সংহিতাকারগণের প্রত্যেকেই কোনো মানুষকে আঘাত করার ক্ষেত্রে, প্রহারকারী অপেক্ষা বধকারীকে অধিক দণ্ড দিয়েছেন, তেমনি পশুকে আঘাত করলে যে ব্যক্তি পশুটিকে কেবল প্রহার করেছে তার থেকে যে ব্যক্তি পশুটিকে বধ করেছে কিংবা পশুটির অঙ্গচ্ছেদন করেছে তাকে অধিক দণ্ড দিয়েছেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু পশুহত্যার অপরাধে দণ্ডের যে বিধান দিয়েছেন সেটি এ প্রসঙ্গে কৃতনিয়ম অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যতিক্রম অবশ্যই কাত্যায়ন। তিনি পশুহত্যার অপরাধে অর্থদণ্ডের নিয়ম করেননি। তিনি পশুহত্যাকারীকে পশুর স্বামীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়াকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

---

[৪৫] পুরুষপীড়াকরাস্তু দুঃখ্যানব্যয়ং দদ্যুঃ। বি.ধ.সূ.,৫.৭৫

[৪৬] দেহেন্দ্রিয়বিনাশস্তু যথাদণ্ডং প্রকল্পয়েত্।
তথা তুষ্টিকরং দেয়ং সমুত্থানং চ পণ্ডিতৈঃ।। কাত্যা.,৭৮৫

*কাত্যায়নস্মৃতি*তে অপরিণতবয়স্ক গরু, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পশুদের দিয়ে ভার বহন করানোও দণ্ডপারুষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। যে দ্রব্য ঈশ্বরের উৎসর্গ করা হয়েছে তাতে আর কারও অধিকার থাকে না, তাই ব্যক্তিগত বা অন্য প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। বিভিন্ন সংহিতাগ্রন্থগুলিতে মনুষ্য ও পশুর দণ্ডপারুষ্য বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড ব্যবস্থা করা হলেও দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে মনুর উক্তি সব থেকে বেশি প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। মনুষ্যের প্রতি দণ্ডপারুষ্যে, পশুর প্রতি দণ্ডপারুষ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শাস্তি বর্ণনার পাশাপাশি মনুর বিধান হল, মানুষ ও পশুসমূহের যাতে আঘাত হয় এরূপ কার্য কেউ করলে কষ্টের লঘুত্ব গুরুত্ব বিচার করেই রাজা দণ্ডবিধান করবেন।[৪৭] কাত্যায়নও একইভাবে আক্রান্ত ব্যক্তির বা পশুর কষ্ট বা পীড়া অনুযায়ী দণ্ডবিধানের কথা বলেছেন।

বৃক্ষাদির ক্ষতিসাধনকারী-

স্মৃতিগ্রন্থে বৃক্ষাদির ক্ষতিসাধনও এক প্রকার দণ্ডপারুষ্য বলে বর্ণিত হয়েছে। কেউ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করলে ঐ ব্যক্তির কীরূপ শাস্তি প্রাপ্য সে সম্পর্কে সংহিতাকারগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য বৃক্ষাদির গুরুত্ব অনুসারে দণ্ডবিধান করেছেন। তাঁর মতে, যে সকল বৃক্ষের শাখা ছেদন করলেও পুনরায় শাখা জন্মায়, যে সকল বৃক্ষ উপকারী, তার শাখা বা কাণ্ড ভাঙ্গলে, সমূলে উৎপাটন করলে কুড়িপণ থেকে আরম্ভ করে চল্লিশপণ পর্যন্ত দণ্ড ধার্য হবে।[৪৮] চৈত্য বা বিহারাদি, শ্মশান, সীমানা, পবিত্রস্থান বা দেবমন্দির ইত্যাদি স্থলে জাতবৃক্ষের শাখা প্রভৃতি ছেদনে বা সমূলে বিনাশে দ্বিগুণ দণ্ড হবে। যেহেতু

---

[৪৭] মনুষ্যাণাং পশূনাঞ্চ দুঃখায় প্রহৃতে সতি।
যথা যথা মহদ্দুঃখং দণ্ডং কুর্যাত্তথা তথা।। মনু.,৮.২৮৬
তুল. মনুষ্যাণাং পশূনাঞ্চ দুঃখায় প্রহৃতে সতি।
যথা যথা ভবেদ্দুঃখং দণ্ডং কুর্যাত্তথা তথা।। কাত্যা.,৭৮২

[৪৮] প্ররোহিশাখিনাং শাখাস্কন্ধসর্ববিদারণে।
উপজীব্যদ্রুমাণাং চ বিংশতের্দ্বিগুণো দমঃ।। যাজ্ঞ.,২.২২৭

চৈত্যবিহারাদি এই সকল স্থানে জাতবৃক্ষাদির গুরুত্ব অন্যান্য সাধারণস্থানে জাত বৃক্ষাদি অপেক্ষা বেশি তাই এক্ষেত্রে দ্বিগুণ দণ্ড ধার্য করা হয়েছে। গুল্ম, গুচ্ছ, লতা, প্রতান, ঔষধিবৃক্ষ, বীরুধ ইত্যাদির শাখাস্কন্ধ ছেদনে বা মূলোৎপাটনে পূর্বোক্তদণ্ডের অর্ধেক দণ্ড বিধান করা হয়েছে। যেহেতু এই বৃক্ষগুলি লতা বা গুল্ম জাতীয় এবং এগুলি সহজেই জন্মায় তাই এক্ষেত্রে সংহিতাকার অপেক্ষাকৃত কম দণ্ড বিহিত করেছেন।

মনুসংহিতায় দণ্ডপারুষ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে গাড়ির দ্বারা কারো আঘাত লাগলে কিংবা মৃত্যু হলে চালক ও মালিকের কী শাস্তি প্রাপ্য তা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে তিনি গাড়ির দ্বারা কেউ আহত হওয়া সত্ত্বেও কখন চালক ও মালিক শাস্তি পাবে না তার ব্যাখ্যা করেছেন। মনুর মতে, জোয়াল ভেঙ্গে গেলে, পথের বিরূপতার জন্য কেউ আহত হলে, গাড়ির চাকা ভেঙ্গে গেলে, যন্ত্রের অর্থাত্ কাঠের চামড়ার বাঁধন খুলে গেলে, পশুদের মুখবন্ধন রজ্জু ছিঁড়ে গেলে, চালক উচ্চস্বরে বার বার সরে যেতে বলা সত্ত্বেও পথিক না সরলে যদি কোনো ক্ষতি হয় তবে কারো দণ্ড হবে না।[৪৯] কারণ এই বিপত্তি গুলো যদি আকস্মিক কিংবা প্রাকৃতিক কারণে ঘটে তাহলে চালক বা মালিকের শাস্তি পাওয়া উচিত নয় অথবা পথচারীর অসাবধানতার দায় তাদের ওপর বর্তায় না। বর্তমানকালেও এই সকল কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে চালক বা মালিক দণ্ডার্হ হয় না। এগুলি ব্যতীত অন্য কোনো ভাবে যদি কেউ আহত হয় তবে গাড়ির চালক ও মালিক শাস্তি পাবে। যেমন, মালিক যদি অপটু চালক নিযুক্ত করে এবং সেই চালকের কারণে কেউ আহত হলে গাড়ির মালিক দুই শতপণ দণ্ড দেবে ।[৫০] আবার পথ অবরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও চালক যদি গাড়ি চালায় এবং তার ফলে যদি প্রাণবিনাশের ঘটনা ঘটে, তবে চালকে অবশ্যই দণ্ড দিতে হবে ।[৫১] মনুর মতে, দুর্ঘটনা ঘটলে এবং তার ফলে কেউ আহত হলে তার জন্য সব সময় কেবল চালক বা মালিক

---

[৪৯] ছিন্নাস্যে ভগ্নযুগে তির্যক্ প্রতিমুখাগতে।
অক্ষভঙ্গে চ যানস্য চক্রভঙ্গে তথৈব চ।।
ছেদনে চৈব যন্ত্রাণাং যোক্ত্ররশ্ম্যোস্তথৈব চ।
আক্রন্দে চাপ্যৈহীতি ন দণ্ডং মনুরব্রবীত্।। মনু.,৮.২৯১-২৯২

[৫০] তদেব,৮.২৯৩

[৫১] তদেব,৮.২৯৫

দোষী হয় না। আরোহী যদি চালকের অনভিজ্ঞতার কথা জেনেও গাড়িতে চড়ে তবে প্রত্যেক আরোহীকে একশতপণ দণ্ড দিতে হবে।[৫২] চালক অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও যদি তার অসাবধানতাবশত দুর্ঘটনা ঘটে তবে তার দায় অবশ্যই চালকের হবে। চালকের অসাবধানতার কারণে কারো মৃত্যু হলে, কোনো পশুপাখির মৃত্যু হলে চালকের কী শাস্তি হবে তা মনু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।[৫৩] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গাড়ির দ্বারা ব্যক্তি, পশু আহত হলে কখন চালক দোষী, কখন নয়, কখন মালিক দোষী, কোন সময়ে আরোহী শাস্তি পাবে এই সকল বিষয়ে *মনুসংহিতায়* যে আলোচনা ও যুক্তিসংগত দণ্ডবিধান দেখা যায় তা অন্যান্য সংহিতায় অনুপস্থিত। দণ্ডপারুষ্য সম্পর্কিত যে আলোচনা সংহিতাকারগণ করেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে আঘাতের তীব্রতা যত বেশি হয় দণ্ডপারুষ্যকারী ব্যক্তির শাস্তিও তত অধিক হয়। এমনকি গুরুও যদি শিষ্যকে ক্রোধবশতঃ আঘাত করে এবং শিষ্যটি তীব্র পীড়া অনুভব করে তবে তার পিতা গুরুর সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারবেন।[৫৪] শাস্ত্রবিহিত উপায়ে গুরু নিশ্চিতরূপেই শিষ্যকে তাড়না করতে পারেন, কিন্তু অন্যায্য উপায়ে আঘাত করলে গুরুও দণ্ডার্হ।

২.১.আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে দণ্ডপারুষ্য

কোনো ব্যক্তি, পশু তথা বৃক্ষাদিকে আঘাত করা স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে যেমন একটি গুরুতর অপরাধ, গল্পসাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। সমাজে প্রচলিত নানা অন্যায়, অন্যের পীড়া উৎপাদক কর্মগুলিকে বিধিবদ্ধভাবে বন্ধ করার জন্যই স্মৃতিশাস্ত্রে বিভিন্ন বিধান দেওয়া হয়েছে। অপরকে শারীরিকভাবে আঘাত তথা জঘন্য দ্রব্য ইচ্ছাকৃত ভাবে কারোর শরীরে নিক্ষেপ এই অপরাধটির উল্লেখ ও তার শাস্তি সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যেও দেখা যায়। স্মৃতিশাস্ত্রে যেমন

---

[৫২] যুগ্যস্থাঃ প্রাজকেঽনাপ্তে সর্বে দণ্ড্যাঃ শতং শতম্। মনু.,২.২৯৪

[৫৩] মনুষ্যমারণে ক্ষিপ্তহচৌরবত্ কিল্বিষং ভবেত্।
প্রাণভৃৎসু মহৎস্বর্দ্ধং গোগজোষ্ট্রহয়াদিষু।। তদেব,২.২৯৬

[৫৪] শিষ্যং ক্রোধেন হন্যাচ্চেদাচার্যো লতযা বিনা।
যেনাত্যের্থং ভবেত্ পীড়া বাদঃ স্যাচ্ছিষ্যতঃ পিতুঃ।। কাত্যা.,৭৯৪

দণ্ডপারুষ্য নামক এই বিবাদপদটি থেকে সমাজকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। গল্পসাহিত্যেও তেমনি দণ্ডপারুষ্য এই বিবাদপদটি বিশেষভাবে নিন্দিত হয়েছে।

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে দণ্ডপারুষ্য *দশকুমারচরিতের* বিশ্রুতচরিত নামক অংশে বর্ণিত একটি অন্যতম দোষ। যিনি অপরের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ করেন, যার আচরণ বা কৃত কর্মের দ্বারা অন্যের পীড়া উৎপন্ন হয় এমন ব্যক্তিকে দুরাচারী বলা হয়। দুরাচারী ব্যক্তি সকলের দ্বারাই পরিত্যজ্য। এমন ব্যক্তি গল্পসাহিত্যে একটি নিন্দনীয় চরিত্র বলে বিবেচিত হয়েছে।

পঞ্চতন্ত্রের 'কাকোলূকীয়ম্' নামক তৃতীয় তন্ত্রের 'কপোত-লুব্ধককথা' গল্পে প্রাণী হিংসাকারী ব্যক্তিকে তিরস্কার করা হয়েছে। একটি শ্লোকের মাধ্যমে বিষ্ণুশর্মা এরূপ ব্যক্তির দুরবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি কোনো প্রাণীর ক্ষতিসাধন করে, কিংবা আঘাত করে তার কোনো সুহৃদ, সম্বন্ধী, বান্ধব থাকে না। এমন ব্যক্তিকে সকলেই পরিত্যাগ করে।[৫৫] এমন বাক্য দ্বারা নির্দয় কার্যকারীকে গল্পকার সাবধান করে দিয়েছেন। অপরকে আঘাত দিলে তার সমাজে কোনো স্থান নেই। আলোচ্য শ্লোকটিতে নির্দিষ্ট করে কোনো প্রাণির নাম উল্লিখিত না হওয়ায় গ্রন্থকার সকল প্রাণিকেই বুঝিয়েছেন এমন অনুমান করা যায়। অর্থাৎ যে কোনো প্রাণী-তা যতই ক্ষুদ্র হোক তার ক্ষতি করা কিংবা আঘাত করা একটি অপরাধ। স্মৃতিশাস্ত্রেও যে কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণি, বৃক্ষাদির ক্ষতি করাকে, আঘাত করাকে দণ্ডপারুষ্য অপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রের* আলোচ্য শ্লোকটিতেও নির্দিষ্ট করে কোনো প্রাণীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ যে কোনো প্রাণীর প্রতি হিংসাত্মক আচরণ, কঠোর আচরণ অকর্তব্য।

যে ব্যক্তি কোনো পশু, মানুষকে পীড়া দেয় তাকে শাস্তি পেতেই হয়- বন্ধুহীন হয়ে থাকতে হয়, যা শাস্তি অপেক্ষা কোনো অংশে কম কিছু নয়। কঠোর নৃশংস আচরণ যিনি করেন *পঞ্চতন্ত্রকার* এমন ব্যক্তিকে সর্পের সাথে তুলনা করেছেন। সর্পের সঙ্গ যেমন বিপজ্জনক দণ্ডপারুষ্যকারী ব্যক্তিও তেমন। সর্প বিশ্বাসের অযোগ্য, সর্পের ন্যায় দুর্জনের সঙ্গে থাকলে যে

---

[৫৫] নৈব কশ্চিত্ সুহদ্ তস্য ন সম্বন্ধী ন বান্ধবঃ।
স তৈঃ সর্বৈঃ পরিত্যক্তস্তেন রৌদ্রেণ কর্মণা।। সুধাকর মালবীয়,পঞ্চ.,পৃ.৫২৯

সর্বদা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। দণ্ডপারুষ্যকারী ব্যক্তি ও সর্প উভয়ই উদ্বেগজনক, এমন ব্যক্তির সাথে থাকা উচিত নয়। গল্পকার একদিকে যেমন দণ্ডপারুষ্যের ফলাফল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, তার পাশাপাশি আবার সকলের উদ্দেশ্যে এমন ব্যক্তিকে ত্যাগ করার উপদেশও দিয়েছেন। দোষী ব্যক্তির শাস্তি উল্লেখ করে তিনি সকলকে এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। নিজের হিতার্থে ক্রূর স্বভাবের ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। বিষ্ণুশর্মার মতে, নৃশংস-দুরাত্মা প্রাণিদের নাশকারী ব্যক্তি সকলের কাছে সর্পের ন্যায় উদ্বেগ জনক।[৫৬]

কাউকে আঘাত করা স্মৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। এই একই নিয়মের প্রতিফলন সংস্কৃত আখ্যান সাহিত্যে দেখা যায়। আখ্যান সাহিত্যে কাউকে প্রস্তর দ্বারা আঘাত করাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলা হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থের* 'কাকোলূকীয়ম্' তন্ত্রে এক জন মুনি একটি বাজপাখিকে প্রস্তর দ্বারা আঘাত করলে বাজপাখি মুনিকে উদ্দেশ্য করে বলেছে- মুনি তাকে আঘাত করে উচিত কাজ করেনি। সে মুনিকে আরও জিজ্ঞাসা করেছে যে, মুনি এইরূপ আঘাত করেছে মুনি কি অধর্মকে ভয় করেন না ?[৫৭] কাউকে প্রস্তর দ্বারা আঘাত করা অনুচিত, এমন কার্য ধর্মবিরুদ্ধ। ধর্মবিরুদ্ধ যে কার্যের দ্বারা অন্যের প্রতি অন্যায় করা হয় তা বিবাদপদবাচ্য। এখানে প্রস্তর দ্বারা আঘাত করে মুনি যে অধর্ম করেছে স্মৃতিতে তা দণ্ডপারুষ্যের আওতাধীন। এক্ষেত্রে মুনি দণ্ডপারুষ্য এই বিবাদপদে অভিযুক্ত। কাউকে প্রস্তর দ্বারা আঘাতের শাস্তি বিষ্ণু মধ্যম সাহস বলেছেন।[৫৮] *পঞ্চতন্ত্রকারও* বাজপাখির উক্তির মাধ্যমে কাউকে আঘাতকারী ব্যক্তি সে যেই হোক না কেন দণ্ডনীয় হবেন। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।[৫৯] সুতরাং স্মৃতি ও পঞ্চতন্ত্রের বিচারে কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাতকারী যে কোনো ব্যক্তি অধর্মকারী ও অপরাধী।

---

[৫৬] যে নৃশংসা দুতারত্মানঃ প্রাণিনাং প্রাণনাশকঃ।
উদ্বেজনীয়ো ভূতানাং ব্যালা ইব ভবন্তি তে।। পঞ্চ.,পৃ.৫২১

[৫৭] ন যুক্তমনুষ্ঠিতং ভবতা যদহং পাষাণেন তাড়িতঃ। কিং ত্বমধর্মান্ন বিভেষি? তদেব,পৃ.৫৬৫

[৫৮] পাষাণেন মধ্যমম্ । বি.ধ.সূ.,৫.২৯

[৫৯] অপরং মুনিনাং ন চৈষ ধর্মো...। পঞ্চ.,পৃ.৫৬৬

শূদ্র যে অঙ্গের দ্বারা দ্বিজাতিকে পীড়ন করবে তার সেই অঙ্গের ছেদন করতে হবে- দণ্ডপারুষ্যের এমন বিধান প্রায় সকল সংহিতাগ্রন্থেই দেখা যায়। সেখানে দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে বর্ণক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নিয়মটি কেবল শূদ্র নয় যে কোনো অন্ত্যজ জাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ স্মৃতির বিধান অনুযায়ী শূদ্র কিংবা কোনো অন্ত্যজ জাতির মানুষ যদি দ্বিজাতিকে পীড়ন করে তবে যে অঙ্গ দ্বারা পীড়ন করে তার সেই অঙ্গ ছেদন করা হবে। মনুর মতে, শূদ্র হাত দিয়ে উচ্চ জাতিকে পীড়ন করলে তার হাত কেটে নেওয়া হবে, পা দিয়ে আঘাত করলে পা কেটে নেওয়া হবে, থুথু দিলে ওষ্ঠাধর কেটে নেওয়া হবে, মুত্রাদি ত্যাগ করলে পুরুষাঙ্গ কেটে দেওয়া হবে, পায়ুবায়ু ত্যাগ করলে মলদ্বার কেটে নেওয়া হবে।[৬০] নারদ এবং *বৃহস্পতিস্মৃতি*তেও পাওয়া যায় শূদ্র যে অঙ্গদ্বারা দ্বিজাতিকে পীড়ন করবে তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গের ছেদন করা হবে। অঙ্গছেদনের ক্ষেত্রে মনু, নারদ, বৃহস্পতি শূদ্রেরই নামোল্লেখ করেছেন।

তবে, এবিষয়ে *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* ভিন্নধর্মী বিধান দেখা যায়। তিনি দণ্ডপারুষ্যের দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রমক্রমের উচ্চশ্রেণী-নিম্নশ্রেণী ভেদের অনুসরণ করেননি। তবে সমাজে ব্রাহ্মণকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন এমনটা স্পষ্টতই চোখে পড়ে। তাঁর মতে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন যে কোনো বর্ণের মানুষই যদি ব্রাহ্মণকে আঘাত করে তবে যে অঙ্গদ্বারা পীড়ন করবে তার সেই অঙ্গ ছেদন করা হবে।[৬১] অর্থাৎ তাঁর মতে, ব্রাহ্মণের প্রতি আঘাত করলে শুধু শূদ্র নয়, ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল বর্ণ (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) ও অন্ত্যজ জাতির ক্ষেত্রেই এই দণ্ড প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার* প্রসিদ্ধ টীকা *মিতাক্ষরায়* মনুর মতেরই সমর্থন দেখা যায়। ব্রাহ্মণকে আঘাত করলে সকল অব্রাহ্মণ বর্ণেরা যে অঙ্গ দ্বারা পীড়ন করবে সেই অঙ্গের ছেদন করা হবে- যাজ্ঞবল্ক্য এরূপ বললেও *মিতাক্ষরা*কার বিজ্ঞানেশ্বরের মতে, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে আঘাত করে তবে তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গের ছেদন কর্তব্য।[৬২] মনুকে অনুসরণ করে তিনি বলেছেন কেউ বধ করতে উদ্যোত হলে প্রথম সাহস দণ্ড হবে- যাজ্ঞবল্ক্যকৃত এই নিয়মটি ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে এবং

---

[৬০] মনু.,৮.২৮০-২৮২

[৬১] বিপ্রপীডাকরং ছেদ্যম্ অঙ্গমব্রাহ্মণস্য তু । যাজ্ঞ.,২.২১৫

[৬২] দ্বিজাতিমাত্রস্যাপরাধে শূদ্রস্যাঙ্গচ্ছেদবিধানঃ। মিতা.,২.২১৫

তাদেরই কেবল প্রথম সাহস দণ্ড হবে, শূদ্রের নয়। কারণ শূদ্র যদি আঘাত করতে কিংবা বধ করলে উদ্যোত হয় তবে তার অঙ্গের ছেদন কর্তব্য।

এবিষয়ে *মনুভাষ্যে* দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে একটি ভিন্নধর্মী দণ্ডবিধি দেখা যায়। তিনিও মনুর ন্যায় দ্বিজাতির পীড়নে শূদ্রেরই অঙ্গচ্ছেদনের কথা বলেছেন। তবে তিনি এক্ষেত্রে যে বিশেষ বিধানটি দিয়েছেন তা হল, তিনি একাধিক অঙ্গের দ্বারা পীড়ন করা হলে একাধিক অঙ্গেরই ছেদন করতে বলেছেন।[৬৩] সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের একাধিক গল্পগ্রন্থের বিভিন্ন প্রকার দণ্ডপারুষ্য সংঘটিত হওয়ার দৃষ্টান্ত মেলে। শুধু তাই নয়, অপরের পীড়াকর এই অপরাধে অপরাধীর শাস্তিও সেখানে চোখে পড়ে। দণ্ডবিধান বা শাস্তিবিধানের সাথে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানের দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে।

সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা গল্পগ্রন্থের একত্রিংশ উপাখ্যানে এই অপরাধটির উল্লেখ রয়েছে। গল্পকার বিচারের মাধ্যমে দণ্ডপারুষ্যের দণ্ডবিধান করেছেন। গল্পের রাজার পুত্র ব্রাহ্মণকে অশ্ব ধারণ করতে বলেছেন, ব্রাহ্মণ তা করতে অস্বীকার করলে রাজকুমার তাকে কষাঘাত করেছেন- এমনটা দেখা যায়। নিজের বিরুদ্ধে হওয়া এমন অন্যায় আচরণের বিচার লাভের জন্য ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হয়েছেন ও অভিযোগ করেছেন। রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে রাজপুত্র যে হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণকে আঘাত করেছেন তার সেই হস্ত কেটে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।[৬৪] আলোচ্য গল্পে নিরপরাধী ব্রাহ্মণকে রাজপুত্র কশাঘাত করে তাকে পীড়া দিয়েছেন এটি একটি অপরাধ। তা স্মৃতিতে উল্লিখিত দণ্ডপারুষ্য নামক বিবাদপদে অন্তর্ভুক্ত। রাজপুত্র জন্মগতভাবে ক্ষত্রিয়পুত্র। তার ব্রাহ্মণকে আঘাত বিচার্য নাও হতে পারত কিন্তু গল্পকার রাজপুত্রেরও এই অপরাধের বিচার এবং তাঁর দণ্ডবিধান নিশ্চিত করেছেন।

---

[৬৩] ...অঙ্গমিতি ছেত্তব্যমিতি চৈকত্ববিবক্ষা মা বিজ্ঞায়ি। তেনানেকেনাঙ্গেন প্রহরণেঽনেকস্যৈবচ্ছেদঃ।- মনুভা.,৮.২৮০

[৬৪] সিংহাসন.,পৃ.৮৮

উল্লেখ্য, উক্ত ক্ষেত্রে রাজার দণ্ডবিধানের সাথে যাজ্ঞবল্ক্যের দণ্ডবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণকে আঘাতের অপরাধে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সকলেরই অঙ্গচ্ছেদন করতে বলেছেন। ক্ষত্রিয় বংশজাত রাজকুমার ব্রাহ্মণকে পীড়ার অপরাধে *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার* বিচারে তার হস্তচ্ছেদনই কর্তব্য। এক্ষেত্রে রাজাও তাকে একই দণ্ডবিধান করেছেন। আলোচ্য গল্পটিতে ব্রাহ্মণকে আঘাত করলে কেনো অঙ্গচ্ছেদন করা উচিত তারও উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণের স্তুতি মাধ্যমে কখনও তাঁর প্রতি হিংসা আচরণ করা উচিত নয় এমন বলা হয়েছে। রাজা মন্ত্রীকে বলেছেন, যেহেতু কুমার ব্রাহ্মণকে কশাঘাত করেছে তাই তাকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া উচিত। মন্ত্রীকে রাজা এমন কথা বলায়, মনে হয় যে রাজকুমার অন্য কোনো অন্যায় করলে হয়তো পিতৃস্নেহে কুমারের দণ্ড কিছু লাঘব হতে পারত কিন্তু ব্রাহ্মণকে আঘাত করায় তাকে দণ্ড পেতেই হবে। ব্রাহ্মণকে আঘাত করা অত্যন্ত অবিবেচকের ন্যায় কাজ করার সমান। রাজার মতে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বিষপান, সর্পের সাথে ক্রীড়া, যোগিগণের নিন্দা ও ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা আচরণ করা অনুচিত।[৬৫] প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বিষপানের ফলে নিশ্চিত মৃত্যু হবে জেনেও বিষপান করা, সর্প একটি স্বভাবক্রূর প্রাণী যার দংশনে প্রাণনাশ হয় - তার সাথে জেনে-বুঝেও খেলা করা, ব্রাহ্মণের সাথে হিংসাত্মক আচরণ করার সমান। কারণ বিষপান করার ক্ষেত্রে কিংবা সাপের ক্রীড়া করার ন্যায় ব্রাহ্মণকে আঘাত করলে নিশ্চিত বিনাশ জেনেও তা করা হয়। রাজা পুরাণ থেকে একাধিক উদাহরণ করে দেখিয়েছেন যে, অতীতে যখনই কেউ ব্রাহ্মণকে পীড়ন করেছে তারই বিনাশ ঘটেছে। পূর্বকালে ব্রাহ্মণের শাপে ঈশ্বরের লিঙ্গপাত হয়েছিল, নৃগরাজ কৃকলাসত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, ইন্দ্রের দারিদ্রতা জন্মেছিল- এই সকল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ব্রাহ্মণ পীড়নের ভায়াবহ ফলের কথাই তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি ব্রাহ্মণকে পূজনীয় ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন এবং অতি ঐশ্বর্যসম্পন্ন হলেও ব্রাহ্মণের অবমাননা করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন।

এক্ষেত্রে রাজার রাজকুমারকে যথোচিত দণ্ড দেওয়ার কারণ হিসেবে দুটি তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। প্রথমটি হল রাজা রাজকুমারের দণ্ডবিধানকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিসেবে উপস্থাপন করা

---

[৬৫] তদেব,পৃ.৮৮

হয়েছে। যার ফলে সকল বর্ণের সকল শ্রেণীর মানুষই ব্রাহ্মণ আঘাতের শাস্তি সম্পর্কে অবগত হয়। দ্বিতীয়টি হল রাজা রাজকুমারকে যথোপযুক্ত দণ্ড দিয়ে ব্রাহ্মণ পীড়নের আর ভয়ানক ফলাফল থেকে রাজ্যকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ আলোচ্য গল্পের বিচারে ব্রাহ্মণকে আঘাত অনুচিত, তাকে পীড়ন দণ্ডার্হ। ব্রাহ্মণকে আঘাতে ব্যবহৃত অঙ্গের ছেদন করা হবে। এছাড়াও ব্রাহ্মণের ক্রোধানলে অপরাধীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। রাজার কাছে ব্রাহ্মণ পূজনীয়। তাই বিচার সভায় রাজকুমারের শাস্তি সম্পর্কে ঘোষণা করার পরেও ব্রাহ্মণের অনুরোধে রাজকুমারের দণ্ড লাঘব করতে সম্মত হয়েছেন।

রাজকুমার ব্রাহ্মণকে আঘাত করেছে ব্রাহ্মণের বর্ণগতস্থান না জেনেই । অর্থাৎ অজ্ঞানতাবশত রাজপুত্র ব্রাহ্মণকে আঘাত করেছে। তাই ব্রাহ্মণ রাজাকে উপদেশ দিয়েছেন রাজপুত্রকে অঙ্গচ্ছেদনরূপ শাস্তি মুকুব করতে।[৬৬] রাজাও অজ্ঞানতাবশত আঘাত করার জন্য রাজকুমারকে শাস্তি দেননি।

অজ্ঞানতাবশত কিংবা অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় যদি কেউ কাউকে আঘাত করে তবে তার শাস্তি হবে না এমন বিধান স্মৃতিশাস্ত্রেও মেলে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, কেউ যদি অজ্ঞানবশত বা মদ্যপ অবস্থায় অভিভূত হয়ে কারো সাথে দণ্ডপারুষ্যরূপ আচরণ করে তবে তার কোনো শাস্তি হবে না।[৬৭] এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রতি আঘাতে অব্রাহ্মণের প্রাপ্য দণ্ডবিধির বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের বিধির সাথে *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* বক্তব্যের মিল চোখে পড়ে। শুধু তাই নয়, যাজ্ঞবল্ক্য যেমন অজ্ঞানতাবশত কৃত অপরাধে অপরাধীকে দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা* গল্পগ্রন্থের একত্রিংশ উপাখ্যানেও তেমনি এই একই শর্তে রাজপুত্রের অঙ্গচ্ছেদনরূপ দণ্ড থেকে মুক্তি দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছেন। তাকে আঘাত যাতে কেউ না করে তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ পীড়নকারী সকল অব্রাহ্মণ বর্ণের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের সংশ্লিষ্ট অঙ্গচ্ছেদন করতে বলেছেন।

---

[৬৬] তদেব,৮৭

[৬৭] যাজ্ঞ.,২.২৪২

দণ্ডপারুষ্যের দণ্ডবিধানের বিষয়ে *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি* ও *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* বক্তব্যের সাদৃশ্য যেমন চোখে পড়ে তেমনি বর্ণশ্রেষ্ঠ রূপে ব্রাহ্মণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার দৃষ্টান্তও মেলে। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* একত্রিংশ আখ্যানে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্র* গল্পগ্রন্থের লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রের 'সিংহদম্পতি ও শৃগালপুত্রদের কথা' গল্পে ব্রাহ্মণের পাশাপাশি স্ত্রী, সন্ন্যাসী, বালক এবং বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তি – এদের সকলকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রাণসংকট উপস্থিত হলেও স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী তথা বালক এবং বিশ্বাসকারী ব্যক্তিকে প্রহার করা উচিত নয়।

যে কোনো ব্যক্তিকেই আঘাত করা অনুচিত। যাতে অন্যের পীড়া হয়, প্রাণ চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এমন আঘাত কোনো মানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণী এবং বৃক্ষাদিকে করা উচিত নয় – স্মৃতিশাস্ত্রের এমন বিধান সংস্কৃত গল্পসাহিত্যেও দেখা যায়। কাউকে আঘাত করা অনুচিত এমন উল্লেখ করেও গল্পসাহিত্যের একাধিক গল্পে ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোকাদিকে আঘাত, প্রহার করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ স্ত্রী, বালক অন্যদের দ্বারা আহত হলে এরা প্রত্যাঘাত কিংবা শারীরিক শক্তি দ্বারা সর্বদা নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হন না। তাই বিশেষভাবে এদের নাম উল্লেখ করে এদের অপরের আঘাত থেকে রক্ষা করারই চেষ্টা করা হয়েছে। স্ত্রী, বালককে আঘাত বা পীড়নের শাস্তিও গল্পসাহিত্যে পাওয়া যায়। অপরাধ করলে তার শাস্তি অবশ্যই প্রাপ্য কিন্তু অপরাধ যাতে সংঘটিত না হয় তাই –ই এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণুশর্মা স্ত্রী, বালক ছাড়াও ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও যে বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তিকে পীড়ন করতে নিষেধ করেছেন।[৬৮]

ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, সন্ন্যাসী তার সাত্ত্বিক কর্মের জন্য শ্রেষ্ঠ, যে বিশ্বাস করে তাকে আঘাত করার অর্থ বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় কর্ম করা, তাই এদের আঘাত অবশ্যই নিন্দনীয় কর্ম। *পঞ্চতন্ত্রের* লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে যে বিশ্বাস করে, যে মিত্রস্থানীয় তাকে আঘাত করা অনুচিত বলা হয়েছে। আলোচ্য তন্ত্রটির প্রারম্ভে রক্তমুখ নামক একটি বানর ও করালমুখ নামক একটি কুমীরের

---

[৬৮] স্ত্রীবিপ্রলিঙ্গিবালেষু প্রহর্তব্যং ন কর্হিচিত্ ।
প্রাণত্যাগেঽপি সঞ্জাতে বিশ্বস্তেষু বিশেষতঃ।। পঞ্চ.পৃ.৬৫৭

বন্ধুত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা পরস্পর পরস্পরকে মিত্র বলে স্বীকার করে। কিন্তু পরবর্তীকালে করালমুখের স্ত্রী রক্তমুখকে আহার করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং করালমুখকে অনুরোধ করে যাতে সে রক্তমুখকে আঘাত করে। স্ত্রীর এই কথা শুনে করালমুখ মিত্রকে আঘাত করতে তথা হত্যা করতে অসম্মত হয়। এই সময় করালমুখের তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলা বক্তব্যের মাধ্যমে গল্পকার মিত্রকে আঘাত করা, মিত্রের ক্ষতি করা অন্যায় তা তুলে ধরেছেন। সেখানে করালমুখ উপকারীর ক্ষতি করাকেও অন্যায় বলেছে। সে তার স্ত্রীকে বলেছে, রক্তমুখকে সে বন্ধু বলে স্বীকার করেছে, রক্তমুখ তার উপকার করেছে তাই সে তাকে আঘাত করতে চায় না। সে আরও বলেছে একটি বন্ধুকে (ভ্রাতা) মাতা প্রদান করে এবং দ্বিতীয় বন্ধু বাগ্দানের মাধ্যমে আমরা প্রাপ্ত হই। পণ্ডিতেরা এই দুই এর মধ্যে সম্ভাষণ দ্বারা উৎপন্ন বন্ধুকে সহোদর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন।[৬৯] অর্থাৎ বন্ধুর স্থান ভ্রাতা অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়। তাই তাকে আঘাত, তার ক্ষতি সাধন অনুচিত। যে মিত্র, যে বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তিকে আঘাত করা, কোনো ভাবে তার ক্ষতি করাকে এক অর্থে বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায়। শুধু আঘাত করাই নয় অপবিত্র দ্রব্যাদি যেমন ভস্ম-শ্লেষ্মাদি তার গায়ে নিক্ষেপ করে তার অপমান করাকেও বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায়। বিশ্বাসকারীর ক্ষতি সাধনকারী, বিশ্বাস ভঙ্গকারী ব্যক্তি নিন্দনীয়।

পঞ্চতন্ত্রের লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে একটি শ্লোকে বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির সবিশেষ নিন্দা করা হয়েছে। সমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে বিবেচিত যে সকল কর্ম তার মধ্যে বিশ্বাস ভঙ্গকে গর্হিততম কর্ম বলে গল্পকার উল্লেখ করেছেন। স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের মত উল্লেখপূর্বক বিষ্ণুশর্মা বলেছেন, ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপানকারী, ব্রতভঙ্গকারী ব্যক্তির জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে তবুও প্রায়শ্চিত্তবিধির উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গকারী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ করা হয়নি।[৭০] অর্থাৎ তার মতে, ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান করা, ব্রতভঙ্গ করা অত্যন্ত নিন্দনীয় কর্ম হওয়া সত্ত্বেও শাস্ত্রে এগুলির

---

[৬৯] একং প্রসূয়তে মাতা দ্বিতীয়ং বাক্ প্রসূয়তে।
বাগজাতিমধিকং প্রোচুঃ সোদর্যাদপি বন্ধুবত্ ।। পঞ্চ.,পৃ.৬২১

[৭০] ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌর্যে ভগ্নব্রতে শঠে।
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ।। তদেব,পৃ.৬২৫

প্রায়শ্চিত্তবিধি উল্লিখিত হয়েছে , যাতে এরূপ কর্মকারী ব্যক্তি পাপস্খালন করতে সমর্থ হয়। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে বিশ্বাসভঙ্গকারী প্রায়শ্চিত্তবিধির উল্লেখ নেই। অর্থাৎ বিশ্বাসভঙ্গকারী ব্যক্তি পাপিষ্ঠতম, এমন পাপকর্মকারী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত করে পাপস্খালনের সুযোগও শাস্ত্রকারেরা দেননি । অর্থাৎ স্মৃতিকারগণ এমন ব্যক্তিকে ইহলোক ও পরলোক উভয়ক্ষেত্রেই শাস্তির বিধান দিয়েছেন। বিশ্বাসঘাতক সম্পর্কে স্মৃতিশাস্ত্রে কিরূপ বিধান দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করার পাশাপাশি বিষ্ণুশর্মা নিজেও বিশ্বাসভঙ্গকারী ব্যক্তির শাস্তি তথা পরিণতি সম্পর্কে সকলকে অবগত করেছেন। বিশ্বাসকারী ব্যক্তির বিশ্বাসের মূল্য না দেওয়াকে সর্বাধিক পাপ বলেছেন। তাঁর মতে, যে মিত্রের সাথে দ্রোহ করে, যে অকৃতজ্ঞ এবং যে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে যতদিন সূর্য ও চন্দ্র বিরাজ করে ততদিন নরকে অবস্থান করে।[৭১] মিত্রকে আঘাত করা, নিকৃষ্ট দ্রব্য নিক্ষেপণ করে তাকে অপমান করা – এগুলি সবই মিত্রদ্রোহ। দ্রোহ কথার অর্থ অপকার করা। বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তিকে আঘাত করাও বিশ্বাসঘাতকতা। এরূপ আঘাতকারী স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে দণ্ডপারুষ্যকারী।

তাদের ইহলোকে কী শাস্তি প্রাপ্য তা স্মৃতিশাস্ত্রে ও সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে আবার পরলোকে বা পরজন্মেও যে তারা শাস্তি থেকে মুক্ত হবে না তা *পঞ্চতন্ত্রের* মিত্রভেদ তন্ত্রের আলোচ্য শ্লোকে মেলে। এই তন্ত্রে অপর একটি শ্লোকের দ্বারাও তিনি মিত্রের ক্ষতিসাধনকারীর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বলেছেন। যে ব্যক্তি মিত্রকে আঘাত করে, মিত্রের অপকার করে তার পাপস্খালন কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। বিষ্ণুশর্মা ব্রহ্মহত্যাকারী অপেক্ষা মিত্রদ্রোহকারীকে অধিক অপরাধী বলেছেন। তাঁর মতে, ব্রাহ্মণের বধ করে তদনুকূল প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে শুদ্ধ হওয়া সম্ভব কিন্তু মিত্রের ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তি কোনো অনুষ্ঠান করেই শুদ্ধ হতে পারে না।[৭২] মনুর বচন উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, বিশ্বাসভঙ্গের কারণে যদি কারো মৃত্যু হয় তবে

---

[৭১] মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ।
তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।। পঞ্চ.,পৃ.২৯৯

[৭২] অপি ব্রহ্মবধং কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তেন শুধ্যতি।
তদর্হেণ বিচীর্ণেন ন কথঞ্চিৎসুহৃদ্দ্রোহঃ।। তদেব,পৃ.১৯৩

তার মৃত্যুর দোষ বিশ্বাসভঙ্গকারীর হয়।[৭৩] কোনো ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে তার কারণে কারো মৃত্যু হলে যে ব্যক্তির উপরে বিশ্বাস করার জন্য মৃত্যু হয় সেই দোষী হয়। বিশ্বাসভঙ্গকারীর শাস্তি সম্পর্কে স্মৃতির যে বিধান অনুসারে *পঞ্চতন্ত্রে* বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে কেউ তার কারণে অন্য কারোর দ্বারাও আহত হয় তবে যাকে বিশ্বাস করার কারণে আহত ব্যক্তিকে আহত হতে হয়েছে তারই দোষ হয়। এক্ষেত্রে মৃত্যুর কথা উল্লেখ থেকে ধরেই নেওয়া যায় আহত হওয়ার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম কার্যকরী হবে। মৃত্যু সর্বাধিক আঘাতেরই পরিণতি, তাই স্বল্পাঘাতেও একই নিয়ম কার্যকরী হবে এমনটা ধরেই নেওয়া যায়।

কোনো ব্যক্তি আঘাত স্মৃতির বিধান অনুযায়ী দণ্ডপারুষ্য বিবাদপদের অধীন। স্মৃতিকারগণ কী দ্বারা আঘাত করা হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে দণ্ডপারুষ্যের প্রকার ভেদ করেছেন। কী দ্বারা আঘাত করা হয়েছে যেহেতু তার উপরে ক্ষতের পরিমাণ নির্ভর করে তাই প্রকার ভেদ অনুযায়ী দণ্ডপারুষ্যের দণ্ডবিধিও নির্দিষ্ট হয়েছে। বিষ্ণুও আঘাতের পরিমাণের ওপরে ভিত্তি করে দণ্ড বিধান করেছেন। তবে এই সকল স্মৃতিকারগণ কাকে আঘাত করা হচ্ছে তারও পর্যালোচনা করে দণ্ডবিধান করেছেন। লাঠি-প্রস্তর দ্বারা আঘাতের শাস্তি অপেক্ষা ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাতের অধিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কাত্যায়নের মতে, কান-অধর-নাক-পা-চোখ-জীভ-লিঙ্গ-হাত কাটলে সর্বাধিক দণ্ড হবে, আর যদি কেবল আঘাত করা হয় তবে মধ্যম দণ্ড হবে।[৭৪] গল্পসাহিত্যে দণ্ডপারুষ্যের শাস্তি বিধানের যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত মেলে সেখানে প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রহারের শাস্তি প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থের 'অপরীক্ষিতকারক' তন্ত্রের 'ক্ষপনককথা' গল্পে একজন নাপিত জৈন ভিক্ষুকগণকে গৃহে বদ্ধ করে তাদের লাঠি দ্বারা আঘাত করে। তাঁর এই অপরাধে রাজা তাকে শূলে

---

[৭৩] বিশ্রম্ভাদ্যস্য যো মৃত্যুমবাপ্নোতি কথঞ্চন।
তস্য হত্যা তদুত্থা সা প্রাদেহং বচনং মনুঃ।। পঞ্চ.,পৃ.১৯২

[৭৪] কর্ণৌষ্ঠঘ্রাণপাদাক্ষিজিহ্বাশিশ্নকরস্য চ।
ছেদনে চোত্তমো দণ্ডো ভেদনে মধ্যমঃ।। কাত্যা.,৭৮১

চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।[৭৫] কেবল আঘাতের অপরাধে আলোচ্য গল্পে রাজা নাপিতকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন দেখে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে রাজা অধিক দণ্ড দিয়েছেন। কারণ স্মৃতিশাস্ত্রেও লাঠি দ্বারা আঘাতে মৃত্যুদণ্ড বিহিত হয়নি। তবে এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন তা হল নাপিত সমাজে নিম্নস্থানীয় এবং সে সন্ন্যাসীদের আঘাত করেছে, যাঁরা তাঁদের ত্যাগ, সংযম ইত্যাদির জন্য শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাই তাঁদের আঘাত করা কোনো সাধারণ ব্যক্তিকে আঘাতের সমান অপরাধ নয়। এছাড়াও নাপিত লাঠি দ্বারা শুধু আঘাত করেনি, লাঠির আঘাতে সে কোনো সন্ন্যাসীকে মেরে ফেলেছে, আবার কারো মস্তকে প্রবলভাবে আঘাত করেছে যার ফলে সন্ন্যাসীগণ হাহাকার করে রোদন করতে শুরু করেছে।[৭৬] অতএব নাপিতের অপরাধকে কোনোভাবেই লঘু করে দেখা উচিত নয়।

স্মৃতিশাস্ত্রে হস্ত, প্রস্তর, লাঠি ইত্যাদি দ্বারা আঘাতে মৃত্যুদণ্ড বিহিত হয়নি। কিন্তু কেউ কারো ত্বক্ কেটে দিলে, অস্থি ভেঙ্গে দিলে, রক্তপাত ঘটালে কিংবা এমনভাবে আঘাত করলে যাতে ব্যক্তির প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকে এমন প্রবল আঘাতে অপেক্ষাকৃত বেশি দণ্ড দেওয়া হয়েছে। রক্ত নিষ্কাশিত হয় এমন আঘাতকে উত্তম দণ্ডপারুষ্য বলেছেন। এরূপ আঘাতকে সর্বাধিক বলা হয়েছে। সুতরাং স্মৃতির বিচারে নাপিতের অপরাধ অধিকতম। তাই অধিকতম অপরাধে তার অধিকতম শাস্তি হওয়াই কাম্য। কাত্যায়ন সমাজের নিম্ন স্থানীয় দণ্ডপারুষ্যকারী অপরাধীকে শারীরিক দণ্ডই দিতে বলেছেন। কাত্যায়নের মতে, যদি দণ্ডপারুষ্যকারী ব্যক্তি অস্পৃশ্য, ধূর্ত প্রকৃতির, দাস-দাসী স্থানীয় বা ম্লেচ্ছ বলে পরিচিত হয় বা পাপকর্মে লিপ্ত কোনো ব্যক্তি কিংবা প্রতিলোম বর্ণের ব্যক্তি হয় তবে তাদের অর্থদণ্ড হবে না, তাড়নাদি দণ্ড হবে।[৭৭] তাদের পেশার কারণে, চারিত্রিক ত্রুটির কারণে বা অসৎ কর্মকারী হওয়ায় তাদের অর্থও দূষিত বলে বিবেচিত

---

[৭৫] ততঃ পরং গৃহমধ্যে তান্ প্রবেশ্য দ্বারং নিভৃতং বিধায় লগুডপ্রহারৈঃ শিরসি অতাডয়ত্।...অথ তৈঃ অভিহিতম্ - 'অহো ! শূলম্ আরোপ্যতাম্ অসৌ দুষ্টাত্মা কুপরীক্ষিতকারী নাপিতঃ।' পঞ্চ.,পৃ.৭১৫

[৭৬] তেঽপি তাড্যমানা একে মৃতাঃ, অন্যে ভিন্নমস্তকাঃ ফূৎকর্তুম্ উপচক্রমিরে। তদেব,পৃ.৭১৫

[৭৭] অস্পৃশ্যধূর্তদাসানাং ম্লেচ্ছানাং পাপকারিনাম্।
প্রতিলোমপ্রসূতানাং তাডনং নার্থতো দমঃ।। কাত্যা.,৭৮৩

হবে। অন্ত্যজ শ্রেণির তাড়ন, মারণ এই সকল শারীরিক দণ্ডই প্রাপ্য। এবিষয়ে স্মৃতিতে আরও বিধান মেলে। বৃহস্পতির মতে, প্রতিলোমজ ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ অসৎ বা দুষ্ট, তারা ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করলে বধ করা হবে, তাদের কাছ থেকে কোনো ধন নেওয়া হবে না।[৭৮] অর্থাৎ গল্পে রাজা নাপিতকে চরমতম যে শারীরিক দণ্ড দিয়েছেন তা স্মৃতিসম্মত এমনটা বলা যায়। কারণ নাপিতের আঘাতে কারো প্রাণনাশ হয়েছে, কারো রক্তপাত ঘটেছে। তাই নাপিতের সর্বাধিক দণ্ড প্রাপ্য। যেহেতু সে অন্ত্যজ শ্রেণীর তাই তার ক্ষেত্রে অর্থ দণ্ড নয় শারীরিক দণ্ডই বিহিত হওয়া উচিত । এক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে, তাকে শূলে চড়িয়ে বধের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

কেবল প্রস্তর, লাঠি কিংবা কোনো অস্ত্র দ্বারা আঘাতই অপরাধ নয়। কারো গায়ে নিকৃষ্ট দ্রব্য যেমন ভস্ম-শ্লেষ্মা ইত্যাদি দ্রব্য প্রক্ষেপণ করাও অপরাধ আবার কোনো কিছু নিয়ে কাউকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে উদ্যত হওয়াও অপরাধ। এক্ষেত্রে ব্যক্তি যে দ্রব্যটি নিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হয় তার উপর ভিত্তি করে দণ্ডবিধান করা হয়। অর্থাৎ যে দ্রব্য নিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে, তা দ্বারা আঘাত করা হলে তার তীব্রতা কতটা হতে পারে তার ভিত্তিতে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হবে। যেমন লাঠি নিয়ে আঘাত করা হলে আঘাতের তীব্রতা অপেক্ষা অনেক বেশি, তাই লাঠি নিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি উদ্যত হয় তার শাস্তি অস্ত্র নিয়ে আঘাত করতে উদ্যত ব্যক্তির তুলনায় কম হবে। এই নিয়মটি স্মৃতিশাস্ত্র ও গল্পসাহিত্যে একই।

স্মৃতিশাস্ত্রেও কোনো কিছু নিয়ে আঘাত করতে উদ্যত ব্যক্তির উদ্যত দ্রব্যের ওপর ভিত্তি করে দণ্ডবিধান করা হয়েছে আবার আখ্যানসাহিত্যেও একই দণ্ডবিধি চোখে পড়ে। *দশকুমারচরিতের* মন্ত্রগুপ্তচরিত অংশে কলিঙ্গরাজকন্যা কনকলেখার কেশ আকর্ষণ করে কিঙ্করকে শাণিত তরবারি নিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হতে দেখা যায়। সে অস্ত্র দ্বারা আঘাত না করলেও উদ্যত হওয়ার অপরাধে রাজকুমার মন্ত্রগুপ্ত তাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন। কিঙ্কর রাজকুমারীর কেশ আকর্ষণ করলেও অস্ত্র দ্বারা কোনোরূপ আঘাত করেনি। গল্পে তার এই অপরাধে তাকে

---

[৭৮] প্রতিলোম্যাস্তথা চান্ত্যাঃ পুরুষাণাং মলাঃ স্মৃতাঃ।
ব্রাহ্মণাতিক্রমে বধ্যা ন দতব্যা ধনং ক্বচিত্ ।। বৃহ.,২১.২০

মৃত্যদণ্ডরূপ শাস্তি দেওয়া হয়েছে।[৭৯] যেহেতু তরবারি দ্বারা আঘাতে প্রাণপাতের সম্ভাবনা থেকে তাই এই শস্ত্র উদ্যত করার অপরাধে তাকে মৃত্যদণ্ড দেওয়া হয়েছে এমনই অনুমান করা যায়। কারণ কেবল কেশ আকর্ষণ করার শাস্তি স্বরূপ কিঙ্করকে মৃত্যদণ্ড দেওয়া হয়েছে এমন বলা যায় না।

কারো কেশ আকর্ষণ করে তাকে পীড়া দেওয়া অবশ্যই অপরাধ, কোনো নারীকে এরূপ আঘাত আরও ঘৃণ্য অপরাধ, এমন অপরাধীরও শাস্তি প্রাপ্য। কিন্তু এই অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াকে অধিক দণ্ডবিধান বলা যায়। স্মৃতিশাস্ত্রেও যা নিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হয় তার দ্বারা কী পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে তার উপরে ভিত্তি করে দণ্ডবিধি নিশ্চিত করা হয়েছে। বিষ্ণুর মতে, কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে যা নিয়ে সে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে তার গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে দণ্ডপারুষ্যের শাস্তি বিহিত হয়েছে। অর্থাৎ আক্রমণকারীর ব্যবহৃত অঙ্গ বা অস্ত্রাদি উপকরণ আক্রান্ত ব্যক্তির কী পরিমাণ ক্ষতিসাধন করতে পারে তার ভিত্তিতে দণ্ডের তারতম্য করা হয়েছে। হস্ত উদ্যত করলে দশ কার্ষাপণ দণ্ড, চরণ উদ্যত করলে বিংশতি কার্ষাপণ দণ্ড, দণ্ড-কাষ্ঠ উদ্যত করলে প্রথম সাহস দণ্ড, প্রস্তর উদ্যত করলে মধ্যম সাহস দণ্ড এবং শস্ত্র উদ্যত করলে শস্ত্র দ্বারা আক্রমণে আঘাত অধিক হয় এমনকি প্রাণনাশেরও আশঙ্কা থাকে তাই গল্পসাহিত্যের ন্যায় স্মৃতিতেও সর্বাধিক দণ্ড বিহিত হয়েছে। কারো কেশ আকর্ষণ করাও স্মৃতিশাস্ত্রে অপরাধ। স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ এমন অপরাধের পৃথক্ ভাবে দণ্ডবিধানও করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, হস্ত, পাদ, কেশ, বস্ত্র ধরে আকর্ষণ করলে দশপণ দণ্ড হবে।[৮০] নারদ, এমন কার্যকারীর হস্তচ্ছেদন করতে বলেছেন। তাঁর মতে কেশ আকর্ষণকারীকে রাজা কোনো বিচার না করেই তার হস্তচ্ছেদন করবেন।[৮১]

---

[৭৯] ...শেখরস্রজি ক্ষীর্ণনহনে শিরসিজানাং সঞ্চয়ে নিগৃহ্যাসিনা শিলাশিতেন... ঝটিতি চাচ্ছিদ্য তস্য হস্তাত্তাং শাস্ত্রিকাং তয়া নিকৃত্য তচ্ছিরঃ সজটাজালং নিকটস্থস্য কস্যচিজ্জীর্ণসালস্য স্কন্ধরন্ধ্রে ন্যধিয়ি। তারাচরণ ভট্টাচার্য,দশ.,পৃ.৩৫২

[৮০] পাদকেশাংশুককরোল্লঞ্চনেষু পণান্ দশ। যাজ্ঞ.,২.২১৭

[৮১] কেশেষু গৃহ্নতো হস্তৌ ছেদয়েদবিচারয়ন্ । নারদ.,,১৫.২৮

দশকুমারচরিতে রাজকুমার মন্ত্রগুপ্ত শস্ত্র উদ্যত করার জন্য কিংকরকে মৃত্যদণ্ডরূপ যে শাস্তি দিয়েছেন তা স্মৃতিসম্মত। উদ্যত অস্ত্রধারীর দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে স্মৃতির বিধানের সাথে *দশকুমারচরিতে*র দণ্ডবিধির সাদৃশ্য এক্ষেত্রে স্পষ্ট। নারীর কেশ, বস্ত্র ধরে আকর্ষণ দণ্ডনীয় অপরাধ, তাকে প্রহার করা, পীড়ন করা ততোধিক গুরুতর অপরাধ।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে নারীর কেশ আকর্ষণ, বস্ত্র আকর্ষণ ইত্যাদির পৃথক শাস্তি উল্লিখিত না হলেও গল্পসাহিত্যে স্ত্রীকে পীড়নের দণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। স্মৃতিতে বস্ত্র-কেশ আকর্ষণে শাস্তি উল্লেখ করা হলেও স্ত্রীর সাথে এমন আচরণ করা হলে কী শাস্তি হবে তা পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করা হয়নি। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা* গল্পগ্রন্থের দ্বাদশ উপাখ্যানে রাজা বিক্রমাদিত্য বেণুবনে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পান। তার কারণ অনুসন্ধান করতে অগ্রসর হয়ে তিনি দেখেন রাক্ষস একজন স্ত্রীকে প্রহার করছে। তাকে নিবারণ করতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে বিরত না হওয়ায় রাজা দণ্ডস্বরূপ তাকে হত্যা করেছেন।[৮২] প্রহারের শাস্তি এক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড বিহিত হয়েছে। বিক্রমাদিত্যের ন্যায় বিচক্ষণ সবিচারক রাজা নারীকে প্রহারকারীর এমন সর্বাধিক দণ্ড দিয়েছেন, যা থেকে বোঝা যায় স্ত্রীকে পীড়ন করাকে তিনি অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ বলে বিবেচনা করেছেন এবং এমন কার্যকারীকে প্রাণদণ্ডরূপ সর্বাধিক দণ্ড দিয়ে নারীদের নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট হয়েছেন।

স্মৃতিতে অবশ্য, নারীকে প্রহার করলে কী শাস্তি হবে কিংবা অধিক দণ্ড হবে কি না সে বিষয়ে পৃথক্ নির্দেশ মেলে না। তাই কাউকে প্রহারের ক্ষেত্রে যা শাস্তি নারীকে প্রহার করলেও সমদণ্ড বিহিত হবে এমন বলা যায়। তবে, যাজ্ঞবল্ক্য ভস্ম, রজঃ, পঙ্ক, শ্লেষ্মাদি দ্রব্য প্রক্ষেপণকারীর দণ্ডবিধান প্রসঙ্গে স্ত্রীজাতির প্রতি এমন আচরণকারীর অধিক দণ্ডের বিধান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন কোনো ব্যক্তি নারীর গায়ে এই সকল অশৌচ দ্রব্য নিক্ষেপ করলে সমবর্ণের ক্ষেত্রে বিহিত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড পাবে।[৮৩] এই সকল দ্রব্যাদি প্রক্ষেপে তীব্র আঘাত দেহে হয় না কিন্তু অশৌচ দ্রব্যাদি প্রক্ষেপণের দ্বারা ব্যক্তির অবমাননা-অপমান করা হয়। স্ত্রীজাতির এমন

---

[৮২] সিংহাসন.,পৃ.৪৭

[৮৩] সমেষ্ববং পরস্ত্রীষু দ্বিগুণস্তূত্তমেষু চ। যাজ্ঞ.,২.২১৪

অবমাননাকারীকে দণ্ডবিধান করে স্মৃতিকারগণ আঘাতের পাশাপাশি অপমান করাকেও দণ্ডনীয় অপরাধের আওতাধীন করেছেন। কোনো মানুষকে আঘাত তাকে অপমান করা গল্পসাহিত্যে ও স্মৃতিতে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছে। কেবল মানুষের ক্ষতিসাধনই নয়, যে কোনো প্রকার হিংসাত্মক কর্মেরই উভয় ক্ষেত্রে দণ্ডবিধান করা হয়েছে। যে কোনো পশুর ক্ষতিসাধন, বৃক্ষাদির অনিষ্টকারী ব্যক্তিকে উভয় স্থলেই নিন্দা করা হয়েছে এবং এমন অপরাধীর দণ্ডও নিশ্চিত করা হয়েছে।

*পঞ্চতন্ত্র*গ্রন্থের কাকোলূকীয়ম্ তন্ত্রের 'শশ-কপিঞ্জলকথা' গল্পে বৃক্ষ-পশু সমূহের ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তির প্রভূত নিন্দা করা হয়েছে। বৃক্ষ কেটে, পশুদের হত্যা করে কোনো ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে না, বরং এমন কর্ম তাকে নরকেই নিয়ে যায়।[৮৪] বৃক্ষাদির দ্বারা মানুষের নানান উপকার সাধিত হয়। এছাড়াও পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিত বৃক্ষসমূহের পৃথক্ পথক্ মাহাত্ম্যও থাকে। যেমন- বৃক্ষাদির দ্বারা সীমানা নির্দিষ্ট করা হয়, মন্দির ইত্যাদি স্থানে অবস্থিত বৃক্ষাদিকে মানুষ পবিত্র বলে মানে, অনেক বৃক্ষসমূহ ঔষধাদির উৎস হয়ে থাকে, সর্বোপরি বৃক্ষ তার ফল-ফুল দিয়ে মানুষের প্রভূত হিত সাধন করে। তাই বৃক্ষছেদনকারীকে নরকগামী বলা হয়েছে। বৃক্ষছেদন এমন অপরাধ কর্ম যার শাস্তি ব্যক্তিকে মৃত্যুর পরও ভোগ করতে হয়।

সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা গ্রন্থের অষ্টাবিংশ উপাখ্যানে বৃক্ষের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। সেখানে রাজা বিক্রমাদিত্যকে মহাজনেরা বৃক্ষের ন্যায় পরোপকারক বলে সম্বোধন করেছেন। শাস্ত্রস্মরণ করে তারা বৃক্ষের গুণ বর্ণনা করেছেন- বৃক্ষেরা শিরে দারুণ রৌদ্র তাপ সহ্য করেও ছায়া দান করে আশ্রিত জনের সন্তাপ দূর করে। প্রতিদিন লোকের উপকারের জন্য তারা কষ্ট স্বীকার করে। তাদের স্বভাবই এরূপ।[৮৫] স্মৃতিগ্রন্থে বৃক্ষাদির ক্ষতিসাধনও একপ্রকার দণ্ডপারুষ্য বলে বর্ণিত হয়েছে। কেউ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করলে ঐ ব্যক্তির

---

[৮৪] বৃক্ষাংশ্ছিত্বা পশূন্ হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দমম্।
যদ্যেব গম্যতে স্বর্গে নরকং কেন গম্যতে।। পঞ্চ.,পৃ.৪৯৩

[৮৫] সিংহাসন.,পৃ.৮২

কীরূপ শাস্তি প্রাপ্য সে সম্পর্কেও সংহিতাকারগণ দণ্ড বিধান করেছেন। মনু কোন বৃক্ষের ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তির কী শাস্তি হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলেননি। তিনি যে কোনো প্রকার গাছের ক্ষতি সাধিত হলে তার পাতা-ফুল-ফল প্রভৃতি অংশের ক্ষতির ন্যূনতা বা আধিক্য বিবেচনা করে, যে পরিমাণ ক্ষতি হবে সেই অনুযায়ী দণ্ড বিধান করার কথা বলেছেন।[৮৬] কাত্যায়নও মনুর ন্যায় বৃক্ষাদির ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী দণ্ড বিধান করেছেন। *বিষ্ণুধর্মসূত্রে* যে বৃক্ষগুলি গুণ সমৃদ্ধ ও প্রয়োজনীয় তার ক্ষতিতে বেশি দণ্ড বিহিত হয়েছে। ফলোপগম বৃক্ষ ছেদন করলে উত্তম সাহস দণ্ড, পুষ্পোগম বৃক্ষ ছেদনে মধ্যম সাহস দণ্ড, বল্লী-গুল্মলতা-তৃণচ্ছেদন করলে এক কার্ষাপণ দণ্ড বিহিত হয়েছে।[৮৭] তিনি অর্থে দণ্ডের বিধান দেওয়ার পাশাপাশি এক্ষেত্রে বৃক্ষস্বামীর ওপর ঐরূপ আর একটি প্রস্তুত করতে যে অর্থ ব্যয় হয় সেই পরিমাণ অর্থ তাকে দেওয়ার কথা বলেছেন।[৮৮]

পশুহিংসা, পশুকে আঘাত, পশুর ক্ষতিসাধন, বিনা কারণে হত্যা এগুলিকেও আখ্যানসাহিত্যে নিষেধ করা হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থের* 'শশ-কপিঞ্জলকথা' গল্পে অহিংসাকেই পরমধর্ম বলা হয়েছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীকেও রক্ষা করা উচিত এমন উপদেশ সেখানে মেলে। বিষ্ণুশর্মার মতে, হিংস্র পশুসকলকেও হত্যা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি এমন কার্য করে তিনি নির্দয়ী এবং নরক প্রাপ্ত হন। যিনি অহিংস্র পশু বধ করেন তাকে আরও ঘৃণ্য বলা হয়েছে এবং তিনি ঘোর নরক প্রাপ্ত হন।[৮৯] তিনি, যজ্ঞাদির জন্য পশুবলি দেওয়াকেও সমর্থন করেননি, নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে যারা বৈদিক যজ্ঞাদির কারণে পশু হত্যা করেন তারা মূর্খ, তারা শ্রুতির বাস্তবিক অর্থ অনুধাবন করতে পারেন না। শ্রুতিতে উক্ত-'অজৈঃ যষ্টব্যম্' এই বাক্যটিকেও তিনি ব্যাখ্যা করে

---

[৮৬] বনস্পতীনাং সর্বেষামুপভোগো যথা যথা।
তথা দমঃ কার্যো হিংসায়ামিতি ধারণা।। মনু.,৮.২৮৫

[৮৭] ফলোপগমচ্ছেদী তূত্তমসাহসম্।পুষ্পোপগমচ্ছেদী মধ্যমম্।বল্লীগুল্মলতাচ্ছেদী কার্ষাপণশতম্। তৃণচ্ছেদ্যেকম্।- বি.ধ.সূ.,৫.৫৫-৫৮

[৮৮] সর্বে চ তৎস্বামিনাং তদুৎপত্তিম্। তদেব,৫.৫৯

[৮৯] হিংসকান্যপি ভূতানি যো হিনস্তি স নির্ঘৃণঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং পুনর্যঃ শুভানি চ।। পঞ্চ.,পৃ.৪৯৩

যজ্ঞে পশুবধ নিয়ম বিরুদ্ধ বলেছেন। 'অজ' বলতে তিনি সপ্তবর্ষ পুরোনো যবকে বুঝিয়েছেন, পশু বিশেষকে নয়।[৯০] পৃথিবীতে সকল প্রাণীরই বাসের সমান অধিকার আছে। তাই নিজের বলের অপপ্রয়োগ করে প্রাণীগণের সেই অধিকার মানুষ কখনই অস্বীকার করতে পারে না। ক্ষুদ্রপ্রাণী জোঁক, খটমল থেকে শুরু করে যজ্ঞীয় পশু যাকে আমরা পবিত্র মনে করি তারও উল্লেখ করে গল্পকার সকল পশুগণকেই রক্ষা করবার কথা বলেছেন। যে কোনো প্রাণী হিংসাকেই নিন্দা করেছেন। প্রাণীহিংসাকে এমন অপরাধ বলে উল্লেখ করেছেন যার ফল অপরাধীকে পরজন্মেও ভোগ করতে হয়। অত্যন্ত সামান্য কোনো প্রাণীকে হত্যা করলে তথাকথিতভাবে বিচারালয়ে তার বিচার হয় না, শাস্তিও হয় না। কিন্তু গল্পকারের পরজন্মে অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হয় এমন উল্লেখ থেকে বোঝা যায় তিনি কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীকেও আঘাত করা অনুচিত ও দণ্ডনীয় বলেছেন। অত্যন্ত তুচ্ছ প্রাণীহিংসাকারী ব্যক্তি এই সামান্য অপরাধের জন্য ইহজগতের বিচারালয়ে দণ্ড না পেলেও তার অপরাধের জন্য তাকে পরজন্মে দণ্ড ভোগ করতেই হয়। বিনা কারণে কোনো প্রাণিকে আঘাতকারী ব্যক্তির দণ্ডের দৃষ্টান্ত গল্পসাহিত্যে মেলে।

*পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থে*র 'কাকূলোকীয়ম্' তন্ত্রের 'ব্রাহ্মণ-সর্পকথা' গল্পে ব্রাহ্মণ পুত্র লোভের বশবর্তী হয়ে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার পিতার উপকারক এক সর্পকে আঘাত করে। এই আঘাতের দণ্ডস্বরূপ তার মৃত্যু হয়। পুত্রশোকে আকুল হলেও ব্রাহ্মণ পুত্রের এমন কর্মের জন্য তাকে অর্থাৎ তার পুত্রকে শাস্তি পেতে হয়েছে এমন মনে করছে। পুত্রের মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করেছে।[৯১] ব্রাহ্মণ তার পুত্রকেই দোষী বলে মেনেছে। পুত্রকে উচিত দণ্ডই দিয়েছে তাই সে সর্পটির প্রতি পূর্বের ন্যায়ই আচরণ করেছে। নিরপরাধ প্রাণীকে হত্যা করলে তাকে দণ্ড পেতেই হবে আলোচ্য গল্পটিতে তাই প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পসাহিত্যে পশুকে আঘাতকারী ব্যক্তির প্রভূত নিন্দা করা হলেও এবং এই অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও *পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থে* এ বিষয়ে বেশ কিছু

---

[৯০] এতেঽপি যাজ্ঞিকা যজ্ঞকর্মণি পশূন্ ব্যাপাদয়ন্তি, তে মূর্খাঃ পরমার্থশ্রুতেঃ ন জানন্তি। তত্র কিল এতদুক্তম্- অজৈঃ যষ্টব্যম্। অজা- ব্রীহয়ঃ তাবত্ সপ্তবার্ষিকাঃ কথ্যন্তে, ন পুনঃ পশুবিশেষাঃ। পঞ্চ.,পৃ.৪৯৩

[৯১] ...ব্রাহ্মণপুত্রেণ সর্পঃ লগুডেন শিরসি তাডিতঃ,...রোষাত্ তমেব তীব্রবিষদশনৈঃ তথা অদশত্, যথা সদ্যঃ পঞ্চত্বমুপাসতঃ।...তস্য পিতা সমাযাতঃ স্বজনেভ্যঃ সুতবিনাশকারণং শ্রুত্বা তথৈব সমর্থিতবান্। তদেব,৫১৭

ব্যতিক্রমী উক্তি চোখে পড়ে। বিষ্ণুশর্মা যে কোনো কারণেই পশুহত্যাকে নিন্দনীয় এমন বললেও, *পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থের* 'কাকোলূকীয়ম্' তন্ত্রে 'মুষিকাবিবাহকথা' গল্পে ভিন্নধর্মী কিছু বক্তব্য দেখা যায়। সেখানে বাজপাখি একটি মূষিককে ভক্ষণ করতে উদ্যত হলে এক মুনি বাজকে আঘাত করে তার কাছ থেকে মূষিককে উদ্ধার করেন। ভোজ্যদ্রব্য মূখ থেকে নিয়ে নেওয়ায় বাজ মুনিকে প্রভূত তিরস্কার করেছে। সে মুনিকে উদ্দেশ্য করে বলেছে যার জন্য যে বস্তু ভোজনরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ভক্ষণ করলে কোনো দোষ হয় না। কিন্তু অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করলে বহু দোষ হয়। তাই প্রাকৃতিক নিয়মের উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয়।[৯২]

আমাদের বাস্তুতন্ত্রের নিয়মে যাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক সেখানে ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রাণীহত্যা স্বাভাবিক। তা যদি না করে তবে আহারহীন হয়ে সংশ্লিষ্ট প্রাণীটির মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে দাড়ায়। তাই বিষ্ণুশর্মা প্রাণীহিংসা তথা হত্যার নিষেধ করেও আহারের জন্য নির্দিষ্ট পশুকে হত্যাকারী দণ্ড মুকুব করেছেন। আবার অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ পাপ এমন উক্তি দ্বারা ভক্ষণীয় নয় এমন প্রাণীকে হত্যা করা অনুচিত তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, আহারের জন্য নির্দিষ্ট পশু হত্যা করা উচিত। আহার ভিন্ন অন্য কোনো কারণে পশুহত্যা করা উচিত নয়। খাদ্য-প্রাণীহত্যাকারীর প্রাণীহত্যার অধিকার স্বীকার করার পাশাপাশি এমন হত্যাকারীর প্রশংসাও তিনি করেছেন। তিনি বলেছেন, ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করলে পুণ্য হয় এবং অভক্ষ্য দ্রব্য মহা পাপ হয়।[৯৩]

পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থে পশুহত্যাবিষয়ক এই আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে, বিষ্ণুশর্মা বিনা কারণে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী তথা পশু হত্যার নিষেধ করেছেন, এমন কার্যকে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি এবিষয়ে বিধাতার সৃষ্ট যে নিয়মে বাস্তুতন্ত্রে সকল প্রাণী বেঁচে সেই নিয়মও খুব স্পষ্টভাবে ফূটিয়ে তুলেছেন। যার খাদ্য যা তা সংগ্রহের জন্য কোনো প্রাণীকে হত্যা করা হলে তা পাপ নয় বরং পুণ্য – বিষ্ণুশর্মার এমন উক্তি তারই প্রমাণ।

---

[৯২] যদ্যস্য বিহিতং ভোজ্যং তত্তস্য প্রদুষ্যতি।
অভক্ষ্যে বহুদোষঃ স্যাত্তস্মাৎকার্যো ব্যত্যয়ঃ।। তদেব,পৃ.৫৬৫

[৯৩] ভক্ষ্যং ভক্ষয়তাং শ্রেয়ো অভক্ষ্যন্তু মহদধম্। তদেব,পৃ.৫৬৫

স্মৃতিশাস্ত্রেও পশুর অনিষ্টকারী ব্যক্তির জন্য একাধিক দণ্ডবিধি দেখা যায। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ স্মৃতিকারগণ বৃহৎ বা ক্ষুদ্র সেই অনুযায়ী পশুহত্যা বা পশুকে আঘাতের দণ্ড নির্দিষ্ট করেছেন। বৃহৎ পশুকে প্রহার বা হত্যার দণ্ড, ক্ষুদ্র পশুর হত্যার চেয়ে বেশি করা হয়েছে। ছাগল, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতি পশু তাড়না করলে, রক্তপাত ঘটালে, শৃঙ্গ-চরণ প্রভৃতি ছেদন করলে যথাক্রমে দুইপণ, চারপণ ও আটপণ দণ্ড হবে এরূপ *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* বলা হয়েছে।[৯৪] মনুর মতে, গাধা, ছাগল ও ভেড়াবধে পাঁচমাষা দণ্ড হবে। কুকুর-শূকর বধ করলে একমাষা পরিমাণ দণ্ড হবে।[৯৫] *বিষ্ণুর* মতে, যে পশুগুলি নানান কাজে ব্যবহৃত হয় বা দামী বলে বিবেচিত তাদের হত্যায় অনেক বেশি দণ্ড ধার্য করা হয়েছে। এই কারণেই কীটহত্যাকারীর দণ্ড হয়েছে সব থেকে কম- এক কার্ষাপণ মাত্র।[৯৬] কাত্যায়নের মতে, যদি কেউ কোনো পশু হত্যা করে তবে হত্যাকারী পশুস্বামীকে একই প্রজাতির অন্য পশু কিনে দেবে অথবা পশুটি কিনতে যা মূল্য লাগবে তা পশুস্বামীকে দেবে।[৯৭]

অর্থাৎ গল্পসাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী বিনা কারণে কেউ পশুহত্যা করলে কিংবা পশুকে আঘাত করলে তাকে দণ্ড পেতেই হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কেবল আঘাত কিংবা হত্যা নয় শ্রান্ত, দূর্বল কোনো প্রাণীকে তার বহন করানো কিংবা কোনো কার্য করানোও অপরাধ। স্মৃতিশাস্ত্রে এমন অপরাধকারীকে যথোপযুক্ত দণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র পশু আঘাত করাই নয় ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও শ্রান্ত পশুকে দিয়ে ভার বহন করানো দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছে। কাত্যায়ন পশুকে পীড়া দানকারীর প্রথম সাহস দণ্ডের বিধান দিয়েছেন।[৯৮]

---

[৯৪] লিঙ্গস্য ছেদনে মৃত্যৌ মধ্যমো মূল্যমেব চ।
মহাপশূনামেতেষু স্থানেষু দ্বিগুণো দমঃ।। যাজ্ঞ.,২.২২৬

[৯৫] গর্দভজাবিকানাং তু দণ্ডঃ স্যাত্ পঞ্চমাষিকঃ।
মাষকস্তু ভবেদ্ দণ্ডঃ শ্বশূকরনিপাতনে।। মনু.,৮.২৯৮

[৯৬] কীটাপঘাতী চ কার্ষাপণম্ । বি.ধ.সূ.,৫.৫৪

[৯৭] প্রমাপণে প্রাণভৃতাং দদ্যাত্তৎপ্রতিরূপকম্।
তস্যানুরূপং মূল্যং বা দদ্যাদিত্যব্রবীন্মনুঃ।। কাত্যা.,৭৯২

[৯৮] শ্রান্তং তৃষ্ণার্তান্ ক্ষুধিতান্কালে বাহয়েন্নরঃ।
খরগোমহিষোষ্ট্রাদীন্ প্রাপ্নুয়াত্ পূর্বসাহসম্।। তদেব,৭৮৯

৩.সাহস

স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত বিবাদপদগুলির মধ্যে সাহস হল একটি হিংসামূলক বিবাদপদ। সহসা কৃতম্ এই অর্থে সহস্-শব্দের উত্তর ষ্ণ-প্রত্যয়যোগে সাহসশব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে । বর্তমানে আমরা Violence বলতে যা বুঝি সাহসশব্দটির দ্বারাও তাই বুঝতে হবে । অভিধানে সাহসকে একটি নপুংসকলিঙ্গ শব্দ বলা হয়েছে। সেখানে সাহসের অর্থও করা হয়েছে – Over hasty, Inconsiderate, Rashness ইত্যাদি ।[৯৯] স্মৃতিশাস্ত্রে সাহসের লক্ষণ, স্বরূপ ও দণ্ড সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায় । অপরাধমূলক কোনো কাজ যখন প্রবল দর্পসহকারে করা হয় তখনই তা সাহস পদবাচ্য হয় । সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের একাধিক গল্পে স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবহার অধ্যায়ে আলোচিত এই সাহস অপরাধটির নিদর্শন মেলে । সেখানেও স্মৃতিশাস্ত্রের ন্যায় সাহসবশত অপরাধকারীর প্রভূত দণ্ড বিহিত হয়েছে ।

গল্পসাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে সাহস অপরাধ ও তার দণ্ডবিধান সম্পর্কিত তুলনামূলক আলোচনার পূর্বে বিভিন্ন সংহিতা গ্রন্থে সাহস অপরাধের লক্ষণ, প্রকারভেদ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা জানা দরকার ।

সাহসের স্বরূপ ও লক্ষণ বিচার

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, বলপূর্বক অপরের দ্রব্য হরণ করাই সাহস।[১০০] নারদ বলেছেন, বল এবং দর্পের সাথে সহসা যে কর্ম করা হয় তাকেই সাহস বলা হয় । নারদ 'সহ' শব্দের অর্থ করেছেন বল।[১০১] অর্থাৎ বলপূর্বক এবং দর্পসহকারে হঠাৎ যে অপরাধমূলক কর্ম সম্পাদিত হয় তাই সাহস। কাত্যায়নও সাহসের লক্ষণ প্রসঙ্গে একই কথা বলেছেন। মনু বলেছেন, কোনো দ্রব্য

---

[৯৯] মনিয়ার উইলিয়াম, *স্যান্সকৃট্ ইংলিশ ডিক্সনারী*, পৃ.১২১২

[১০০] সামান্যদ্রব্যপ্রসভহরণাৎ সাহসং স্মৃতম্। যাজ্ঞ., ২.২৩০

[১০১] সহসা ক্রিয়তে কর্ম যৎ কিঞ্চিদ্বলদর্পিতৈঃ।
তৎ সাহসমিতি প্রোক্তং সহো বলমিহোচ্যতে।। নারদ., ১৬.১
তুল. সাহসা যৎ কৃতং তৎ সাহসমুদাহৃতম্ ।। কাত্যা,৭৯৫

হরণ করা হলেই তাকে সাহস বলা হবে।[১০২] বিভিন্ন সংহিতাগ্রন্থে সাহসের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায়, রাজকর্মচারীদের বা রক্ষকের উপস্থিতিতে কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিতে দ্রব্যস্বামীর কাছ থেকে কোনো দ্রব্য হরণ করাই হল সাহস। বিষ্ণুধর্মসূত্রে সাহসের দণ্ডসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করলেও সাহসের লক্ষণসম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। সাহসের স্বরূপ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংহিতাগ্রন্থে মতের ভিন্নতা দেখা যায়। কোনো কোনো সংহিতাকার সাহসকে স্তেয় বা চৌর্য থেকে পৃথক করলেও অনেকে আবার স্তেয়কে সাহসেরই একটি প্রকার বলে আলোচনা করেছেন। মনু সাহস ও স্তেয়-এর পার্থক্য নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন দ্রব্যস্বামীর উপস্থিতিতে দ্রব্যহরণ করা হল সাহস আর দ্রব্যস্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো কিছু হরণ করে পলায়ণ করা হল স্তেয়।[১০৩] তাঁর মতে সাহস হল এমন একটি কর্ম যার সাথে বল ও হিংসা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ বিষয়ে *মিতাক্ষরা*কার বিজ্ঞানেশ্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, যদি কেউ রাজদণ্ড, জনাক্রোশ উল্লঙ্ঘন করে রাজপুরুষের বা রক্ষীপুরুষের সামনে কিংবা জনসাধারণের সামনে মারণ, হরণ, পরস্ত্রী প্রধর্ষণ ইত্যাদি কার্য করে তবে তা সাহস বলে বিবেচিত হবে।[১০৪] যাজ্ঞবল্ক্য কেবল পরদ্রব্য হরণ করাকে সাহস বলে উল্লেখ করলেও টীকাকার নারদের বচন উদ্ধৃত করে দ্রব্য হরণের পাশাপাশি মারণ, পরস্ত্রীকে অপমান ইত্যাদিকেও সাহসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। *মনুসংহিতায়* সাহসের লক্ষণে উল্লিখিত 'কর্ম' শব্দটির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার মেধাতিথি বলেছেন, এর দ্বারা অন্যের পীড়াকর কর্মকে বোঝানো হয়েছে। এধরণের কর্মের উদাহরণ প্রসঙ্গে তিনি অন্যের কাপড় খুলে নেওয়া, আগুন লাগিয়ে দেওয়া, জিনিসপত্র সামনে থেকে অপহরণ করা ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। মেধাতিথির মতে শ্লোকে 'প্রসভং কর্ম' এস্থলে কর্মশব্দের উল্লেখবশত বলপূর্বক পরদ্রব্য হরণ করা

---

[১০২] স্যাৎ সাহসং ত্বন্বয়বৎ প্রসভং কর্ম যৎ কৃতম্। মনু.,৮.৩৩

[১০৩] স্যাৎ সাহসং ত্বন্বয়বৎ প্রসভং কর্ম যৎ কৃতম্।
নিরন্বয়ং ভবেত্ স্তেয়ং হৃত্বাপব্যয়তে চ যৎ।।তদেব, ৮.৩২২

[১০৪] রাজদণ্ডং জনাক্রোশং চোল্লঙ্ঘ্য রাজপুরুষেতরজনসমক্ষং যৎ কিঞ্চিন্ মারণহরণপরদারপ্রধর্ষণাদিকং ক্রিয়তে তৎসর্বং সাহসমিতি সাহসলক্ষণম্। মিতা.,২.২৩০

ছাড়াও অন্য কোনো অসঙ্গত কাজ যদি এভাবে বলপূর্বক করা হয় তাকেও সাহস বলেই ধরতে হবে।[১০৫]

সাহসের প্রকারভেদ

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন- এই তিনজন সংহিতাকার সাহসের স্বরূপ, লক্ষণ ও দণ্ড সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই সাহস কত প্রকার এবং বিভিন্ন প্রকাররে সাহসের লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেননি। নারদ ও বৃহস্পতির মতানুযায়ী সাহস চার প্রকার- মনুষ্যবধ, চৌর্য, পরস্ত্রীহরণ এবং দুই প্রকার পারুষ্য (বাকপারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য)।[১০৬] এছাড়াও *বৃহস্পতিস্মৃতি*তে হীন, মধ্যম এবং উত্তম ভেদে তিন প্রকার সাহসের উল্লেখ করা হলেও এগুলির লক্ষণ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। নারদ উত্তম, মধ্যম ও প্রথম এই তিন প্রকার সাহসের ভেদ উল্লেখ করে প্রত্যেক প্রকার সাহসের লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ফল-মূল-জলের ক্ষেত্র বা উপকরণের ভঙ্গসাধন কিংবা জোরপূর্বক তা হরণ করা হল প্রথম প্রকার সাহস।[১০৭] বলপূর্বক বস্ত্র, পশু, অন্ন, পানীয় ও গৃহোপকরণের নাশ করা মধ্যম প্রকার সাহসের উদাহরণ।[১০৮] কাউকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা, শস্ত্রদ্বারা হত্যা করা, জোরপূর্বক পরস্ত্রী গমন

---

[১০৫] কর্ম যৎ কৃতং পরপীড়াং বস্ত্রোৎপাটনাগ্নিদাহদ্রব্যাপহরণাদি অগ্নিদাহে যদ্যপি দ্রব্যাপহরণং নাস্তি তথাপি চৌর্যমেব রহসি করণাদপহ্নয়াচ্চ মন্যতে। প্রসভং কর্মেতি কর্মগ্রহণাদ্দ্রব্যাপহরাদন্যপ্যেবং কৃতময়ুক্তং সাহসমেব। মনু.,৮.৩৩২

[১০৬] মনুষ্যমারণং চৌর্যং পরদারাভিমর্ষণম্।
পারুষ্যমুভয়ং চৈব সাহসং তু চতুর্বিধম্।। বৃহ.,২৩.২
তুল.মনুষ্যমারণং স্তেয়ং পরদারাভিমর্ষণম্।
পারুষ্যং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং সাহসঞ্চ চতুর্বিধম্।। নারদ.,১৬.২

[১০৭] ফলমূলোদকাদীনাং ক্ষেত্রোপকরণষ্য চ।
ভঙ্গাক্ষেপাবমর্দাদ্যৈঃ প্রথমং সাহসং স্মৃতম্।। তদেব, ১৬.৪

[১০৮] বাসঃ পশ্বন্নপানানাং গৃহোপকরণস্য চ।
এতেনৈব প্রকারেণ মধ্যমং সাহসং স্মৃতম্।। তদেব,১৬.৫

হল উত্তম প্রকার সাহস। এছাড়াও যে কোনো প্রাণহানিকর কর্মই উত্তম সাহসরূপে বিবেচিত হবে।[১০৯]

সাহসের দণ্ডবিধান

সংহিতাকারদের মধ্যে নারদ, বিষ্ণু সাহসের দণ্ডবিধান সম্পর্কিত যে আলোচনা করেছেন সেখানে ব্রাহ্মণকে বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে তার অনেক অপরাধের দণ্ড লাঘব করা হয়েছে। *নারদস্মৃতি*তে ব্রাহ্মণ কাউকে বধ করলেও তাকে বধদণ্ডের বিধান নেই সেখানে ব্রাহ্মণকে অবধ্য বলা হয়েছে এবং তার জন্য ভিন্ন দণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে।[১১০] তবে বৃহস্পতি সকল বর্ণই অপরাধ করলে তাঁদের বধদণ্ড হবে এমন বিধান দিয়েছেন। অন্যায় যে করে, আর অন্যায় কার্যে অন্যকে যে প্রবৃত্ত করে, যে অপরাধীকে প্রশ্রয় দেয় তাঁরা সকলেই সমানভাবে দোষী। তাদের সকলেই শাস্তিযোগ্য। উল্লেখ্য, শাস্ত্রকারগণের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণুই অপরাধে সহায়তাকারীর দণ্ডবিধান করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য যে অন্যকে অপরাধে প্রবৃত্ত করে তাকে নির্ধারিত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ডের বিধান দিয়েছেন। স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে স্ত্রী নিগ্রহ একটি নিন্দনীয় অপরাধ। বর্তমানে এই বিষয়টিকে আরো গুরুতর বলে বিবেচনা করা হয়। বৃহস্পতি পরস্ত্রীনিগ্রহকে সাহসের একটি ভেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কাত্যায়ন পরস্ত্রী নিগ্রহকারীকে আততায়ী বলেছেন এবং তাকে বধদণ্ডের বিধান দিয়েছেন।

নারদ উত্তম সাহসের দণ্ড কমপক্ষে একশত পণ ও মধ্যম সাহসের দণ্ড পাঁচশত পণ বলেছেন। তাঁর মতে উত্তম সাহসের দণ্ড কমপক্ষে হাজার পণ হবে।[১১১] বৃহস্পতি প্রথম, মধ্যম, উত্তম ভেদে দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ করেছেন এবং প্রথম, মধ্যম ও উত্তম দ্রব্যের অপহরণে

---

[১০৯] ব্যাপাদো বিষশস্ত্রাদৈঃ পরদারাভিমর্শনম্।
প্রাণোপরোধি যচ্চান্যদুক্তমুত্তমসাহসম্।। নারদ,১৬.৬

[১১০] বধাদৃতে ব্রাহ্মণস্য ন বধ ব্রাহ্মণোঽর্হতি।
শিরসৌ মুণ্ডনং দণ্ডস্তস্য নির্বাসনং পুরাত্ ।
ললাটে চাভিশস্তাঙ্কঃ প্রয়াণং গর্দভেণ চ।। তদেব,১৬.১০

[১১১] তস্য দণ্ডঃ ক্রিয়াপেক্ষঃ প্রথমস্য শতাবরঃ।
মধ্যমস্য তু শাস্ত্রজ্ঞৈর্দৃষ্টঃ পঞ্চশতাবরঃ।। তদেব,১৬.১৭

অপহরণকারীর যথাক্রমে একশত পণ, দ্বিশত পণ ও দ্রব্যমূল্যের সমান দণ্ডরূপে দিতে বলেছেন।[১১২] যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু দ্রব্যের গুণাগুণ অনুসারে সেগুলির হরণে পৃথক দণ্ডবিধান করেননি। তিনি বলেছেন, অপহরণকারীকে অপহৃত দ্রব্যের দ্বিগুণমূল্য দণ্ডরূপে দিতে হবে। যদি অপহরণকারী ব্যক্তি অপরাধ অস্বীকার করে তবে তাকে নির্ধারিত দণ্ড অপেক্ষা চারগুণ বেশি দণ্ড দিতে হবে।[১১৩]

স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের বিচারে যিনি অপরাধের আরম্ভকর্তা তিনিও দণ্ডার্হ। বৃহস্পতির ও কাত্যায়ন অপরাধের আরম্ভকর্তার কি দণ্ড হবে তা নির্দিষ্ট করে বলেননি। তবে কেউ কাউকে হত্যা করতে উদ্যত হলে আক্রমণকারীকে হত্যা করতে হবে এমনটাই কাত্যায়নের মত। অর্থাৎ তাঁর মতে অপরাধের আরম্ভকর্তা যদি হত্যা করতে উদ্যত হয় তবে আত্মরক্ষার্থে তাকে হত্যা করা দোষের নয়। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি হত্যা কর্ম থেকে বিরত হয়, তবে তাকে আর হত্যা করা উচিত হবে না।[১১৪] কাত্যায়নের বিচারে অনেকে মিলে কাউকে হত্যা করার ক্ষেত্রে যে মর্মঘাতী, তিনি প্রকৃত হত্যাকারী এবং তাকে বধদণ্ড দেওয়া উচিত।[১১৫] এক্ষেত্রে মর্মঘাতী বলতে সেই আঘাতকারীকে বুঝতে হবে যার আঘাতের ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণবিয়োগ হয়। সম্ভবত এই কারণেই কাত্যায়ন তাকে প্রকৃত হত্যাকারী বলে চিহ্নিত করেছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে সাহসের দণ্ডবিধান প্রসঙ্গে কোনো অপরাধীকে কখন আততায়ী বলা হয় তা উল্লেখপূর্বক আততায়ীকে তৎক্ষণাৎ বধ করতে আদেশ করা হয়েছে এবং এমনটা না করলে পাপ হয়।

---

[১১২] বৃহ.,২৩.৬-৭

[১১৩] সামান্যদ্রব্যপ্রসভহরণাত্ সাহসং স্মৃতম্।
তন্মূল্যাদ্দ্বিগুণো দণ্ডো নিহ্নবে তু চতুর্গুণঃ।। যাজ্ঞ.,২.২৩০

[১১৪] উদ্যতানাং তু পাপানাং হন্তুর্দোষো ন বিদ্যতে।
নিবৃত্তাস্তু যদারম্ভাদ্ গ্রহণং ন বধঃ স্মৃতঃ।। কাত্যা.,৮০০

[১১৫] একং চেদ্বহবো হন্যুঃ সংরব্ধাঃ পুরুষং নরাঃ।
মর্মঘাতী তু যস্তেষাং স ঘাতক ইতি স্মৃতঃ।। তদেব,৭৯৮

স্মৃতিশাস্ত্রে সাধারণভাবে পশুহত্যা নিষেধ করা হলেও কোনো পশু আততায়ী হলে সেই পশুর হত্যার বিধান আছে। কাত্যায়ন বলেছেন, তীক্ষ্ণনখযুক্ত ও শৃঙ্গযুক্ত পশু, ফণাধারী সাপ, আক্রামক অশ্ব-হস্তি-এরা আততায়ী হলে এদের হত্যায় কোনো অপরাধ হবে না।[১১৬]

যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর সাহসসম্পর্কিত আলোচনায় সাহস সংশ্লিষ্ট বলে এমন কতগুলি অপরাধের উল্লেখ করেছেন যে গুলিকে সরাসরিভাবে সাহস বলা যায় না। সেখানে তিনি সমাজকে নিষ্কলুষিত রাখার জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় কিছু বিধি ব্যবসায়িক, রজক ও ক্রেতাদের জন্য করেছেন। তুলাদণ্ড, ওজনের বাটখারা ইত্যাদিতে যে ব্যবসায়িক অসৎ উপায় অবলম্বন করে, ক্রেতাদের ঠকায় সংহিতাকার তাদের উত্তম সাহস দণ্ড দিয়েছেন। একইভাবে যে ব্যবসায়ী জাল মুদ্রাকে বাজারে ছড়িয়ে দেয়, যে দলিলপত্র জাল করে, যিনি খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধে ভেজাল মিশ্রণ করে এদের সকলকেই তিনি দণ্ডার্হ বলেছেন।[১১৭] *কাত্যায়নস্মৃতি*তেও সাহস প্রসঙ্গে এরূপ কতগুলি অপরাধের উল্লেখ দেখা যায়। কাত্যায়ন কেবলমাত্র ব্যক্তি কিংবা পশুর ক্ষতিসাধনকারীকেই সাহসিক বলেননি, সমাজের ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তিরও দণ্ডবিধান সাহসের আলোচনায় করেছেন। বেঁচে থাকার জন্য জল অপরিহার্য তাই যে ব্যক্তি জলাধার, কুয়ো ইত্যাদি ভেঙ্গে দিয়ে অপরকে জল প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে তাকে তিনি প্রথম সাহস দণ্ড দিয়েছেন।[১১৮]

সংহিতাগ্রন্থগুলিতে সাহসের প্রকারভেদ, দণ্ড ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা থাকলেও কেবলমাত্র *বৃহস্পতিস্মৃতি*তেই সাহসিক ব্যক্তিকে সনাক্ত করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা দেখা যায়। *বৃহস্পতিস্মৃতি*তে পাওয়া যায়, যেখানে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখা গেলেও আঘাতকারী ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে না অর্থাৎ চিহ্নিত করা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে রাজা আক্রান্ত ব্যক্তির পূর্বশত্রুতার সূত্র

---

[১১৬] নখিনাং শৃঙ্গিনাং চৈব দংষ্ট্রিনাং চাততায়িনাম্।
হস্ত্যশ্বানাং তথান্যেষাং বধে হন্তা ন দোষভাক্।। কাত্যা.,৮০৫

[১১৭] ভেষজস্নেহলবণগন্ধধান্যগুড়াদিষু।
অন্যেষু প্রক্ষিপন্ হীনং পণান্ দাপ্যস্তু ষোড়শ।। যাজ্ঞ.,২.৪৪-৪৫

[১১৮] প্রাকারং ভেদয়েদ্দস্তু পাতয়েচ্ছাতয়েত্তথা।
বধ্নীয়াদস্তসো মার্গং প্রাপ্নুয়াত্ পূর্বসাহসম্।। কাত্যা.,৮০৯

অনুসরণ করে ঘাতক কে তা নির্ণয় করবেন।[১১৯] তাঁর মতে, ক্ষতের লঘুতা, গুরুতা, ক্ষতস্থান ইত্যাদি বিচার করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জড়িত ব্যক্তির সামর্থ্য, অনুবন্ধ ইত্যাদি জেনে চিহ্নের দ্বারা ঘাতক নির্ণয় করতে হবে।[১২০] কাত্যায়ন এবিষয়ে কিছু না বললেও সাহসিক কর্মচারী ব্যক্তির বিচার বিষয়ে একটি বিধান দিয়েছেন। তাঁর মতে, যখন কোনো অপরাধীর অপরাধের কোনো প্রমাণাদি থাকে না তখন অপরাধী শপথের দ্বারা আপন শুদ্ধি অর্থাৎ নিরপরাধিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।[১২১] রাজা তা না করলে নিজেই দোষদুষ্ট হবেন। অপরাধীকে বিলম্ব করে দণ্ড দিলে আর বেশি ক্ষতি করবে এমন আশঙ্কাবশতই দ্রুত শাস্তি দিতে বলা হয়েছে। মনু বলেছেন যে রাজা সাহসিক ব্যক্তিকে দণ্ড না দিয়ে উপেক্ষা করেন তিনি শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হন ও প্রজাগণেরও বিদ্বেষভাজন হন।[১২২]

সংহিতাগ্রন্থগুলিতে সাহস সম্পর্কিত যে আলোচনা করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সংহিতাকারগণ লুঠপাট বা ডাকাতি, হত্যা, পরস্ত্রীকে নিগ্রহ, ব্যভিচার ইত্যাদিকেই সাহসের অন্তর্গত মুখ্য অপরাধ বলে বিবেচনা করেছেন। কেউ সাহসের প্রকারভেদ প্রসঙ্গে এগুলির উল্লেখ করেছেন , আবার কেউ সাহসের দণ্ডবিধান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। সাহসের অন্তর্গত এই অপরাধগুলি এক একটি পৃথক বিবাদরূপে সংহিতাগ্রন্থে আলোচিত হয়েছে এবং সেখানে তার জন্য পৃথক পৃথক দণ্ডও বিহিত করেছেন। যেমন *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে* স্তেয়কে পৃথক বিবাদপদ, *নারদস্মৃতিতে* স্তেয় স্ত্রীসংগ্রহণ বলে আলোচনা করা হয়েছে, মনুও স্তেয় ও স্ত্রীসংগ্রহণ বিবাদপদটিকে পৃথক বলে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এগুলি যখন বলপূর্বক, দর্পসহকারে বা

---

[১১৯] হতস্তু দৃশ্যতে যত্র ঘাতকশ্চ ন দৃশ্যতে।
পূর্ববৈরানুসারেণ জ্ঞাতব্যঃ স মহীভুজাঃ।। বৃহ.,২৩.২১

[১২০] ক্ষতস্যাল্পমহত্বং চ মর্মস্থানং চ যত্নতঃ।
সামর্থ্যং চানুবন্ধং চ জ্ঞাত্বা চিহ্নৈঃ প্রসাদয়েত্।। তদেব,২৩.২১

[১২১] বিনা চিহ্নৈস্তু যৎকার্যং সাহসাখ্যং প্রবর্ততে।
শপথৈঃ স বিশোধ্যঃ স্যাত্ সর্ববাদেষ্ববং বিধিঃ।। কাত্যা.,৭৯৭

[১২২] সাহসে বর্তমানস্তু যো মর্ষয়তি পার্থিবঃ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু বিদ্বেশঞ্চাধিগচ্ছতি।। মনু.,৮.৩৪৬

অধিক মাত্রায় হিংসার বশবর্তী হয়ে কেউ আচরণ করে তখন তা সাহসপদবাচ্য হয় এবং পৃথক তথা অধিক দণ্ড বিহিত হয়। যেমন সাধারণভাবে চুরির জন্য যে দণ্ড বিহিত হয় তদপেক্ষা কোনো চুরি যখন সাহস বলে বিবেচিত হয় তখন তার দণ্ড অনেক বেশি হয়। এমনকি ঐ সাহসিক ব্যক্তিকেও চোর অপেক্ষা অনেক বেশি নিন্দনীয় বলা হয়।

৩.১.আখ্যানে সাহস অপরাধ ও তার শাস্তিবিধান প্রসঙ্গ

স্মৃতিশাস্ত্রে যে অপরাধগুলি সাহস বলে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলির প্রতিফলন সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যের বিভিন্ন গল্পে প্রায়শই চোখে পড়ে। হত্যা, হত্যার চেষ্টা, জীবহিংসা, দ্রব্যাদি অপরহরণ, পরস্ত্রীহরণ, দস্যুবৃত্তি এই সকল অপরাধগুলির উল্লেখ ও তার শাস্তিবিধান গল্পসাহিত্যের বিভিন্ন গল্পগুলিতে দেখা যায়। তবে গল্পগুলিতে সব সময়েই যে বিচারালয়ে অপরাধের শাস্তি বিহিত হয়েছে এমনটা নয়, কথনও অপরাধী অদৃষ্ট দ্বারা পীড়িত হয়েছে, কথনও পাপকর্মের জন্য দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েছে। কোথাও আবার কেবল অপরাধটির নিন্দাই করা হয়েছে- শাস্তি বা দণ্ডের উল্লেখ দেখা যায় না। এইভাবেই হয়তো গল্পকারগণ মানুষকে নিন্দনীয় সাহস অপরাধ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত সাহস অপরাধগুলির মধ্যে অত্যন্ত গর্হিত একটি অপরাধ হল শিশুহত্যা। গল্পসাহিত্যেও শিশুহত্যাকারীর সবিশেষ নিন্দা করা হয়েছে এবং নিন্দনীয় এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে মত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা* গল্পের চতুর্থ উপাখ্যানে দেবদত্ত নামক ব্যক্তি বিচারসভায় রাজকুমারের হত্যাকারী বলে চিহ্নিত হয়েছেন। শিশুহত্যার অপরাধে রাজার সভ্যগণ দেবদত্তকে শতখণ্ড করে তার মাংস গৃধ্রদের দিয়ে দেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।[১২৩] স্মৃতিশাস্ত্রেও বালক হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ডের বিধান আছে। মনুর মতে, নকল

[১২৩] সিংহাসন.,পৃ.২৮

রাজানুশাসন প্রস্তুতকারী, স্ত্রীহত্যাকারী, শিশু-বালকহত্যাকারী, ব্রহ্মহত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হবে।[১২৪] *বেতালপঞ্চবিংশতির* চতুর্থ উপাখ্যানে স্ত্রীহত্যাকারীর অতিশয় নিন্দা করা হয়েছে এবং এই কর্মকে অধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উপাখ্যানটিতে কামন্দকী নগরের স্বভাবত অর্থলোভী ও জুয়াড়ী ধনদত্ত অর্থের লোভে স্ত্রীকে হত্যা করে ও তার অলংকারাদি নিয়ে পলায়ন করে।[১২৫] এই উপাখ্যানটিতে স্ত্রীহত্যার অপরাধে ব্যক্তির কী শাস্তি প্রাপ্য তা আলোচিত না হলেও গল্পের মাধ্যমে এই অপরাধের প্রভূত নিন্দা করা হয়েছে এবং অপরাধীকেও অত্যন্ত তিরস্কার করা হয়েছে। কেবল পুরুষ নয় স্ত্রীজাতিও নানাবিধ সাহসকার্যের সাথে যুক্ত থাকতো তার নিদর্শন গল্পসাহিত্যে মেলে। আখ্যানসাহিত্যের একাধিক আখ্যানে নারীকে কখনও নিজেই হত্যা কর্মে লিপ্ত হতে দেখা যায় আবার কখনও নানাবিধ ছলনার আশ্রয় নিয়ে কিংবা দাসীর সহায়তায় দুষ্কর্ম করতে দেখা যায়।

পঞ্চতন্ত্রের লব্ধপ্রণাশের 'ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-পঙ্গুকথা' গল্পে ব্রাহ্মণী কামনাপরবশ হয়ে আপন স্বামী ব্রাহ্মণকে হত্যা করার জন্য কূপে নিক্ষেপ করে। ব্রাহ্মণ সেযাত্রায় আপন ভাগ্যবলে রক্ষা পেলেও বধরূপ গর্হিত এই সাহস অপরাধের আচরণ করার জন্য ব্রাহ্মণীর পরিণতি হয়েছে মৃত্যু।[১২৬] *বেতালপঞ্চবিংশতির* প্রথম গল্পে রাজকন্যা পদ্মাবতী আপন দাসীর সাথে মন্ত্রীপুত্রকে হত্যার পরিকল্পনা করে এবং দাসীর দ্বারা বিষ মিশ্রিত আহার প্রেরণ করে। গর্হিত এই সাহস আচরণের শাস্তিস্বরূপ পদ্মাবতীকে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে দেখা যায়।[১২৭] আবার *দশকুমারচরিত* গ্রন্থের মিত্রগুপ্তচরিতে দেখা যায়, ধূমিনী নিজের স্বামীকে হত্যার চেষ্টা করে এবং স্বামীর নিশ্চিত মৃত্যু হয়েছে এই ভেবে সেই স্থান থেকে অন্যত্র গিয়ে তার সাথেই বসবাস শুরু করে। বিচারসভায় রাজা তাকে তার রূপ বিকৃত করে কুকুরের পাচিকারূপে জীবন কাটানোর শাস্তি দিয়েছেন।[১২৮] *বেতালপঞ্চবিংশতির* দ্বাদশ সংখ্যক গল্পে বিষমিশ্রিত আহার প্রদান করে ব্রহ্মহত্যার অপরাধে

---

[১২৪] মনু.,৯.২৩২

[১২৫] বেতাল.,পৃ.১৬

[১২৬] পঞ্চ.,পৃ.৬৬৩

[১২৭] বেতাল.,পৃ. ১৬-১৭

[১২৮] দশ., পৃ.৩৪৪

ব্রাহ্মণীকে দণ্ড পেতে দেখা যায়। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তার এই অপরাধে তাকে প্রহার করে গৃহ থেকে বহিষ্কার করেছেন।[১২৯] আলোচ্য ক্ষেত্রেই স্ত্রী জাতিকে সাহসাচরণে লিপ্ত থাকতে দেখা যায় ও দণ্ডিতও হয়েছে।

উল্লেখ্য, উক্ত গল্পগুলিতে তাদের বধরূপ গর্হিত এই সাহস আচরণের শাস্তি সবক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড হয়নি। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রাণহানিকর উত্তম সাহস বলে বিবেচিত এই অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড। বৃহস্পতির মতে, উত্তম সাহসকারীর বধদণ্ডই প্রাপ্য।[১৩০] বিষ্ণুর মতেও যে পুরুষ বা স্ত্রী হত্যা করে তার বধদণ্ড হবে।[১৩১] এইরূপ দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে স্ত্রীজাতি কিংবা ব্রাহ্মণের নিষেধ না থাকায়, বৃহস্পতি বধ অপরাধে স্ত্রী তথা ব্রাহ্মণকেও প্রাণদণ্ড দিতে বলেছেন এ কথা বলা যায়। অর্থাৎ গল্পসাহিত্যে হত্যারূপ অপরাধে অপরাধী স্ত্রী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না হলেও স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে তার প্রাণদণ্ডই প্রাপ্য। *বেতালপঞ্চবিংশতির* প্রথম উপাখ্যানে স্ত্রী, বালক, ব্রাহ্মণ অত্যন্ত অপরাধী হলেও বধার্হ নয় এমনটা বলা হয়েছে।[১৩২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মনুর মতে, ব্রাহ্মণ যদি হত্যাকারী হয় তবে তাকে প্রাণদণ্ড না দিয়ে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।[১৩৩] নারদও অন্য সকল বর্ণের ক্ষেত্রে উত্তম সাহস অপরাধের দণ্ডরূপে প্রাণদণ্ডের বিধান দিলেও ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডের নিষেধ করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণকে অবধ্য বলেছেন। তাঁর মতে, ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে শাস্তি হবে মস্তকমুন্ডন, নগর থেকে নির্বাসন, ললাটে অপরাধের প্রকাশক চিত্র অঙ্কন করে গর্দভের পিঠে চড়িয়ে নগরে ভ্রমণ করানো ইত্যাদি।[১৩৪] এ বিষয়ে নারদের সাথে *পঞ্চতন্ত্র* গল্পগ্রন্থের দণ্ডবিধানের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। *পঞ্চতন্ত্রের* মিত্রলাভের চতুর্থ গল্পে গুরুতর

---

[১২৯] বেতালপঞ্চবিংশতি,পৃ.১৬

[১৩০] সাহসং পঞ্চধা প্রোক্তং বধস্তত্রাধিকঃ স্মৃতঃ।
তৎকারিণো নার্থদমৈঃ শাস্যা বধ্যাঃ প্রয়ত্নতঃ।। বৃহ.,২৩.৯

[১৩১] বি.ধ.সূ.,৫.১১-১২

[১৩২] বেতাল.,১১১-১১২

[১৩৩] মনু.,৯.২৪১

[১৩৪] শিরসৌ মুন্ডনং দণ্ডস্তস্য নির্বাসনং পুরাত্।
ললাটে চাভিশস্তাঙ্কঃ প্রয়াণং গর্দভেণ চ।। নারদ,১৬.১০

অপরাধ করলেও ব্রাহ্মণকে প্রাণদণ্ড দিতে নিষেধ করা হয়েছে। হত্যা করলেও ব্রাহ্মণ অবধ্য। তবে তিনি হত্যা- এই সাহস আচরণটি করলে কেবল ব্রাহ্মণকেই প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে না –এমন নয়, সর্বদাই অবধ্য যারা তার যে তালিকা তিনি দিয়েছেন সেখানে ব্রাহ্মণের পাশাপাশি বালক, স্ত্রীজাতি, তপঃস্বী, রোগী এদেরও নাম উল্লেখ করেছেন।[১৩৫] ধর্মসূত্রকার বিষ্ণু পুরুষ কিংবা স্ত্রী যে কেউই বধ করলে বধদণ্ড পাবে এমনটা পূর্বে বললেও পরবর্তীতে ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে বধদণ্ডের নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল বর্ণের বধকারীই বধ্য। তিনি বলেছেন, ব্রাহ্মণের দৈহিকদণ্ড কখনই হবে না, পাপকর্ম ললাটে অঙ্কন করে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে[১৩৬]- সাহসিক অপরাধে এই হবে ব্রাহ্মণের দণ্ড। এর প্রসঙ্গে বিষ্ণু কোন অপরাধে কিরূপ চিত্র অঙ্কন করা হবে তাও নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে সাহসিক আচরণকারী ব্যক্তির পাশাপাশি সেই ব্যক্তিও দুষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছে যিনি ঐ অপরাধকারীকে ঐরূপ আচরণে উৎসাহিত করেন, সহায়তা করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, সাহসে উৎসাহদানকারীর দণ্ড হবে দ্বিগুণ এবং যে ব্যক্তি টাকা দিয়ে অপরকে সাহসে প্রবৃত্ত করে তার চার গুণ দণ্ড হবে।[১৩৭] বৃহস্পতি অপরকে সাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত করলে সে দণ্ডনীয় হব একথা বললেও সাহসে প্ররোচনা দানের জন্য তার কি শাস্তি হবে তা নির্দিষ্ট করে বলেননি। এরূপ ব্যক্তিকে রাজা দোষানুযায়ী শাস্তি দেবেন এমনটাই তাঁর মত। তিনি অপরাধের আরম্ভকর্তা, অপরাধীর আশ্রয়দাতা-অস্ত্রদাতা-অন্নদাতাকেও দণ্ডার্হ বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তাঁর মতে, হত্যাকরা হয়েছে এমন ব্যক্তির দেহ নষ্ট করার উপায় যে বলে দেয়, যে অপরাধের অনুমোদন করে তারা সকলেই দণ্ডনীয়। বৃহস্পতি বলেছেন, এদের সকলকেই রাজা তাদের দোষ অনুযায়ী দণ্ড দেবেন।[১৩৮] *বিষ্ণুধর্মসূত্রে* অবশ্য অপরাধীকে সহায়তা দানকারীর বধদণ্ড বিহিত হয়েছে। বিষ্ণুর

---

[১৩৫] পঞ্চ.পৃ.১২৬

[১৩৬] ন শারীরো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ। স্বদেশাত্ ব্রাহ্মণং কৃতাঙ্কং বিবাসয়েত্। বি.ধ.সূ.,,৫.২-৩

[১৩৭] যঃ সাহসং কারয়তি স দাপ্যো দ্বিগুণং দমম্।
যশ্চৈবমুক্ত্বাহং দাতা কারয়েত্ স চতুর্গুণম্।। যাজ্ঞ.২.২৩১

[১৩৮] আরম্ভকৃত্ সহায়শ্চ তথা মার্গানুদেশকঃ।

মতে, যারা দস্যুগণকে স্থান এবং আহার প্রদান করে রাজা তাদের বধ করবেন।[১৩৯] স্মৃতিশাস্ত্রে সাহসকর্মে সহায়তাকারীকে কঠোরভাবে দণ্ডিত করার বিধান দৃষ্ট হলেও গল্পসাহিত্যে এর ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। *বেতালপঞ্চবিংশতির* প্রথম গল্পে রাজকন্যা পদ্মাবতী বিষ প্রয়োগের দ্বারা মন্ত্রীপুত্রকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তার এই সাহসকর্মের কথা দাসী কেবল জানতো এমনটা নয়, তারই সহায়তায় পদ্মাবতী বিষমিশ্রিত আহার মন্ত্রীপুত্রকে প্রদান করে। গল্পে দাসীকেই মন্ত্রীপুত্রের হাতে বিষমিশ্রিত আহার তুলে দিতে দেখা যায়। গল্পে মন্ত্রীপুত্র ঐ কালকূট আহার বিড়ালকে প্রদান করেন এবং বিড়ালটি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলে তিনি নিজের প্রাণসংহার করতে উদ্যত পদ্মাবতীকে দোষী বলে চিহ্নিত করেন। পদ্মাবতীকে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী শাস্তিও প্রদান করেন। কিন্তু অপরাধের সহায়তাকারীকে কোনো শাস্তি দিতে দেখা যায় না।[১৪০]

স্মৃতিশাস্ত্রে পরদ্রব্য আহরণ, পরস্ত্রী হরণ এই গুলিকে সাহসের অন্তর্ভুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার যথোচিত দণ্ডবিধানও করা হয়েছে। আখ্যানসাহিত্যেও এই অপরাধগুলিকে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এরূপ আচরণকারীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছে। *দশকুমারচরিতের* চতুর্থ উচ্ছ্বাস পুষ্পোদ্ভবচরিতে পরস্ত্রীগ্রহণ, পরদ্রব্য অপহরণ এগুলিকে দুষ্কর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪১] এই গ্রন্থেরই দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে মাতঙ্গ নামক ব্যক্তিকে গ্রামের মানুষদের স্ত্রী, পুত্রসহ বনে বেঁধে রেখে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করতে দেখা যায়। জীবদ্দাশায় তার কর্মের বিচার না হলেও মৃত্যুর পর তার কর্মের বিচার হয়েছে। সেখানে পরদ্রব্য অপহরণ, পরস্ত্রী অপহরণকারীদের পাপীষ্ঠ বলা হয়েছে। এরূপ অপরাধীদের আলোচ্য গল্পে যে শাস্তিগুলি দেখা যায় তা হল- উত্তপ্ত লোহস্তম্ভে বাঁধা হয়েছে, স্ফুটন্ত তেলে কড়ায়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, লোগুড় আঘাতে

আশ্রয়শস্ত্রদাতা চ ভক্তদাতা বিকর্মিণাম্।।

যুদ্ধোপদেশকশ্চৈব তদ্বিনাশপ্রদর্শকঃ।

উপেক্ষী কার্যযুক্তশ্চ দোষবক্তাঽনুমোদকঃ।। বৃহ.,২৩.১৫-১৬

[১৩৯] প্রসহ্যতস্করাণাঞ্চাবকাশভক্তপ্রদাংশ্চ অন্যত্র রাজশক্তেঃ। বি.ধ.সূ.,৫.১৭

[১৪০] বেতাল.,পৃ.১৭

[১৪১] জ্যোতিভূষণ চাকী,*সংস্কৃত সাহিত্যের সম্ভার*(৭ম), দশ.,পৃ.৩৯

শরীর চূর্ণ করা হয়েছে, ধারালো সাবল দিয়ে দেহের মাংস কেটে ফেলা হচ্ছে ইত্যাদি। অর্থাৎ আখ্যানের বিচারে পরদ্রব্য অপহরণকারী, পরস্ত্রী অপহরণকারীকে ইহলোকে যেমন শাস্তি ভোগ করতে হয় তেমন পরলোকেও কঠোর নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। কেবল দস্যু, রাক্ষসই অপহরণ কার্য করত এমনটা নয়। অনেক ক্ষেত্রে গল্পে কুটুম্বরা জ্ঞাতির দ্রব্যাদি অপহরণ করে নিচ্ছে এমনটাও দেখা যায়। *বেতালপঞ্চবিংশতির* ঊনবিংশতি উপাখ্যানে ধনপালের মৃত্যুর পর তার জ্ঞাতিবর্গ তার স্ত্রী ও কন্যা ধনবতীকে অসহায় দেখে তার সর্বস্ব অপহরণ করে। তাঁর স্ত্রী অসহায় হয়ে কন্যা ধনবতীকে নিয়ে পিত্রালয়ে প্রস্থান করে। আলোচ্য গল্পে এই অপরাধের উল্লেখ রয়েছে এবং তার স্ত্রী ও কন্যার বিপন্নাবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কুটুম্বদের দ্বারা জ্ঞাতির ধন অপহরণের শাস্তি বর্ণিত না হলেও পরদ্রব্য অপহরণ করাকে একটি ঘৃণ্য অপরাধ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্রব্য অপহরণ অপেক্ষা কোনো নারীকে অপহরণ গুরুতর অপরাধ। নারীকে জোরপূর্বক অপহরণের শাস্তি গল্পসাহিত্যে প্রায় সকল গল্পেই মৃত্যু দেওয়া হয়েছে। *দশকুমারচরিতের* মিত্রগুপ্তচরিত নামক ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে মিত্রগুপ্তের প্রাণপ্রিয়া কন্দুকাবতীকে এক রাক্ষস কর্তৃক জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যেতে দেখা যায়। কন্যাপহরণরূপ এই সাহস আচরণের জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।[১৪২] *বেতালপঞ্চবিংশতির* দ্বিতীয় উপাখ্যানে এক নারীকে অপহরণের অপরাধে অপহরণকারীকে বধ করা হয়।

আবার স্মৃতিশাস্ত্রে অন্যের দ্রব্য অপহরণ তথা অন্যের স্ত্রীকে অবরুদ্ধ করাকে এক প্রকার সাহস বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এইকর্মকারীর দণ্ডবিধানও করা হয়েছে। বৃহস্পতির মতে, স্ত্রী, পুরুষ, সুবর্ণ, রত্ন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের দ্রব্য, কোশেয় দ্রব্য এগুলি হল উত্তম দ্রব্য। তাঁর মতে, উত্তম দ্রব্যের অপহরণকারী বা বিনাশকারীকে দ্রব্যমূল্যের সমান দণ্ড দিতে হবে।[১৪৩] নারদের মতে, কেউ যদি বস্ত্র, পানীয়, অন্ন, গৃহের উপকরণাদি নষ্ট করে, হরণ করে তবে তার কমপক্ষে পাঁশশত পণ দণ্ড হবে। তিনি উত্তম সাহস আচরণকারীর আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি বধ,

---

[১৪২] দশ.,পৃ.৯৮

[১৪৩] কৌশেযং চৌত্তমদ্রব্যমেষাং মূল্যসমো দমঃ।। বৃহ.,২৩.৭

অপরাধীর সর্বস্ব হরণ করে তাকে নগর থেকে নিষ্কাশন, শরীরে বিভিন্ন চিত্রাঙ্কন, অঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদি শাস্তির উল্লেখ করেছেন।[১৪৪] তিনি অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী এবং কি অপহরণ করা হয়েছে তার উপরে ভিত্তি করে দণ্ডবিধান করেছেন – এমনটা মনে হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন নারদ হিরণ্য, স্বর্ণ, রত্ন, কোশেয় বস্ত্র, স্ত্রী, পুরুষ, গো, গজ, অশ্ব এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও রাজার দ্রব্যকে উত্তম দ্রব্য বলে উল্লেখ করলেও বৃহস্পতি গো-অশ্ব-গজ ইত্যাদি পশুকে এবং রাজার দ্রব্যকে উত্তম দ্রব্যের তালিকাভুক্ত করেননি। এই আলোচনা থেকে এই কথা বলা যায় যে গল্পসাহিত্যে পরস্ত্রীহরণের যে শাস্তি বিহিত হয়েছে তা স্মৃতিবিহিত দণ্ডবিধানেরই প্রতিফলন। আবার *দশকুমারচরিতের* দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে মাতঙ্গকে পরদ্রব্য হরণের নানাবিধ শাস্তির যে চিত্র নরকে দেখানো হয়েছে তার সাথে রাজা অপরাধ অনুযায়ী অপহরণকারীকে দণ্ড দেবেন- নারদের এই মতের সাদৃশ্য দেখা যায়।

অন্যের কোনো সামগ্রী হরণ করলে দণ্ড অবশ্যই দিতে হবে এমন বিধান স্মৃতিশাস্ত্র ও গল্পসাহিত্যে থাকলেও পরদ্রব্য অপহরণের বিচারের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত গল্পসাহিত্যে দেখা যায়। *পঞ্চতন্ত্রের* মিত্রভেদের 'লৌহতুলা-বণিকপুত্রকথা' গল্পে জীর্ণধনকে পরের পুত্র অপহরণের অপরাধে বিচারসভায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অন্যের বালক অপহরণের অপরাধে ধর্মাধিকরণ জীর্ণধনকে অপহৃত পুত্রকে ফিরিয়ে দিতে বলেছেন। কোনোরূপ অর্থদণ্ড কিংবা শারীরিক দণ্ড জীর্ণধনকে দেওয়া হয়নি।[১৪৫] যদিও গল্পে জীর্ণধন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য এমন আচরণ করেছিল তার পরে উদ্ঘাটিত হয়েছে কিন্তু ধর্মাধিকরণ অপহরণের জন্য পুত্র ফেরৎ দেওয়া ব্যতিরিক্ত কোনো শাস্তির ঘোষণা করেননি একথাও সত্য। স্মৃতিশাস্ত্রে কোনো কিছুর প্রতি হিংসাত্মক যে কোনো কর্ম করাকেই সাহস বলা হয়েছে এবং তার দণ্ডবিধানও করা হয়েছে। বৃহস্পতি অন্যের পশু, বস্ত্র, অন্ন দ্রব্য, পানদ্রব্য, গৃহের উপকরণের প্রতি হিংসাকারী ব্যক্তির চোরের

---

[১৪৪] উত্তমে সাহসে দণ্ডঃ সহস্রবর ইষ্যতে।

বধঃ সর্বস্বহরণং পুরান্নির্বাসনাঙ্কনে।

তদঙ্গচ্ছেদঃ ইত্যুক্তো দণ্ড উত্তমসাহসে।। নারদ.,১৬.৮

[১৪৫] পঞ্চ.,পৃ.২৯১

ন্যায় দ্বিশত পণ দণ্ড হবে এমনটা বলেছেন।[১৪৬] গল্পসাহিত্যে প্রাণহিংসাকারীকে এক দিকে যেমন বিচারালয়ে দণ্ড দেওয়া হয়েছে তেমন তার পাশাপাশি পরজন্মে ও পরলোকে তার ভয়ঙ্কর পরিণতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

স্মৃতিশাস্ত্রে জীবহিংসাকারীর একটি বিশেষ বিভাগ উল্লেখ করা হয়েছে। *মনুস্মৃতি, বৃহস্পতিস্মৃতি* ও *কাত্যায়নস্মৃতি*তে কয়েকটি বিশেষ অপরাধের অপরাধীকে, হিংসাচারণকারীকে আততায়ী বলা হয়েছে। কাত্যায়নের মতে, যে ব্যক্তি অস্ত্র, বিষ, অগ্নি এবং হস্ত উদ্যত করে কাউকে হত্যা করতে তৎপর হয়, যে *অথর্ববেদে*র নানান মন্ত্রের প্রয়োগ করে অন্যের ক্ষতি করে, রাজার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে গোপনীয় তথ্য অন্যকে জানিয়ে রাজার ক্ষতি করে, যে অন্যের স্ত্রীকে নিগ্রহ করে এবং যে সর্বদা অপরের দুর্বলতা অন্বেষণ করে সেই স্থানে আঘাত করে তাকে আততায়ী বলা হয়।[১৪৭] কোনো ব্যক্তি যদি আততায়ী হয় তবে কোনো রকম বিবেচনা না করেই তাকে বধ করতে হবে।[১৪৮] সাধারণত বালক, বৃদ্ধ, গুরু এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বধদণ্ডে দণ্ডিত হয় না। কিন্তু আততায়ী হলে তারাও বধদণ্ডার্হ- মনু এমনটা বলায় ধরে নেওয়ায় যায় যে, আততায়ী যে কোনো বর্ণেরই হোক না কেন সে বধের যোগ্য। মনু প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে আততায়ীকে বধ করতে বলেছেন। তাঁর মতে, এক্ষেত্রে বধকারীর কোনো দোষ হয়না কারণ এক্ষেত্রে আততায়ীর ক্রোধই বধকারীর ক্রোধ উদ্রেক করে।[১৪৯] মনু বয়স, বর্ণ নির্বিশেষে সকল আততায়ীর বধের বিধান

---

[১৪৬] পশুবস্ত্রান্নপানানি গৃহোপকরণং তথা।
হিংসয়শ্চৌরবদ্দাপ্যো দ্বিশতদ্যং দমং তথা।। বৃহ.,২৩.৬

[১৪৭] উদ্যতাসিবিষাগ্নিশ্চ চাপোদ্যতকরস্তথা।
আথর্বণেন হন্তা চ পিশুনশ্চৈব রাজনি।।
ভার্যাতিক্রমকারী চ রন্ধ্রান্বেষণতৎপরঃ।
এবমাদ্দাম্বিজাতীয়াত্ সর্বানেবাততায়িনঃ।। কাত্যা.,৮০২-৮০৩

[১৪৮] গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।। মনু.,৮.৩৫০

[১৪৯] নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বা অপ্রকাশং বা মন্যুস্তন্ম্যুমৃচ্ছতি।। তদেব,৮.৩৫১

দিলেও এ বিষযে *কাত্যায়নস্মৃতি* ও *বৃহস্পতিস্মৃতিতে* অন্য-বিধান দেখা যায়। বৃহস্পতিও বিলম্ব না করে আততায়ীকে বধ করতে বলেছেন।[১৫০] তবে বৃহস্পতি স্বাধ্যায়ী, উচ্চকুলে জাত ব্রাহ্মণ আততায়ী হলে তার বধদণ্ড নিষেধ করেছেন। একই ভাবে কাত্যায়নও বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ আততায়ী হলে তার বধদণ্ডের নিষেধ করেছেন। কাত্যায়নের মতে, যে ব্যক্তি তপশ্চারণকারী, স্বাধ্যায় অধ্যয়নকারী, উচ্চকুলে জাত সে যদি আততায়ী হয় তবে তাকে বধ করা যাবে না। তিনি খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন, বধদণ্ডের নিয়ম কেবল হীনজাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[১৫১] স্বাধ্যায় অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ আততায়ী হলেও অবধ্য – এই মতটিকে কাত্যায়ন ভৃগুর বচন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মূল *মনুস্মৃতিতে* এরূপ বিধান দেখা যায় না, বরং ভিন্ন বিধানই দৃষ্ট হয়। বৃহস্পতির মতে, এমন আততায়ীকে হত্যা না করলেই বরং সে ভ্রূণঘাতী বলে গণ্য হবে, হত্যা করলে নয়।[১৫২]

বিষ কিংবা অস্ত্রের দ্বারা কাউকে হত্যা করতে উদ্যত ব্যক্তিও আততায়ী, তাকেও তৎক্ষণাৎ বধ করতে হবে। আততায়ীর এমন পরিণতিই স্মৃতির বিধান। স্মৃতিবিহিত এমন বিধানের প্রতিফলন আখ্যান-উপাখ্যানেও দেখা যায়। *দশকুমারচরিতের* চতুর্থ উচ্ছ্বাস অর্থপালচরিতে কামপালের বিরুদ্ধে প্রভু চণ্ডসিংহ ও যুবরাজ চণ্ডঘোষকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করার অপরাধ হয়েছে। বিষ প্রয়োগের দ্বারা হত্যার শাস্তি মৃত্যু। তাই কামপালের মৃত্যু নিশ্চিত এমন শাস্তি বিধান করা হয়েছে। তার চক্ষু উৎপাটন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যার দ্বারা তার মৃত্যু অনিবার্য হয়।[১৫৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কামপাল ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও আততায়ী হওয়ায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে।

---

[১৫০] নাততায়িবধে হন্তা কিল্বিষং প্রাপ্নুযাত্।
বিনাশার্থিনামায়ান্তং ঘাতয়ন্নপরাধ্নুয়াত্ ।। বৃহ.,২৩.১৭

[১৫১] আততায়িনি চোৎকৃষ্টে তপঃ স্বাধ্যায়জন্মতঃ।
বধস্তত্র তু নৈব স্যাত্ পাপে হীনে বধো ভৃগুঃ।। কাত্যা.,৮০১

[১৫২] স্বাধ্যায়িনং কুলে জাতং যো হন্যাদাততায়িনম্।
অহত্বা ভ্রূণহা স স্যান্ন হত্বা ভ্রূণহা ভবেত্ ।। বৃহ.,২৩.১৯

[১৫৩] দশ.পৃ.৭৮

স্মৃতিতে মারণ, হরণ – প্রধর্ষণ এগুলিকে সাহস বলে উল্লেখ করা হলেও *নারদস্মৃতি*তে সাহস এই বিবাদপদটির আলোচনায় মারণ, হরণ ব্যতিরিক্ত বিনা কারেণে কাউকে পরিত্যাগ, গর্ভনাশ, নিজবংশীয়দের ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তিকেও নারদ সাহসিকের ন্যায়ই দণ্ডিত করেছেন। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়*ও এরূপ কিছু অপরাধের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেগুলিকে সরাসরিভাবে সাহস বলে মনে হয় না। যেহেতু এই কর্মগুলি অপরাধী সাধারণত দর্পবশতই এই সকল অপরাধগুলি করে, তাই সম্ভবত স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ এগুলিকে সাহসের আওতাভুক্ত করেছেন এবং সাহসিকের ন্যায়ই দণ্ডবিধান করেছেন। *বেতালপঞ্চবিংশতি* গ্রন্থের ত্রয়োদশ উপাখ্যানেও বিনা কারণে অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার জন্য ব্রাহ্মণকে দোষী বলা হয়েছে। কারণ, ব্রাহ্মণ কোনোরূপ বিবেচনা না করেই, স্ত্রী প্রকৃত অর্থে দোষী কি না তা বিচার না করেই তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করেছে। তার এই কর্মের জন্য, (সবিশেষ অনুসন্ধান না করেই নিরপরাধিনী সহধর্মিণীকে অকারণে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার জন্য) তাকে পাপের ভাগী হতে হবে এমনটাই বিক্রমাদিত্য বলেছেন।[১৫৪] *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* অষ্টাদশ উপাখ্যানেও বিনা দোষে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বিনা দোষে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলে অক্ষয় নরকবাস হয়।[১৫৫] উপরের দুটি গল্পে ইহলোকে বিচারালয়ে দণ্ডবিধানের উল্লেখ না থাকলেও এই অপরাধে পরলোকের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। *নারদস্মৃতি*তে উল্লিখিত সাহসের প্রাসঙ্গিক অপর একটি অপরাধ হল গর্ভনাশ করা। *কথাসরিৎসাগরেও* গর্ভনাশ করাকে একটি দণ্ডনীয় অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে গর্ভস্থ ভ্রূণের হত্যা করলে, সন্তানের মাও যদি এই কর্মে লিপ্ত থাকেন তবে তিনিও অপরাধী বলে বিবেচিত হবেন।[১৫৬]

জ্ঞাতি, কুটুম্ব এই সকল ব্যক্তির সর্বদা পাশে থাকা উচিত। তাদের ক্ষতিসাধন করা উচিত কর্ম নয়। যিনি এমন কার্য করেন স্মৃতিশাস্ত্রে তাকে শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। গল্পসাহিত্যও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। গল্পসাহিত্যেও কুটুম্ব তথা নিজবংশীয়দের ক্ষতিসাধনকারী

---

[১৫৪] বেতাল.পৃ.১১২

[১৫৫] সিংহাসন.,পৃ.৫৭

[১৫৬] কথা.,পৃ.৮৮

ব্যক্তির চরম দুর্দশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রের* লব্ধপ্রণাশের 'মণ্ডুকরাজ– গঙ্গাদত্তকথা' গল্পে গঙ্গাদত্ত নিজের কুটুম্বদের হত্যা করার জন্য একটি সর্পকে নিজেদের বাসস্থানে নিয়ে এসে রাখে। গঙ্গাদত্তের এই কর্মের জন্য তাকে কুলাঙ্গার ইত্যাদি বলে গল্পে ধিক্কার জানানো হয়েছে। নিজকুলের অপরের ক্ষতি করতে উদ্যত গঙ্গাদত্তের দ্বারা আহুত সর্প তারই পুত্রকে হত্যা করেছে। তার এই কর্মের জন্য তার স্ত্রী তাকে তিরস্কার করেছে এবং কুলের নাশকারী গঙ্গাদত্তের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এমন কথাও তার স্ত্রীকে বলতে শোনা যায়।[১৫৭] আলোচ্য গল্পটিতে গঙ্গাদত্তের পরিণতির দ্বারা নিজকুলের ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তি অদৃষ্টের দ্বারা পীড়িত হয়ে শাস্তি ভোগ করে এরূপ বলা হয়েছে। নিজবংশের লোকের ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তি স্মৃতির ন্যায় গল্পসাহিত্যের বিচারেও অপরাধী। দর্পবশত গঙ্গাদত্ত নিজের জ্ঞাতি-কুটুম্বদের ক্ষতি করেছে তাই তার এই কার্য স্মৃতির বিধান অনুযায়ী সাহসকার্য এবং তাকে পঞ্চাশ পণ দণ্ড দিতে হবে। যাজ্ঞবল্ক্য সাহস অপরাধের আলোচনায় নিজগৃহ সমীপবর্তী সামন্তগণ ও নিজবংশীয় ব্যক্তিদের যে অপকার করে সেই ব্যক্তিকে পঞ্চাশ পণ দণ্ড দিতে হবে- এমন দণ্ড দিয়েছেন।[১৫৮] সাহস প্রসঙ্গে *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে* বেশকিছু অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে উল্লিখিত অপরাধগুলির মধ্যে একটি অপরাধ হল চিকিৎসক না হয়েও নিজেকে চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে কারো চিকিৎসা করা। কোনো ব্যক্তি যদি এই অপরাধ করে তবে যাজ্ঞবল্ক্যের মতে সে সাহস আচরণকারীর ন্যায় দণ্ড পাবে। যাজ্ঞবল্ক্য এবিষয়ে যাকে ঠকানো হচ্ছে বা চিকিৎসা করা হচ্ছে তার উপরে ভিত্তি করে দণ্ডবিধান করেছেন। তাঁর মতে, চিকিৎসক না হয়েও নিজেকে চিকিৎসক বলে প্রচার করে কেউ যদি পশু-পক্ষী প্রভৃতির চিকিৎসা করে তাহলে প্রথম সাহস দণ্ড পাবে। যদি সে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করে তবে মধ্যম সাহস দণ্ড পাবে এবং রাজপুরুষের চিকিৎসা করলে তার উত্তম সাহস দণ্ড বিহিত হবে।[১৫৯] *কথাসরিৎসাগরের* 'তরুণচন্দ্রের কথা' গল্পে যাজ্ঞবল্ক্য কথিত এই অপরাধের উল্লেখ পাওয়া যায়। গল্পে তরুণচন্দ্র

---

[১৫৭] পঞ্চ.পৃ.৬৪৩

[১৫৮] সামন্তকুলিকাদীনামপকারস্য কারকঃ।

পঞ্চাশৎপণিকো দণ্ড এষামিতি বিনিশ্চয়ঃ। যাজ্ঞ.,২.২৩৩

[১৫৯] ভিষজ্মিত্যাচরন্ দণ্ড্যস্তির্যক্ষু প্রথমং দমম্।

মানুষে মধ্যমং রাজপুরুষেষূত্তমং দমম্।। তদেব,২.২৪২

রাজাকে চিকিৎসা করার পরিবর্তে দীর্ঘদিন তাকে ঠকিয়েছে, বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর নিজের ভুল চিকিৎসার কথা প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং তাকে শাস্তি পেতে হবে এমন আশঙ্কা করে সে রাজাকে হত্যা করে।[১৬০] আলোচ্য গল্পে যে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে সেখানে তিনি তরুণচন্দ্রে এই অপরাধের জন্য কিংবা চিকিৎসা না জেনেও চিকিৎসার নামে রাজাকে ঠকানোর জন্য তার কি শাস্তি প্রাপ্য তা উল্লেখ করেননি। তবে তরুণচন্দ্রের এমন কাজের জন্য রাজার মৃত্যুর পর সে যাকে পরিকল্পনা করে রাজপদে নিযুক্ত করেছে তার কাছেই বিশ্বস্ততা হারিয়েছে। তরুণচন্দ্র যে নকলরাজাকে রাজপদে বসিয়েছে সে রাজা হওয়ার পর তরুণচন্দ্রকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজপদ দেয়নি। গল্পকার এমন ব্যক্তিকে একটি নিন্দনীয় চরিত্র বলে উল্লেখ করেছেন। শাস্তির উল্লেখ না করলেও এমন পাপকর্মের জন্য অন্যের কাছে ব্যক্তির কোনো বিশ্বস্ততা থাকে না ও অপরাধীর ন্যায় তার করুণ পরিস্থিতি হয় এরূপ দেখিয়ে তরুণচন্দ্রকে একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ গল্পকার উল্লেখ করেছেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এইভাবে স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত সাহস এই বিবাদপদটি বা অপরাধটির আচরণ আখ্যানসাহিত্যের বা গল্পসাহিত্যের বিভিন্ন গল্পে দৃষ্ট হয়েছে। শুধু সাহস নয় স্মৃতিতে সাহস প্রসঙ্গে উল্লিখিত অপরাধেরও উপস্থিতি গল্পসাহিত্যে রয়েছে। অপরাধগুলি একই হলেও দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে স্মৃতি ও গল্পসাহিত্যের বিধানের ক্ষেত্রে কোথাও সাদৃশ্য কোথাও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন স্মৃতি সাহসাচরণে ব্রাহ্মণ-স্ত্রীজাতি-বালক এদের শারীরিক দণ্ড দিলেও গল্পসাহিত্যের বিচারে এরা শারীরিক দণ্ডার্হ নয়। আবার আততায়ীকে বিলম্ব না করে বধ করলে হবে এবিষেয় স্মৃতি ও গল্পসাহিত্যে সহমত দেখা যায়। দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থাকলেও স্মৃতিশাস্ত্রে যে কর্মগুলিকে সাহস কিংবা সাহস প্রাসঙ্গিক বলা হয়েছে আখ্যানেও ঐ আচরণ বা কর্মগুলিকে সাধারণভাবে হিংসাত্মক অপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। স্মৃতিতে সাহস অপরাধের শারীরিক কিংবা অন্য দণ্ড বিহিত হলেও গল্পসাহিত্যে শাস্তিস্বরূপ কখনও মানুষের দুর্দশার কথা, কখনও পরলোকে ইহজন্মের অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে এমনটা বলা হয়েছে। এরদ্বারা বোঝা যায়,

---

[১৬০] কথা.,পৃ.১৬

গল্পকারগণ মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, হিংসাত্মক আচরণ করলে ইহজন্মে বিচারালয়ের শাস্তির হাত থেকে যদিও বা কেউ নিস্তার পায়, পরজন্মে কিংবা পরলোকে তার অপরাধের দণ্ড থেকে তার নিস্তার নেই—তাই জীবহিংসা অবশ্য বর্জনীয়।

৪.স্ত্রীসংগ্রহণ বিবাদবিধি

অতীতকালে স্ত্রী ও পুরুষের ব্যভিচারকে অক্ষম্য অপরাধ বলে মনে করা হত। তা থেকে উৎপন্ন বিবাদকেই স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীসংগ্রহণ বলা হয়েছে। মনুর মতে, নিঃসম্পর্কিত কোনো স্ত্রীলোককে উপকার করা বিশেষ প্রকার বস্তু উপহার দেওয়া, তার সাথে কেলি করা, তার কাপড় অলঙ্কারাদি স্পর্শ করা এবং একাসনে বা শয্যায় একসাথে উপবিষ্ট থাকা – এসমস্ত স্ত্রীসংগ্রহণ বলে বিবেচিত হবে। টীকাকার কুল্লূকভট্ট 'উপচারক্রিয়া' বলতে কাপড়, মালা প্রভৃতি দিয়ে উপকার করাকে বুঝিয়েছেন কিংবা খাদ্যদ্রব্য-পানীয়দ্রব্যাদি প্রদানকেও সমান বুঝিয়েছেন। 'কেলি' বলতে পরিহাস, ঠাট্টা, তামাসা ইত্যাদি, 'স্পর্শো ভূষণবাসসাম্' বলতে স্ত্রীলোকের গাত্রস্থিত হার, বলয় প্রভৃতি স্পর্শ করাকে বুঝিয়েছেন। এছাড়াও একই খাট, বিছানা কিংবা আসনে উভয়ে একসঙ্গে বসা ও তাতে পরস্পরের গাত্রস্পর্শ হোক কিংবা না হোক – তা সংগ্রহণ বলে বিবেচিত হবে। এ সমস্তগুলির দণ্ড সমান।[১৬১] *মিতাক্ষরাকারের* মতে স্ত্রীপুরুষের মিথুনীভাবই সংগ্রহণ।[১৬২] তবে এক্ষেত্রে স্ত্রী বলতে পরস্ত্রীকেই বুঝতে হবে। স্মৃতিতে স্ত্রীসংগ্রহণের তিনটি ভেদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি হল, কোনো স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক সংগ্রহণ। দ্বিতীয়টি হল, কোনো প্রকার ছলনার আশ্রয় করে পরস্ত্রীসংগ্রহণ। তৃতীয় প্রকারটি হল, যেখানে ব্যভিচারী স্ত্রী নিজের ইচ্ছায়

---

[১৬১] উপচারক্রিযা কেলিঃ স্পর্শো ভূষণবাসসাম্।

সহখট্বাসনঞ্চৈব সর্বং সংগ্রহণং স্মৃতম্।। মনু.,৮.৩৫৭

দ্র. মন্বর্থ.,তদেব

[১৬২] স্ত্রীপুংসযোর্মিথুনীভাবঃ সংগ্রহণম্। মিতা.,২.২৮৬

পুরুষের সাথে ব্যভিচারীতায় লিপ্ত হয়। উন্মত্ত কিংবা মানসিকভাবে স্বাভাবিক নয় কিংবা চিৎকাররত স্ত্রীকে স্পর্শ করাও স্মৃতিতে প্রথম প্রকার স্ত্রীসংগ্রহণ বলে বিবেচিত হয়েছে। কোথাও কোথাও জোরপূর্বক কোনো স্ত্রীকে স্পর্শ বা সম্ভোগ করাকে সাহস বিবাদপদের অন্তর্গত বলা হয়েছে।

৪.১.আখ্যানসাহিত্যে স্ত্রীসংগ্রহণ বিবাদ প্রসঙ্গ

সুষ্ঠ-সুন্দর সমাজ গঠনের স্বার্থেই সমাজে বেশকিছু বিধি-নিষেধ স্থাপিত হয়েছে। এই সকল বিধি না থাকলে হয়তো পাশবিক অসভ্যতা ও মানবিক সভ্যতার মধ্যে কোনো তফাৎ থাকবে না। সমাজে স্ত্রী-জাতির নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরো দৃঢ় করেছে স্ত্রীসংগ্রহণকারীর জন্য নির্দিষ্ট দণ্ডব্যবস্থা। আবার শালীনতার মাত্রা উল্লঙ্ঘনকারী স্ত্রীও দণ্ডার্হ বলে বিবেচিত হয়েছে।

আখ্যান-উপাখ্যানগুলির প্রায় সর্বত্রই পরস্ত্রী স্পর্শ, পরস্ত্রী কাতরতা, পরস্ত্রী সংসর্গের নিন্দা করা হয়েছে। কোনো কোনো আখ্যানের কাহিনিতে তার শাস্তি প্রসঙ্গটিও আলোচিত হয়েছে। *বেতালপঞ্চবিংশতি*গ্রন্থের দশম উপাখ্যানে ধর্মদত্ত মদনসেনার প্রতি অভিলাষী হওয়া সত্ত্বেও, বিবাহের পর মদনসেনা তার নিকটে উপস্থিত হলে পরস্ত্রী হওয়ার কারণে সে মদনসেনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। পরস্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করতে অস্বীকার করেছেন – শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী পরস্ত্রী স্পর্শ সবিশেষ দোষ এরূপ বলে মদনসেনাকে তার পতিগৃহে গমন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[১৬৩] শাস্ত্রের নিষেধ বলতে স্মৃতিশাস্ত্রকেই বুঝতে হবে। কারণ সেখানে পরস্ত্রীসংগ্রহণ একটি দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছে। দণ্ডের ভয়েই সোমদত্ত এমন কর্মে লিপ্ত হয়নি। আলোচ্য গ্রন্থটির সপ্তদশ উপাখ্যানে পরস্ত্রী স্পর্শ বা গ্রহণকে অধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬৪] রাজা স্বয়ং দণ্ডাধিকারী, তিনিও পরস্ত্রীসংগ্রহণে অস্বীকার করেছেন – যা থেকে আলোচ্য অপরাধটির ভয়াবহতা সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যায়। এই অপরাধকারী কেবল রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এমন নয়,

---

[১৬৩] বেতাল.,পৃ.৮১

[১৬৪] তদেব.,পৃ.১৫৬-১৫৮

তাকে পরলৌকিক জগতেও শাস্তি ভোগ করতে হয়। কারণ পরস্ত্রীস্পর্শরূপ এমন অধর্মাচারণ করলে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হতে হয়। আখ্যানটিতে অধর্ম ও অপযশের কারণস্বরূপ রাজা পরস্ত্রীস্পর্শ করেননি। বরং মৃত্যুবরণ করেছেন – তাই বিক্রমাদিত্যের বিচারে তিনি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছেন। *কথাসরিৎসাগরের* মদনমঞ্জুকা লম্বকের প্রথম তরঙ্গের 'নৃপতিবিক্রমসিংহ ও দুই দ্বিজের কাহিনি'তেও পরস্ত্রীসংসর্গকে পাপ বলা হয়েছে। শুধু তাই নয় ইহাকে অত্যন্ত সাহসিক কর্ম বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। পরস্ত্রীগ্রহণ করার জন্যই দণ্ডভয়ে দুই দ্বিজ দেশান্তর পলায়ন করেছেন।[১৬৫] এর দ্বারা বোঝা যায় স্ত্রীসংগ্রহণের দণ্ডব্যবস্থা যথেষ্ট কঠোর ছিল। তবে, কেবল পুরুষ নয় ব্যভিচারী স্ত্রী, যে স্বামীভিন্ন অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচারীতায় লিপ্ত হয় সে সমাজে নিন্দিত হওয়ার পাশাপাশি রাজদণ্ডেও দণ্ডিত হয়।

আলোচ্য আখ্যানটিতে তাইতো দুই দ্বিজের সাথে দণ্ডভয়ে পরস্ত্রী স্বরূপ দুই ব্যভিচারী স্ত্রীও দেশান্তরে পলায়ন করেছিল। কোথাও কোথাও আবার এমন অধর্মাচারণের জন্য এমন পত্নীকে শাস্তিস্বরূপ গৃহ থেকে নিষ্কাশন করতেও দেখা যায়। *কথাসরিৎসাগরের* চতুর্থ লম্বক নরবাহনদত্ত জননের প্রথম তরঙ্গের 'দেবদত্তের কাহিনি'তে দুশ্চরিত্রা হওয়ায় দেবদত্ত স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করেছে।[১৬৬] *শুকসপ্ততিকথার* নবম কথায় স্ত্রী ব্যভিচারী হওয়ায় রাজা দণ্ডস্বরূপ তাকে ত্যাগ করেছেন।[১৬৭] দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের শাস্তির অনুরূপ দৃষ্টান্ত *বেতালপঞ্চবিংশতি* গ্রন্থের তৃতীয় উপাখ্যানেও দেখা যায়। এক স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হওয়ায় একটি পিশাচ অত্যন্ত কুপিত হয়ে তাকে সমুচিত দণ্ড দেবে বলে স্থির করেছে এবং তার নাসিকাচ্ছেদন করেছে।[১৬৮] অর্থাৎ সতীত্বের মর্যাদাভঙ্গকারী নারী সকলের কাছেই নিন্দনীয়া ও দণ্ডনীয়া। স্মৃতিতে পরস্ত্রীসংগ্রহণকারী পুরুষের দণ্ডপ্রসঙ্গে ব্যভিচারিণী এমন স্ত্রীর কিরূপ দণ্ড প্রাপ্য সেবিষয়ে আলোচনা দেখা যায়। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য পারিবারিক সম্পর্কে আবদ্ধ এমন আত্মীয়া, গুরুপত্নী, শিষ্যপত্নী, মিত্রপত্নী, শরণাগতা নারী,

---

[১৬৫] কথা.,পৃ.১০১

[১৬৬] তদেব.,পৃ.৮

[১৬৭] শুক.,পৃ-৬৮

[১৬৮] বেতাল.,পৃ.৩১

সন্ন্যাসিনী, সাধ্বী ও উচ্চজাতির নারীর সাথে সম্ভোগকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন এবং যদি নারী স্বেচ্ছায় এমন কার্যে লিপ্ত হয় তবে তাকেও মৃত্যুদণ্ড দিতে বলেছেন।[১৬৯] কাত্যায়নের মতে, যেক্ষেত্রে নারী স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয় সেক্ষেত্রে পুরুষের ক্ষেত্রে যে দণ্ড বিহিত হবে, নারীকে তার অর্ধেক দণ্ড রূপে দেওয়া হবে। যেমন পুরুষের জন্য বধদণ্ড বিহিত হলে, ব্যভিচারী স্ত্রীকে অঙ্গচ্ছেদনরূপ দণ্ড দেওয়া হবে।[১৭০] *কথাসরিৎসাগরের* লাবাণক লম্বকের পঞ্চম তরঙ্গে 'দেবদাসের বৃত্তান্তে' রাজা যেমন পরদারাসক্ত বণিকের দণ্ডবিধান করেছেন তেমনি দেবদাসের দুষ্টা স্ত্রীকে নাসিকাচ্ছেদনরূপ শাস্তি দিয়েছেন।[১৭১]

গুরুপত্নী গুরুর ন্যায় সম্মাননীয়া, মাতার সমতুল্যা। *কথাসরিৎসাগরের* লাবাণক লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গের 'সুন্দরকের কাহিনি'তে সুন্দরকের গুরু বিষ্ণুস্বামীর পত্নী কালরাত্রি সুন্দরকের প্রতি আকৃষ্টা হলেও সুন্দরক তাকে স্পর্শ করেনি। সে মনে প্রাণে এরূপ পাপকার্য থেকে বিরত থেকেছে। কালরাত্রির উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায়, সে সুন্দরককে মিথ্যাভিযোগে অভিযুক্ত করে গুরুর দ্বারা প্রহার করিয়েছে। গুরুগৃহ থেকে তাকে বহিষ্কার করেছে। কিন্তু তবুও সে ধর্মের পথ হতে বিচ্যুত হয়নি।[১৭২] স্মৃতিতে যে সকল নারীদের অধিক সম্মাননীয়া বলা হয়েছে এবং তাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনকারীর মৃত্যুদণ্ড বিহিত হয়েছে। আখ্যানগুলিতেও তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত মেলে। *শুকসপ্ততিকথার* নবম কথায় রানীর পরপুরুষ সঙ্গীকে রাজা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।[১৭৩] আবার *কথাসরিৎসাগরের* কথাপীঠ লম্বকের পঞ্চম তরঙ্গের 'বররুচির কাহিনি'তেও রানীর সতীত্ব নষ্ট করার অপরাধে অপরাধীকে রাজা বধদণ্ড দিয়েছেন।[১৭৪] অনুরূপ দৃষ্টান্ত *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* প্রথমাংশে মন্ত্রীদ্বারা উক্ত আখ্যানটিতেও পাওয়া যায়। সেখানেও রানীর সাথে সংসর্গ থাকার

---

[১৬৯] Hist.Dh.p.534-535

[১৭০] সর্বেষু চাপরাধেষু পুংসো যোঽর্থদমঃ স্মৃতঃ।

তদর্ধং যোষিতো দদ্যুর্বধে পুংসোঽঙ্গকর্তনম্।। কাত্যা.,৪৮৭

[১৭১] কথা.,পৃ.১৭৪

[১৭২] তদেব,,পৃ-১৮৭

[১৭৩] শুক.,পৃ-৮

[১৭৪] কথা.,পৃ.৪৭

অপরাধে রাজগুরু শারদানন্দকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।[১৭৫] রানীর সহিত সংসর্গবশতঃ রাজগুরুও দণ্ডের হাত থেকে রেহাই পাননি, তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে সাধারণ দেশবাসী কেউ-ই এমন অধর্মাচারণ করলে দণ্ডের থেকে নিস্তার পাবে না। *দশকুমারচরিতে*র বিশ্রুতচরিতে আত্মীয়াস্বরূপা ভাতৃবধূর প্রতি কামনা প্রকাশ করায় বসুন্ধরাকর্তৃক ভৎর্সিত হয়েছে এবং সেখানে এমন আচরণকে অন্যায্য আচরণ বলা হয়েছে।[১৭৬] বস্তুতঃ প্রব্রাজিকা, রানী, সাধ্বী স্ত্রী, মাতৃস্থানীয়া নারী এবং আত্মীয়া এরা সকলেই পূজনীয়া। এদের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার জন্যই আখ্যান তথা স্মৃতিতে এমন কঠোর দণ্ডব্যবস্থা নির্ধারিত হয়েছে।

সংস্কৃত আখ্যানগুলিতে কোনো স্ত্রীকে অপহরণ করে কিংবা বলপ্রয়োগ করে স্পর্শ করা – এই অপরাধের একাধিক চিত্র ধরা পড়েছে। সর্বত্রই এটিকে একটি ঘৃণ্য অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অপরাধী কোথাও রাজার দ্বারা দণ্ডিত হয়েছে আবার কোথাও অন্য কারো দ্বারা কৃতকর্মের শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে। *শুকসপ্ততিকথা*র আটষট্টি সংখ্যক কথায় এমন একটি কাহিনি বর্ণিত হয়েছে যা থেকে পরস্ত্রীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিংবা অতর্কিতে স্পর্শ – একটি দণ্ডনীয় অপরাধ তা সহজেই বোঝা যায়। কেশবনামক একজন ব্রাহ্মণ এক বণিক পত্নীকে অতর্কিতে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্পর্শ করায় বণিক কেশবের উদ্দেশ্যে রাজার কাছে অভিযোগ করেছে এবং তাকে উপযুক্ত দণ্ড দিতে অনুরোধ করেছেন।[১৭৭] *দশকুমারচরিতে*র চতুর্থ উচ্ছ্বাস পুষ্পোদ্ভবচরিতে কোনো নারীকে তার অমতে স্পর্শ করাকে 'কন্যাসংসর্গদোষ' বলা হয়েছে। পরস্ত্রী গ্রহণ করা ও বলপ্রয়োগ করে উপভোগ করার চেষ্টা করাকে এখানে দুষ্কর্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এই অপরাধে পুষ্পোদ্ভব তাকে মৃত্যুদণ্ডরূপ শাস্তি প্রদান করেছেন।[১৭৮]

বলদ্বারা পরস্ত্রী সংগ্রহণকারীর দণ্ড কেবল মানুষের দ্বারা প্রযুক্ত হবে এমন নয়, এমন অপরাধী দেবতার দ্বারাও দণ্ডপ্রাপ্ত হয়। দেবতা দ্বারা শাস্তি বিহিত হওয়ার দৃষ্টান্ত আখ্যানে

---

[১৭৫] সিংহাসন.,পৃ.১৪

[১৭৬] দশ.,পৃ.১১২

[১৭৭] শুক.,পৃ.২৬৮

[১৭৮] দশ.,পৃ.৩৯

উক্ত হয়েছে। রাজদণ্ড কিংবা অন্যের দ্বারা শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেলেও এই অধর্মাচারী দৈবরোষের হাত থেকে কখনই রেহাই পায় না। *কথাসরিৎসাগরের* মদনমঞ্জুকা লম্বকের অষ্টম তরঙ্গের 'নৃপতি-ইন্দ্রদত্তের কাহিনি'তে ইন্দ্রদত্ত এক পরস্ত্রীকে বল প্রয়োগ পূর্বক কামনা করতে উদ্যত হলে স্ত্রীলোকটির মুখে রাজা ইন্দ্রদত্তের প্রতি সাবধান বাণী শোনা যায়। সে রাজাকে সাবধান করে বলেছে – তার প্রতি বলপ্রয়োগ করলে রাজার পাপ হবে এবং দৈবপ্রভাবে তার প্রভূত ক্ষতি হবে। রাজা তার এমন কথা শুনে সাবধান হয়েছেন এবং এমন আচরণ থেকে বিরত থেকেছেন। কিন্তু এমন আচরণে উদ্যত হওয়ার কারণেও তার কিছুদিন পর রাজার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে।[১৭৯] রাজা স্বয়ং দণ্ড প্রণেতা, তাই তিনি হয়তো ইহজগতে দণ্ডিত হবেন না, কিন্তু দৈবপ্রভাবে তার শাস্তি অনিবার্য। অন্যায় আচরণে লিপ্ত না হলেও যেহেতু তিনি দণ্ডাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এমন কর্মে উদ্যত হয়েছেন তাই তার এমন করুণ পরিণতি হয়েছে।

পঞ্চতন্ত্রের কাকোলূকীয়ম্ এর 'রথকারভার্যাকথা'টিতে রথকারের ভার্যার মুখে বলপ্রয়োগ দ্বারা স্পর্শকারীর কী দূরাবস্থা হয় তা জানা যায়। বলদ্বারা তাকে স্পর্শ করলে দেবী চণ্ডিকার প্রভাবে ঐ পুরুষ ভস্ম হয়ে যাবে – এমন উক্তি করা হয়েছে।[১৮০] স্মৃতিতেও এমন অপরাধীর জন্য অত্যন্ত কঠোর মনোভাব দৃষ্ট হয়। বৃহস্পতির মতে সমান জাতীয়া স্ত্রীর সহিত বলপ্রয়োগ করলে তার সম্পূর্ণ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে, অঙ্গচ্ছেদন করা হবে। গাধার পিঠে চড়িয়ে নগরে ভ্রমণ করা হবে। হীন জাতীয়া নারীর সহিত এমন আচরণ করলে বিহিত দণ্ডাপেক্ষা অর্ধেক দণ্ড প্রযুক্ত হবে কিন্ত যদি স্ত্রী-টির জাতি পুরুষের অপেক্ষা উচ্চ হয় তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এবং তার সকল সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া হবে।[১৮১] বৃহস্পতি জাতি অনুসারে দণ্ডের বিধান দিলেও কাত্যায়নের দণ্ড ব্যবস্থা ভিন্নরূপ। তিনি অপরাধের গুরুত্বের বিচারে দণ্ডবিধান করেছেন। তাঁর মতে, এমন অনুচিত কর্ম সম্পাদনকারীর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত।[১৮২] তিনি সকলবর্ণের

---

[১৭৯] কথা.,পৃ.১৬৯

[১৮০] পঞ্চ.,পৃ.৫৫৩

[১৮১] বৃহ.,২৪.১২,১৩,১৯

[১৮২] স্ত্রীষু বৃত্তোপভোগঃ স্যাৎ প্রহস্য পুরুষো যদা।

ক্ষেত্রেই একই দণ্ড বিহিত করেছেন। অর্থাৎ যে বলপূর্বক কোনো নারীর সহিত সম্ভোগ করে, সে যে বর্ণেরই হোক তার মৃত্যদণ্ডরূপ শাস্তি প্রাপ্য।

ছলনা করে কোনো নারীকে সম্ভোগ করা হলে তার জন্যও স্মৃতিতে প্রভূত দণ্ড বিহিত হয়েছে। এমন আচরণকারীর সকল সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া হবে, গর্দভের পিঠে ঘোরানো হবে, নগর থেকে নিষ্কাশনরূপ প্রভূত দণ্ড এমন অপরাধীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[১৮৩] ছলনা দ্বারা এমন অসৎকার্যে লিপ্ত ব্যক্তির প্রায় অনুরূপ শাস্তির দৃষ্টান্ত *কথাসরিৎসাগরের* কথামুখ লম্বকের পঞ্চমতরঙ্গের 'দেবস্মিতার কাহিনি'তে পাওয়া যায়। আখ্যানটিতে চারজন বণিকপুত্র গুহসেনের ভার্যা দেবস্মিতার সহিত মিলনের জন্য প্রব্রাজিকাকে নিয়োগ করেছে এবং সেও ছলনার আশ্রয় নিয়ে দেবস্মিতার গৃহে গমন করেছে। বণিকপুত্রদের অসৎকার্য সম্পাদনের জন্য প্রব্রাজিকা নানাবিধ কর্ম সম্পাদন করে দেবস্মিতাকে ছলনা করেছে। পরে দেবস্মিতা সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়ায় প্রব্রাজিকা ও ঐ বণিক চতুষ্টয়কে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেছে। সে বণিক চতুষ্ঠয়কে শাস্তিস্বরূপ তাদের ললাটে কুক্কুরে পদ অঙ্কিত করে, সকল আভরণ-ভূষণ নিয়ে নগ্নাবস্থায় অশুচি পঙ্কে নিঃক্ষেপ করেছে। দোষ কর্মে সহকারি হওয়ার কারণে প্রব্রাজিকা ও তার শিষ্যার কর্ণ ও নাসিকা চ্ছেদন করে তাদেরও অশুচি পঙ্কে নিঃক্ষেপ করেছে।[১৮৪] *দশকুমারচরিতের* মিত্রগুপ্তচরিতেও ছলনাদ্বারা পরস্ত্রী সংগ্রহণের অপরাধটির একটি দৃষ্টান্ত মেলে। সেখানে কলহকণ্টক বণিক অনন্তকীর্তির পত্নী নিতম্ববতীর প্রতি তার কামনা চরিতার্থ করার জন্য দূতীকে তাপসী পরিচয়ে প্রেরণ করেছে এবং নানা মিথ্যার আশ্রয়ে নিতম্ববতীকে তাদের পরিকল্পনানুযায়ী পরিচালনা করেছে। প্রথমে প্রকৃত সত্য বিষয় বুঝতে না পারলেও পরে সে সব বুঝতে পেরেছে। আখ্যানটিতে তাকে দুষ্ট কলহকণ্টকের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে এবং স্বামী দ্বারা পরিত্যক্তা হয়েছে।[১৮৫] অর্থাৎ সবক্ষেত্রেই ছলনা দ্বারা নারীকে সম্ভোগের ন্যায় দুষ্টকার্যে লিপ্ত ব্যক্তি শাস্তি পেয়েছে তা নয়, কোথাও কোথাও আবার

বধে তত্র প্রবর্তেত কার্যাতিক্রমণং হি তৎ।। কাত্যা.,৮৩০

[১৮৩] Hist.Dh.531-533

[১৮৪] কথা.,পৃ.১১৬

[১৮৫] দশ.,পৃ-৯৭

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অপরাধীর ছলনার শিকার হয়েছে এবং শাস্তি পেয়েছে। পরিত্যক্তা হওয়ার পর ঐ ব্যক্তির কাছেই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে এমন করুণ পরিণতিও দেখা যায়।

বলপ্রয়োগ দ্বারা স্ত্রীসংগ্রহণ ও ছলনা দ্বারা কামনা চরিতার্থ করার জন্য পরস্ত্রীকে পাবার চেষ্টা – এই গুলি যেমন অপরাধ, পরস্ত্রীর সম্মতিতে পরস্ত্রীর সহিত সম্পর্ক স্থাপনও একটি গুরুতর অপরাধ। আখ্যানে সকল ক্ষেত্রেই এমন উপপতির মৃত্যুদণ্ডরূপ শাস্তি বিহিত হয়েছে। *কথাসরিৎসাগরের* মদনমঞ্চকা লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গের 'বিষ্ণুদত্ত ও তার সপ্তমূর্খের কাহিনি'তে শবর তার পত্নীর সহিত সংসর্গ থাকায় তার পত্নীর উপপতিকে প্রাণদণ্ড দিয়েছে।[১৮৬] শবর কর্তৃক দণ্ডপ্রদানের এই আচরণটিকে আখ্যানে যথার্থ বলে সম্বোধিত করা হয়েছে – যার দ্বারা বোঝা যায় সে উপযুক্ত অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডই প্রদান করেছে। পরস্ত্রীসংসর্গ একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। তার সপক্ষে আর একটি দৃষ্টান্ত *কথাসরিৎসাগরের* কথামুখ লম্বকের পঞ্চম তরঙ্গের 'শক্তিমতী ও তার স্বামীর কাহিনি'তে পাওয়া যায়। আখ্যানটিতে পরস্ত্রীর সাথে কোনো ব্যক্তি ধরা পড়লে তাদের যক্ষের মন্দিরে গর্ভগৃহে বন্দী করে রাখা হত। প্রাতঃকালে ঐ নারী ও পুরুষকে বিচারসভায় উপস্থিত করে তাদের যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া হত এবং সকলকে তাদের কীর্তিকলাপ জানানো হত।[১৮৭] রাজা এদের কী দণ্ড দিতেন তা এখানে উল্লিখিত না হলেও অধর্মাচরণকারী এমন নারী-পুরুষ যে উভয়ই দণ্ডনীয় ছিল তা স্পষ্ট। রাজদণ্ড ব্যতীত অপর তাদের একটি শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তা হল সমাজের সকলের কাছে তাদের অপরাধের কথা জানিয়ে তাদের সামাজিক অবস্থানের পদস্খলন করা হয়েছে যাতে এরা সকলের দ্বারা নিন্দিত ভৎর্সত হয়। এখানে নির্দিষ্ট দণ্ডের উল্লেখ না থাকলেও এমন অপরাধকারীর দণ্ড জাতি-বর্ণানুযায়ী নির্দিষ্ট হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, পরস্পরের সহমতিতে ব্যভিচার করলে, নারীটি পুরুষের সমজাতীয়া হলে অধিকতম দণ্ড

[১৮৬] কথা.,পৃ.১৪৫

[১৮৭] তদেব,পৃ.১১৭

হবে, হীন হলে মধ্যম দণ্ড হবে এবং উচ্চজাতির হলে মৃত্যুদণ্ড হবে। স্ত্রীর নাক-কান কেটে দেওয়া হবে।[১৮৮]

সত্যের পথে স্থিতা নারী সম্মানীয়া। তাইতো এমন কুলবধূ, পুরনারীদের অবমাননাকারীর চরম শাস্তি প্রণীত হয়েছে। *দশকুমারচরিতে*র বিশ্রুতচরিতে পুরনারীদের স্পর্শকে অসহনীয়া অপমান বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৮৯] কুলবধূকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার জন্য রাজপুরোহিত, মন্ত্রী এমন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও রাজা দেশ থেকে বহিষ্কার করেছেন। এমন আচরণকারীকে শাস্তি প্রদানের উদ্যোগ আখ্যানগুলিতে স্পষ্ট। স্মৃতিতেও দণ্ডবিধানের মাধ্যমে নারী-পুরুষের আচরণবিধি নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং তা উল্লঙ্ঘনকারীর উপযুক্ত দণ্ড বিহিত হয়েছে। তবে আখ্যানে সেক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র ব্যক্তির কামনার শিকার কোনো নিষ্পাপ নারী হয় তার স্বার্থে কী ব্যবস্থা সমাজে ছিল সেরূপ দিক নির্দেশ পাওয়া যায় না। তবে এমন নারীর অসহায়তার একটি দৃষ্টান্ত *কথাসরিৎসাগরে*র মদনমঞ্জুকা লম্বকের অষ্টম তরঙ্গের 'রাজা ইন্দ্রদত্তের কাহিনি'তে দেখা যায়। সেখানে নারীটি বলেছে যে, তাকে যদি পরপুরুষদ্বারা বলপূর্বক স্পর্শ করা হয় তবে তা তার কাছে চরম অপমান। এবং তাই সে আত্মহত্যা করবে।[১৯০] স্মৃতিতে এমন নারীর জন্য কোনো দণ্ড দেওয়া হয়নি। এমন নারী প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পুনরায় পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়। তাকে গৃহে অত্যন্ত সুরক্ষিত ভাবে রাখার কথা বলা হয়েছে। এই যে নারীর শীলতা রক্ষার প্রচেষ্টা তা আখ্যান ও স্মৃতিতে ধরা পড়েছে।

---

[১৮৮] সজাতাবুত্তমো দণ্ড অনুলোম্যে তু মধ্যমঃ।

প্রাতিলোম্যে বধঃ পুংসো ভার্যাঃ কর্ণাদিকর্তনম্।। যাজ্ঞ.,২.২৮৬

[১৮৯] দশ.,পৃ-১১১

[১৯০] কথা.,পৃ-১৬৯

৫. একটি অপরাধরূপে স্তেয়

প্রাচীন ভারতে স্তেয় বা চৌর্যকার্যকে অত্যন্ত পাপ ও গর্হিত অপরাধ বলে মনে করা হয়েছে। অন্যের বস্তুকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে হরণ করাকে চৌর্য বলা হয়। কাত্যায়নের মতে, প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যে দিনে বা রাতে অন্যব্যক্তির দ্রব্যহরণ করাকে স্তেয় বলা হয়।[১৯১] বৃহস্পতি দুই প্রকার চোরের কথা বলেছেন- প্রকাশ ও অপ্রকাশ।[১৯২] অসৎ ব্যবসায়ী, জুয়াড়ী, মিথ্যাচিকিৎসক, ঘুষখোর সভ্য, কপট ভবিষ্যৎগণনাকারী এরা হলেন প্রকাশ তস্কর। যারা রাত্রে অন্ধকারে সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে চুরি করে কিংবা এমন অস্ত্র নিয়ে ঘোরে তাদেরকে অপ্রকাশ তস্কর বলে। স্মৃতিতে নয় প্রকার অপ্রকাশ তস্করের উল্লেখ পাওয়া যায়- উৎক্ষেপক (যারা কর্মে ব্যস্তব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করে), সিঁধ কেটে যারা চুরি করে, পান্থমুট্ (যাত্রীদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠনকারী), গ্রন্থিভেদক (পকেটমার), স্ত্রীচোর, পুরুষচোর, পশুচোর, অশ্বচোর তথা অন্যান্য পশুচোর। স্মৃতিতে বিভিন্ন প্রকার চোর্যের ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য অল্পমূল্য, মধ্যমমূল্য ও বহুমূল্যের দ্রব্যহরণের ক্ষেত্রে দেশ, কাল, অপহর্তার বয়স ও শক্তি বিবেচনা করে যথাক্রমে অধম, মধ্যম ও উত্তম সাহস দণ্ড দিতে বলেছেন।[১৯৩]

৫.১ গল্পগুলিতে স্তেয় অপরাধের স্বরূপ

বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যান গুলিতে বিভিন্ন অপরাধের একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই সকল অপরাধগুলির মধ্যে আখ্যানে যে অপরাধটির প্রভূত দৃষ্টান্ত মেলে তা হল স্তেয় বা চৌর্য। স্মৃতিশাস্ত্রে চৌর্যের যে বিভাগটি উল্লিখিত হয়েছে তার অধিকাংশগুলিই বিভিন্ন আখ্যানগুলিতে

---

[১৯১] প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশং বা নিশায়ামথবা দিবা।
যৎপরদ্রব্যহরণং স্তেয়ং তৎপরিকীর্তিতম্।। কাত্যা.৮১০

[১৯২] প্রকাশাপ্রকাশাশ্চ তস্করাঃ দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ। বৃহ.২২.১

[১৯৩] ক্ষুদ্রমধ্যমহাদ্রব্যহরণে সারতো দমঃ।
দেশকালবয়ঃশক্তিং সংচিন্ত্য দণ্ডকর্মণি।। যাজ্ঞ.২.২৭৫

পাওয়া যায়। *কথাসরিৎসাগরে* অলংকারবতী লম্বকে পঞ্চম তরঙ্গের শিশুচুরির উল্লেখ পাওয়া যায়। শক্তিযশ লম্বকে গৃহপালিতপশু গাভী চুরির ন্যায় ঘটনা রয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রের* কাকোলূকীয়ম্ এর 'ব্রাহ্মণ-চৌর-পিশাচকথা'য় ব্রাহ্মণকে চোরেদের হাত থেকে গবাদিপশু রক্ষা করতে দেখা যায়। *কথাসরিৎসাগরের* মদনমঞ্জুকা লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গের 'হরিশর্মাদ্বিজের কাহিনি'তে পরিচারিকা কর্তৃক গৃহের মহামূল্যবান অলংকারাদি চুরি হওয়ার ঘটনা দেখা যায়। *পুরুষপরীক্ষায়* হাসবিদ্যকথায় ধনীব্যক্তির গৃহে সিঁধ কেটে চুরি করার সময়ে চোরেরা নগররক্ষকদের হাতে ধরা পড়েছে। *কথাসরিৎসাগরের* মদনমঞ্জুকা লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গ গুপ্তধন চুরির দৃষ্টান্ত দেখা যায়- অর্থাৎ স্মৃতিতে উল্লিখিত সকল প্রকার চোর্যই আখ্যানে দৃষ্ট হয়।

আবার চৌর্যের দণ্ডবিধানের বিষয়েও স্মৃতির সাথে আখ্যানের একাধিক মিল পাওয়া যায়। শুধু শাস্তিবিধান নয়, চোর ধরার যে কৌশল আখ্যানে মেলে তাতেও স্মৃতিবিহিত কৌশলের ছাপ স্পষ্ট। *দশকুমারচরিতের* সোমদত্তচরিতে দেখা যায় রাজদ্রব্যাদি চুরির অপরাধে কতগুলি চোরকে কারাগারে বন্দি করা হয়েছে। তাদের থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি মিলিয়ে দেখার পর একটি বহুমূল্যদ্রব্য অনুপস্থিত থাকায় রক্ষীগণ তা অন্বেষণ শুরু করে। পরে এক ব্রাহ্মণের নিকটে ঐ রত্নটি প্রাপ্ত হয়ে তাকে চোর সন্দেহে বদ্ধ করা হয়, পরে তার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রাদি অনুসন্ধান করে রক্ষীগণ রত্নটির প্রকৃত চোর কে তা অনুসন্ধান করে। কেবল তাই নয় যেহেতু মহামূল্যবান রত্নটি সোমদত্ত ব্রাহ্মণকে দিয়েছিল তাই তাকে চোর সন্দেহে কারারুদ্ধ করা হয়।[১৯৪] স্মৃতিতেও চোর ধরার জন্য একাধিক উপায় বা কৌশল অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে। রাজকর্মচারীরা চুরি যাওয়া দ্রব্য পেয়ে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে অনুসরণ করে পূর্বে চোর বলে চিহ্নিত হয়েছে এমন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চোর-কে তা অনুসন্ধান করবেন। কেবল সন্দেহের বশেও রাজকর্মচারীগণ কাউকে বন্দি করতে পারেন। যারা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর প্রদান করে না, জুয়াড়ী, মাতাল, বেশ্যাগামী এমন ব্যক্তিকে চোর সন্দেহে বন্দি করা যেতে পারে। এছাড়াও যে বা যারা ধনহীন বলে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করে, যে

[১৯৪] দশ.,পৃ.৩৪

পুরোনো অথবা হারিয়ে যাওয়া দ্রব্য বিক্রয় করে কিংবা এমন ব্যক্তি যে অকারণে অন্যের সম্পত্তি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে- সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমন ব্যক্তিরা চোর সন্দেহের আওতাভুক্ত। তবে কাউকে সন্দেহের বশে বন্দি করা গেলেও ঐ ব্যক্তি সত্যই চোর কিনা সে বিষয়ে যথাবিধি অনুসন্ধান করে তবেই রাজা দণ্ড প্রণয়ন করবেন। কারণ নিরোপরাধী ব্যক্তি চুরি যাওয়া দ্রব্যটি কারো থেকে ক্রয় করে থাকতে পারেন কিংবা দান হিসাবেও পেয়ে থাকতে পারেন। তাই কেবল সন্দেহের কারণ কাউকে চোর বলে শাস্তি দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আলোচ্য আখ্যানটিতেও প্রকৃত চোর অনুসন্ধানে যথাবিধি কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে চোর্যের প্রভূত দৃষ্টান্তের মধ্যে সিঁধ কেটে চুরির একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্মৃতিতেও এটিকে চোর্যের একটি ভেদরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আভরণ-অলংকারাদি চুরির পাশাপাশি গৃহস্থালিদ্রব্যাদি, গবাদিপশু ইত্যাদি চুরি কথা স্মৃতিতে পাওয়া যায়। গল্পগুলিতেও স্মৃতি উল্লিখিত এই সকল দ্রব্যাদি চুরির কথা উঠে এসেছে। শুধু তাই নয় শিশু চুরির ন্যায় নিকৃষ্ট ঘটনার দৃষ্টান্তও সেখানে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও চোর্যবৃত্তিতে যুক্ত এই সকল ব্যক্তিদের অপরাধ কেবল দ্রব্যাদি অপহরণেই সীমাবদ্ধ থাকেনি – তারা সাধারণের প্রাণসংহারে লিপ্ত হয়েছে। *কথাসরিৎসাগরের* নরবাহনদত্তজনন লম্বকের প্রথমতরঙ্গে রাজ্ঞী বাসবদত্তার নিকট পিঙ্গলিকানামক ব্রাহ্মণী জানায় দস্যুকর্তৃক তার গৃহাভ্যন্তরস্ত নৃপতির দান সহ সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছে।[১৯৫] *দশকুমারচরিতের* অপহারবর্মা চরিতে সিঁধ কেটে চুরির বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে যেমন এরূপ চুরির বিভিন্ন কৌশলের বর্ণনা আছে তেমনি তার পাশাপাশি চৌর্যের নানাবিধ উপকরণের তালিকাও রয়েছে। অপহারবর্মা লোভী বণিকের গৃহে সিঁধ কেটে প্রথমে ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ভেতরের সব কিছু দেখে নিয়ে পরে খুব সহজে প্রবেশ করে মহামূল্যবান রত্ন ও অর্থ সংগ্রহ করে। একইভাবে সে কুবেরদত্তের গৃহেও এমনভাবে চুরি করেছে যে সেই গৃহে কেবল মাটির পাত্র অবশিষ্ট ছিল।[১৯৬] *বেতালপঞ্চবিংশতির* তৃতীয় আখ্যানেও শুক পাখির গল্পে চোরের

---

[১৯৫] কথা.,পৃ.৯

[১৯৬] দশ.,পৃ.৫২

সিঁধ কেটে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের উল্লেখ আছে। তস্করবৃত্তিতে যুক্ত ব্যক্তিদের নৃশংসতার পরিচয় *কথাসরিৎসাগরের* নরবাহনদত্তজনন লম্বকের দ্বিতীয় তরঙ্গের একটি আখ্যানে পাওয়া যায়। সেখানে তস্করগণ বনমধ্যে জীমূতবাহনের সর্বস্ব অপহরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি তাকে চণ্ডিকা মন্দিরে বলিদান করতেও উদ্যত হয়েছে।[১৯৭] এমনি আর এক দৃষ্টান্ত *দশকুমারচরিতের* পূর্বপীঠিকার কুমারোৎপত্তিনামক প্রথমোচ্ছ্বাসেও দেখা যায়। সেখানে তস্করবৃত্তিধারী শবরজাতির কিছুজন ভবিষ্যৎকার্যসিদ্ধির আশায় একটি শিশুকে বলি দিতে তৎপর হয়েছে।[১৯৮] অন্যের ধন হরণ করে বিত্তবান ব্যক্তিকে কপর্দকশূন্য ও অসহায় করে দেওয়া এই অপরাধে সংযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তিবিধান সম্পর্কে আখ্যান ও স্মৃতিতে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করতে দেখা যায়। স্মৃতিতে চৌর্যবিষয়ের বিচারকালে কালবিলম্ব না করার কথা বলা হয়েছে।

যাজ্ঞবল্ক্য অসাধারণ ব্যবহারমাতৃকা প্রকরণে যে সকল বিবাদগুলির বিচারকালে কালবিলম্ব না করেই প্রত্যর্থীকে দিয়ে উত্তর দেওয়াতে বলেছেন তার মধ্যে চৌর্য অন্যতম (যাজ্ঞ.২.১২)। অপরের দ্রব্য হরণকারীকে শাস্তি দেওয়ার এই তৎপরতা আখ্যানেও মেলে। *পুরুষপরীক্ষার* চৌরকথায় রাজ্যে চোরের উপদ্রব থাকায় রাজা তাদের ধরতে এবং দণ্ড প্রদান করতে বিশেষ তৎপর হয়েছেন। ছদ্মবেশ ধারণ করে নগরের চৌর্যবৃত্তিধারীদের অন্বেষণ করে পুররক্ষক দ্বারা তাদের বদ্ধ করেছেন।[১৯৯] *কথাসরিৎসাগরের* সুরতমঞ্জরী লম্বকের দ্বিতীয় তরঙ্গের একটি কাহিনিতে দেখা যায় অযোধ্যায় বীরবাহুনামক রাজা তার রাজ্যে চোরের উপদ্রবের কথা জানতে পেরে, প্রজাদের দ্বারা চোরের সন্ধান লাভ করতে না পেরে স্বয়ং খড়্গ হস্তে চোর নিধনের উদ্দেশ্যে নির্গত হয়েছেন।[২০০]

আখ্যানগুলির তথ্যানুযায়ি তস্করবৃত্তিধারীর দণ্ড বেশ কঠোর ছিল। কোথাও স্মৃতির ন্যায় দণ্ডব্যবস্থা দেখা যায় আবার কোথাও কোথাও আখ্যানে অভিনব শাস্তিপদ্ধতিরও উদাহরণ

---

[১৯৭] কথা.,পৃ.১৬

[১৯৮] দশ.,পৃ..৮

[১৯৯] পুরুষ.,পৃ.২৮

[২০০] জগদীশলাল শাস্ত্রী,কথা.,পৃ.৪৩৩

মেলে। *পুরুষপরীক্ষার* হাসবিদ্যকথায় চার চোরকে সিঁধ কেটে চুরির অপরাধে শূলে চড়িয়ে মৃত্যদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।[২০১] *দশকুমারচরিতের* অর্থপালচরিতেও ধনীব্যক্তির গৃহে চুরির অপরাধে শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিতে দেখা যায়।[২০২] *কথাসরিৎসাগরে* লাবাণক লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গের 'বিদূষকের কাহিনি'তেও চোরেদের শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।[২০৩] সিঁধ কেটে চুরি করে এমন চোরকে শূলে চড়িয়ে বধ করার এই দণ্ডব্যবস্থা মনু কর্তৃকও উল্লিখিত হয়েছে। মনুর মতে, যে সব চোর রাত্রিতে সিঁধ কেটে চুরি করে রাজা তাদের দুই হাত কেটে দিয়ে তীক্ষ্ণ শূলে চাপিয়ে তাদের বধ করবেন।[২০৪] রাজার দ্রব্য চুরি করা কিংবা রাজকোষ থেকে সম্পদ চুরি করা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ বলে মনে করা হত এবং তার শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর ছিল। *কথাসরিৎসাগরের* রত্নপ্রভা লম্বকের নবম তরঙ্গের 'সূত্রধরের কাহিনি' থেকে জানা যায় প্রাণধর ও রাজ্যধর দুই ভাই দারুময় রাজহংস যুগল নির্মান করে, তার সাথে রজ্জুর সংলগ্ন করে, তার দ্বারা রাজকোষাগার থেকে অর্থ চুরি করতো। ভাণ্ডারিক যখন সকল বিষয়ে অবগত হয়ে রাজাকে জানায় তখন রাজকোষে সম্পদ অপহরণের অপরাধে কঠোর দণ্ড পেতে হবে- এমন ভয়ে অষ্টশতযোজন দ্রুত বেগে গমনে সমর্থ বায়ুচালিত যানে দ্রুত গমন করে দুই ভাই দেশত্যাগ করেছেন।[২০৫] আবার *কথাসরিৎসাগরের* মদনমঞ্জুকা লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গের 'হরিশর্মাদ্বিজের কাহিনি'তে পরিচারিকা চুরির অপরাধে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার ভয়ে কম্পিত হয়েছে।[২০৬] মনু রাজ কোষাগার থেকে ধন হরণকারীকে রাজদ্রোহকারীর ন্যায় দণ্ড দিতে বলেছেন। রাজার ক্ষতিসাধনে তৎপর ব্যক্তিদের

---

[২০১] পুরুষ.,পৃ-৭৩

[২০২] দশ.,পৃ-৭৬

[২০৩] হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস, কথা.,পৃ.১৫৮

[২০৪] সন্ধিং ছিত্ত্বা তু যে চৌর্যং রাত্রৌ কুর্বন্তি তস্করাঃ।
তেষাং ছিত্ত্বা নৃপো হস্তৌ তীক্ষ্ণশূলে নিবেশয়েৎ।। মনু.,৯.২৭৬

[২০৫] তত্রৈব,পৃ.২৭০

[২০৬] তত্রৈব,পৃ.১৩৩

ন্যায় রাজকোষে চুরি করে এমন ব্যক্তিকেও তিনি অপরাধ অনুসারে হস্তপদচ্ছেদনাদি নানা প্রকার দণ্ডের দ্বারা বধ করতে বলেছেন।[২০৭]

স্মৃতিতে প্রাপ্ত চৌর্যাপরাধের দণ্ডব্যবস্থাটি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে দুটি বিষয় চোখে পড়ে। যথা- সেখানে দণ্ডব্যবস্থার প্রয়োগে বর্ণব্যবস্থারও অনুসরণ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি হল চুরি যাওয়া দ্রব্যের প্রকৃতি বা গুরুত্বের বিচারে দণ্ডব্যবস্থা স্থির করা হয়েছে। কিন্তু আখ্যানগুলিতে চৌর্যাপরাধের দণ্ডব্যবস্থার ক্ষেত্রে এমন বিশিষ্টতা চোখে পড়ে না। নারদ চৌর্যাপরাধে উচ্চজাতির ব্যক্তির জন্য অধিক দণ্ড বিহিত করেছে। তাঁর মতে শূদ্র চুরি করলে চৌর্য দ্রব্যের আট গুণ তাকে দিতে হবে। এই একই অপরাধে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ যুক্ত থাকলে যথাক্রমে ষোল, বত্রিশ, চৌষট্টি গুণ দ্রব্য দণ্ডস্বরূপ দিতে হবে। এক্ষেত্রে কারণটি সম্ভবতঃ, যেহেতু এই সকল বর্ণের ব্যক্তিরা শিক্ষিত-উচ্চস্থানীয় এবং সকল বিষয়ে অবগত হয়েও এমন অপরাধে লিপ্ত হয়েছেন। এছাড়াও এই সকল ব্যক্তিদের সমাজের স্বার্থে নিষ্ঠাবান ও সৎ হওয়া বিশেষ আবশ্যক-তাই এমন দণ্ডব্যবস্থা। বস্তুতঃ এমন কঠোর দণ্ডব্যবস্থা দ্বারা এদের অপরাধ কর্ম থেকে দূরে রাখার চেষ্টাই করা হয়েছে। *মনুসংহিতায়*ও অনুরূপ দণ্ডবিধান পাওয়া যায়।[২০৮] দ্রব্যানুযায়ী দণ্ডব্যবস্থা প্রায় সকল স্মৃতিকারগণই করেছেন। কোন দ্রব্যহরণে কী দণ্ড, দ্রব্যাদির নাম উল্লেখপূর্বক তা স্তেয়প্রকরণে উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, অল্পমূল্য, মধ্যমমূল্য ও বহুমূল্যের দ্রব্য হরণের ক্ষেত্রে দেশ-কাল-অপহর্তার বয়স ও শক্তি বিবেচনা করে রাজা অধম, মধ্যম ও উত্তম সাহস দণ্ড দেবেন।[২০৯] আখ্যানে কিন্তু দণ্ডব্যবস্থার ক্ষেত্রে এত সুনির্দিষ্ট চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়

---

[২০৭] রাজ্ঞঃ কোষাপহর্তৃংশ্চ প্রতিকূলেষু চ স্থিতান্।
ঘাতয়েদ্দ্বিবিধৈর্দণ্ডৈররীণাঞ্চোপজাপকান্।। মনু.,৯.২৭৫

[২০৮] অষ্টাপাদ্য তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষম্।
...
বিদ্যাপি চ বিশেষেণ বিদ্বৎস্বভ্যধিকং ভবেৎ।। নারদ.,৫১-৫২ (পরিশিষ্ট)
তুল. মনু.-৮.৩৩৭-৩৩৮

[২০৯] ক্ষুদ্রমধ্যমহাদ্রব্যহরণে সারতো দমঃ।

না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। *বেতালপঞ্চবিংশতি*র ঊনবিংশ সংখ্যক বেতালের গল্পে চোরকে শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায়। চৌর্যাপরাধের যে গুরুতর শাস্তি পেতে হত, তা আখ্যানগুলিতে স্পষ্টতই দেখা যায়। *কথাসরিৎসাগরে*র অলংকারবতী লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গে কণ্ঠাভরণহরণকারী চোর দণ্ডের ভয়ে পুররক্ষীর হাত থেকে পলায়নকালে সমুদ্রে পতিত হয়ে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েছে।[২১০] বস্তুতঃ পুররক্ষীর হাতে ধরা পড়লে কঠোর দণ্ড পেতে হবে এই ভয়ে চোর পলায়ন করেছিল। যা থেকে এই অপরাধে ধৃত ব্যক্তি রাজার দ্বারা অবশ্যই দণ্ডিত হত এমনটা সহজেই অনুমান করা যায়। আলোচ্য গ্রন্থেরই নরবাহনদত্তজনন লম্বকের দ্বিতীয় তরঙ্গে শবরপতি ও তস্করদের অধিপতি পুলিন্দককে সার্থবাহলুণ্ঠনের অপরাধে বন্দি করে দণ্ডদানের জন্য রাজার কাছে পেশ করা হয়েছে।[২১১] শশাঙ্কবতী লম্বকের একবিংশ তরঙ্গে রাজা বীরবাহু চোরেদের বন্দি করে নিয়ে আসেন এবং শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আদেশ দেন।[২১২] তবে অপরাধমূলক এই বৃত্তিতে যুক্ত ব্যক্তিদের সমাজের মূলস্রোতে ফেরানোর চেষ্টাও করা হত। রাজা এদের সংশোধনের সুযোগ করে দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্তও আখ্যানে মেলে। যেমন *পুরুষপরীক্ষার* চৌরকথা আখ্যানটিতে রাজা বিক্রমাদিত্য পাঁচজন চোরকে তাদের প্রথম চুরির জন্য ক্ষমা করেছেন এবং তাদেরকে পুনরায় চুরি করলে শাস্তি পেতে হবে এমন সতর্কবার্তাও দিতে দেখা যায়, কেবল তাই নয়, চোর তাকে রত্ন, সুবর্ণাদি প্রদান করে তাদের দারিদ্রতা দূর করে প্রধান চোরকে শাল্মলি নগরের রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[২১৩] তবে তারা পুনরায় আবার অপরাধ কর্মে লিপ্ত হলে রাজা তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেছেন এবং পরবর্তীকালে কৃতকর্মের জন্য তাদের মৃত্যুদণ্ডও হতে দেখা যায়।[২১৪] এই দৃষ্টান্তের দ্বারা বিচারব্যবস্থার নমনীয় দিকটি প্রকট হয়েছে। যেখানে দুর্বৃত্তদের সামাজিক জীবনে ফেরার সুযোগ

দেশকালবয়ঃশক্তিং সংচিন্ত্য দণ্ডকর্মণি।। যাজ্ঞ.,২.২৭৫

[২১০] জগদীশলাল শাস্ত্রী,কথা.,পৃ.২৭৬

[২১১] হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস, কথা.,পৃ.১৭

[২১২] তদেব,পৃ.১৩-৩১

[২১৩] পুরুষ.,পৃ.২৯

[২১৪] চৌরং প্রদাপ্যাপহৃতং ঘাতয়েদ্ বিবিধৈর্বধৈঃ। যাজ্ঞ.,২.২৭০

করে দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আখ্যানটিতে পাঁচজন চোর নগরের যা কিছু চুরি করেছিল, তা তারা ফেরৎ দিতে বাধ্য হয়েছে- যা থেকে দণ্ডব্যবস্থায় দ্রব্য প্রত্যর্পণবিধি প্রচলিত ছিল তা জানা যায়। অর্থাৎ চোরকে যেমন দণ্ড পেতে হত তেমনি দ্রব্যটিরও পূরণ করতে হত। স্মৃতিতেও অনুরূপ একটি বিধান দৃষ্ট হয়। যাজ্ঞবল্ক্য চোর নিশ্চয়ের পর তাকে দিয়ে অপহৃত দ্রব্য ফেরৎ দেওয়াতে বলেছেন এবং তারপর তাকে শাস্তি বিধান করতে বলেছেন। নারদ সাধারণ দ্রব্যচুরি করা হলে তার পাঁচগুণ দণ্ডস্বরূপ দিতে বলেছেন কিন্তু মনু দ্বিগুণ পরিমাণ দ্রব্য দেওয়ার কথা বলেছেন।[২১৫]

কয়েকটি আখ্যানে চৌর্যাপরাধে মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত কিছু ভিন্নরূপ অভিনব শাস্তি দিতেও দেখা যায়। *শুকসপ্ততিকথার* অষ্টাদশ কথায় চৌরকে এক বণিকের গৃহে শস্যচুরির অপরাধে দণ্ডস্বরূপ নগরে গলায় শস্য বেঁধে পরিভ্রমণ করানো হয়েছে।[২১৬] আবার *বেতালপঞ্চবিংশতি*গ্রন্থের চর্তুদশ উপাখ্যানে রাজা মৃত্যুদণ্ডের পূর্বে বদ্ধবেশ পরিধান করিয়ে গর্দভে আরোহণ করিয়ে চোরকে সমস্ত নগরে ঘোরানোর আদেশ দিয়েছেন।[২১৭] যেহেতু চোর দ্বারা নগরবাসীর প্রভূত ক্ষতি হয়, ধনবান ব্যক্তিও তাদের কারণে ধনহীন হয়ে পড়ে- তাই নগরবাসীর সম্মুখেই তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিংবা হয়তো চুরি করলে এমন দণ্ড পেতে হবে, এরূপ দৃষ্টান্ত নগরবাসীকে দেখিয়ে তাদের এমন কার্য থেকে বিরত থাকার বার্তা দেওয়ার জন্যই এমন শাস্তি বিহিত হয়েছে। *দশকুমারচরিতে*র অর্থপালচরিতে পূর্ণভদ্র নামক এক ব্যক্তি নগরের প্রধানের গৃহে চুরি করার সময় নগর রক্ষকদের কাছে ধরা পড়লে, রাজা মত্ত হস্তী দ্বারা পদপিষ্ঠ করে তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে রাজা জন সমক্ষেই শাস্তি দিতে আদেশ করেছেন।[২১৮] এখানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া

---

[২১৫] কাষ্ঠকাণ্ডতৃণাদীনাং মৃন্ময়ানাং তথৈব চ।

...

সর্বেষামল্পমূল্যানাং মূল্যাৎ পঞ্চগুণো দমঃ।। নারদ.,২২-২৪ (পরিশিষ্ট)

তুল. মনু., ৮.৩২৬-৩২৯

[২১৬] শুক.,পৃ.৯৭

[২১৭] বেতাল.,পৃ.১১৭

[২১৮] দশ.,পৃ.৭৬

হলেও চুরি করার সময় চৌর্যবস্তু সমেত কোনো চোর ধরা পড়লে কাত্যায়ন তাকে তৎক্ষণাৎ দেশ থেকে বহিষ্কার করতে বলেছেন। কাত্যায়ন তার এই বিধানটি মনু সম্মত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে মনু কেবল ব্রাহ্মণকেই নির্বাসন দিতে বলেছেন। *মনুসংহিতায়* এমন বিধানই দেখা যায় (৮.৩৮০)। কাত্যায়ন বিদ্বান ব্রাহ্মণ ও অবিদ্বান ব্রাহ্মণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডবিধি স্থির করেছেন। তাঁর মতে যদি বিদ্বান ব্রাহ্মণ চুরি করা দ্রব্য সমেত কিংবা দ্রব্য ছাড়াও ধরা পড়ে তবে তার দেহে অপরাধের চিহ্নাঙ্কন করে তার সকল সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া হবে। যদি চোর অবিদ্বান ব্রাহ্মণ কিংবা ধনহীন ব্রাহ্মণ হন তবে তার পদযুগল বদ্ধ করে রাখতে হবে, কম ভোজন দেওয়া হবে এবং আমৃত্যু রাজার কার্য করানো হবে।[২১৯]

স্মৃতির বিচারে ও আখ্যানের বিচারে তস্করবৃত্তি এক ঘৃণ্য অপরাধ। তাই এই অপরাধে যুক্ত ব্যক্তি ক্ষমার অযোগ্য। অনেক অপরাধের ক্ষেত্রে সমাজের উচ্চস্থানীয় ব্যক্তির অনুরোধে কিংবা কেউ জামিনদাররূপে থেকে অর্থের বিনিময়ে অপরাধীকে দণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতো, কিন্তু অপরাধী যদি চৌর্যবৃত্তিযুক্ত হন তবে তাকে কোনো কিছুর বিনিময়েই মুক্তি দেওয়া হত না। *বেতালপঞ্চবিংশতি*গ্রন্থের চর্তুদশ আখ্যানে রাজার দ্বারা মৃত্যুদণ্ডরূপ আজ্ঞা দেওয়ার পর, নগরের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা ধনী বণিক কন্যার প্রাণ বাঁচানোর জন্য বিস্তর অর্থের বিনিময়ে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ঐ চোরের প্রাণদণ্ড রোধ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সমস্ত নগরবাসীকে যে নির্ধন করেছে, যার জন্য রাজারও প্রাণসংশয় ঘটেছে- এমন অপরাধীকে রাজা কোনো কিছুর বিনিময়েই মুক্ত করতে রাজী হয়নি।[২২০] আলোচ্য উদাহরণটি থেকে দুটি বিষয় সহজেই অনুমান করা যায়- প্রথমতঃ জামিনদার থেকে অর্থের বিনিময়ে কারো প্রাণ ভিক্ষা করার চল ছিল, সেই কারণেই বণিক এমন আবেদন করেছে। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু চোর প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে, অত্যন্ত দুঃসাহসিকভাবে অপরাধ কর্মে লিপ্ত থেকেছে তাই তার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। স্মৃতিতে

---

[২১৯] সহোঢ়মসহোঢ়ং বা তত্ত্বাগমিতসাহসম্।

...

কুর্যুঃ কর্মাণি নৃপতেরামৃত্যোরিতি কৌশিকঃ।। কাত্যা.,৮২৪-৮২৫

[২২০] বেতাল.,পৃ.১১৭

তস্করবৃত্তিধারী ব্যক্তির পাশাপাশি এই ব্যক্তিকে সমর্থনকারীরও দণ্ড বিহিত হয়েছে। এরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত *কথাসরিৎসাগরের* নরবাহনদত্তজনন লম্বকের দ্বিতীয় তরঙ্গে দেখা যায়। যেখানে লুণ্ঠনের অপরাধে শবরপতিকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হলে, জীমূতবাহন এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে শবরপতিকে রক্ষা করেছেন।[২২১] মনু, কাত্যায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য প্রায় সকল স্মৃতিকারই চোরকে সাহায্যকারী ব্যক্তির দণ্ড বিধান করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, চোরের দুরভিসন্ধি জেনে শুনেও যে চোর বা ঘাতককে অন্ন, বাসস্থান, অগ্নি, জল, চৌর্যমন্ত্র, চৌর্যের উপকরণ 'দা' প্রভৃতি এবং যাতায়াতের ব্যায় দান করে সেই ব্যক্তি উত্তম সাহসদণ্ডে দণ্ডিত হবে।[২২২] মনু এমন ব্যক্তিকে চোরের ন্যায় বধদণ্ড দিতে বলেছেন। কাত্যায়নও একই দণ্ড দিতে বলেছেন।[২২৩]

এইভাবে স্মৃতিতে ও আখ্যানে চৌর্যের দণ্ড নিশ্চিত করে প্রজাদের ধনরক্ষার তথা রাজার রাজকোষ সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজের ক্ষতস্বরূপ প্রতারণা, চুরি, দ্রব্য অপহরণ এই অপরাধগুলি কেবল দণ্ডব্যবস্থা কঠোর করেই বন্ধ করা যাবে না, মানুষের সহযোগিতা ও সচেতনতাও একান্ত আবশ্যক। সুন্দর সমাজের স্বার্থে মানবজনের প্রতি আখ্যানে এমন আবেদনও করা হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রের* মিত্রসম্প্রাপ্তিতে স্ত্রী ও ধনের অপহরণ রুখে দিতে বলা হয়েছে। এই কর্মের জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করলেও ঐ ব্যক্তির অক্ষয়লোক প্রাপ্তি হয়।[২২৪] এক্ষেত্রে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো ব্যক্তির প্রতিই এই সহমর্মিতার আবেদন করা হয়েছে। অপহরণ রুখে দেওয়ার সময় কার সম্পদ রক্ষা করা হচ্ছে তা দেখাও কাম্য নয়- আলোচ্য আখ্যান থেকে এমন উপদেশই পাওয়া যায়।

---

[২২১] কথা.,পৃ.১৭

[২২২] ভক্তাবকাশাগ্ন্যুদকমন্ত্রোপকরণব্যয়ান্।

দত্বা চৌরস্য বা হন্তুর্জানতো দম উত্তমঃ।। যাজ্ঞ.,২.২৭৬

[২২৩] গ্রামেষ্বপি চ যে কেচিচ্চৌরাণাং ভক্তদায়কাঃ।

ভাণ্ডাবকাশদাশ্চৈব সর্বাংস্তানপি ঘাতয়েৎ।। মনু.,৯.২৭১

তুল. কাত্যা.,৮২৭

[২২৪] পঞ্চ.,পৃ.৩৭২

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রকীর্ণ ব্যবহারবিধি ও আখ্যানসাহিত্যে প্রতিফলিত অপরাধ প্রবণতা

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রকীর্ণ ব্যবহারবিধি ও আখ্যানসাহিত্যে প্রতিফলিত অপরাধ প্রবণতা

প্র-পূর্বক কৃধাতুর ক্তপ্রত্যয় করে প্রকীর্ণশব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। অভিধানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে – বিক্ষিপ্ত, অসম্বদ্ধ, মিশ্রিত, নানাজাতীয় ইত্যাদি।[১] ধর্মসূত্রকার বিষ্ণু বলেছেন 'যদনুক্তং তৎপ্রকীর্ণকম্' । অর্থাৎ পরস্পর অসম্বদ্ধ বিষয়সমূহ যেখানে উক্ত হয় তাকে প্রকীর্ণ বলা হয়। যা পূর্বে বলা হয়নি এমন বিষয়সমূহকে প্রকীর্ণবিভাগে অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করা হয়। *নারদস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*তেও প্রকীর্ণ বিভাগটি দেখা যায়। শাস্ত্রকারগণ নির্দিষ্ট কোনো বিবাদপদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অথচ অপরাধের সমতুল্য, যে গুলি পূর্বে উল্লিখিত হয়নি অথচ উল্লেখ করা আবশ্যক এমন ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও তার দণ্ডবিধি আলোচ্য বিভাগটিতে আলোচনা করেছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবহার অধ্যায়ের অন্তিম ভাগে সকল বিবাদপদ আলোচনা করবার পর প্রকীর্ণ বিভাগটির আলোচনা করেছেন। প্রকীর্ণ বিভাগটিতে তিনি একাধিক অপরাধের দণ্ডবিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য বিভাগটিতে তিনি মৃতব্যক্তির অঙ্গস্থিত বস্ত্র বিক্রয়কারী, গুরুকে তাড়নাকারীকে উত্তম সাহস দণ্ড দিতে বলেছেন। রাজার আজ্ঞা অমান্যকারী, রাজার নিন্দাকারী তথা গুপ্ত কথার প্রকাশকারী ব্যক্তিদের রাজ্য থেকে নিষ্কাশিত করতে বলেছেন।[২] এছাড়াও, কারো দুটি চক্ষু নষ্টকারী ব্যক্তি, নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে জীবিকা নির্বাহকারী শূদ্র ব্যক্তি, দন্তযুক্ত-শৃঙ্গযুক্ত পশু থেকে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও রক্ষা করে না এমন পশুস্বামী, নকল সোনা বিক্রয়কারী ও কুৎসিত মাংস বিক্রয়কারী – এই সকল অসাধু ব্যক্তির দণ্ড সম্পর্কেও আলোচ্য প্রকীর্ণ অংশে আলোচনা দেখা যায়। নারদ প্রকীর্ণ অংশটিতে বিভিন্ন প্রকার স্তেয় বা চৌর্যের দণ্ডবিধান করেছেন। এছাড়াও রাজাজ্ঞা অমান্যকারী ব্যক্তি, আপন ধর্ম থেকে স্খলিত ব্যক্তি, ধর্মশাস্ত্র অমান্যকারী ব্যক্তিদের এবং এইরূপ প্রমুখ অপরাধের দণ্ডবিধান করেছেন। মানুষের ক্রিয়ার

---

[১] হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়,ব.শ.কো.(২য় খণ্ড),পৃ.১৩১

[২] যাজ্ঞ.,২.৩০২-৩০৩

নানা প্রকার হেতু বিবাদগুলি শতশাখ হয় তাই সকল অপরাধকে নির্দিষ্ট কতগুলি বিবাদপদের আওতাভুক্ত করা সম্ভব নয়।

আখ্যান-উপাখ্যানগুলিকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সেখানে একাধিক এমন আচরণের উল্লেখ রয়েছে যেগুলি ন্যায়বিরুদ্ধ, অপরাধের সমতুল্য। এছাড়াও এই সকল আখ্যান-উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে রচয়িতাগণ এমন কিছু নিষেধ, কিছু মানদণ্ড স্থির করেছেন যার উল্লঙ্ঘনকে তারা অপরাধ বলে বিবেচনা করেছেন এবং এই সকল নিষেধের উল্লঙ্ঘনকারীকে ইহলোকে অথবা পরলোকে উপযুক্ত দণ্ড পেতে হবে এমন নিশ্চয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন। আখ্যানগুলিতে কাহিনির প্রবহমান স্রোতের কারণে সকল অপরাধের বিচার কিংবা তার সম্ভাব্য শাস্তির সম্পর্কে জানা না গেলেও, এই সকল আখ্যানগুলি অপরাধের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্ত বহন করছে। ঘৃণ্য অথচ প্রচলিত সেই সকল অপরাধের উল্লেখ ও তার সাজা সম্পর্কেও আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আখ্যানগুলিতে ছড়িয়ে থাকা ভিন্ন ভিন্ন ধরণের এই সকল অপরাধগুলি মিশ্র বা প্রকীর্ণ বলে উল্লিখিত হয়েছে।

১.অতিথি সম্বন্ধিয় অপরাধ

আমাদের সংস্কৃতিতে অতিথিকে দেবতার স্থান দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রে অতিথির অনাদর নিষেধ করা হয়েছে। কেবল তাই নয় অতিথি সৎকার কীভাবে করা হবে ধর্মসূত্রগুলিতে তার সুনির্দিষ্টিত মার্গ দর্শিত হয়েছে, যেমন *আপস্তম্বধর্মসূত্রে* অতিথিসৎকার বিষয়ক সুনির্দিষ্ট আলোচনা দেখা যায়। 'নররূপী নারায়ণ' এমন অতিথি সৎকারের উপদেশ আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতেও রয়েছে। অতিথির অনাদর করাকে এক ঘৃণ্য অপরাধ বলেও গণ্য করা হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রের* 'মৎকুণ-মন্দবিসর্পিণ্যোঃ কথা'য় অতিথি যে বর্ণেরই হোক যত্নপূর্বক অতিথি সৎকার করার কথা বলা হয়েছে। ইহা গৃহস্থের ধর্ম, এই ধর্ম পালন করলে স্বর্গলাভ হয়। অতিথির অনাদর

করলে নরকবাস হয়-এমনটা ধর্মশাস্ত্রকারগণের উক্তি এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] ধর্মপালন না করলে যে অপরাধ হয় তারই শাস্তিস্বরূপ নরকবাস করতে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান স্মরণপূর্বক আলোচ্য আখ্যানে এমন উক্তি করায় অতিথির সমাদর না করা যে পাপ সেক্ষেত্রে স্মৃতিকেই প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আলোচ্য আখ্যানটিতে যেমন যেকোনো বর্ণের ব্যক্তি অতিথিরূপে আসলে তাকে যথোচিত সৎকার করতে বলা হয়েছে এরূপ আরও একাধিক আখ্যানেও একই আদেশ করা হয়েছে। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* ত্রয়োবিংশ উপাখ্যানে বলা হয়েছে, অতিথি যে বর্ণেরই হোক তাকে ভোজন করিয়ে তবেই গৃহস্থ দম্পতির ভোজন করা উচিত। এটি ধর্মশাস্ত্রের বিধান এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] *হিতোপদেশের* মিত্রলাভে একটি শ্লোকের মাধ্যমে অতিথি যে বয়সেরই হোক তাকে গুরুর তুল্য বলা হয়েছে এবং তার অভ্যর্থনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।[৫] অর্থাৎ অতিথি যে বর্ণেরই হোক, যে বয়সেরই হোক তা বিবেচ্য নয় বরং বর্ণ-ধর্ম-বয়সনির্বিশেষে তার অভ্যর্থনা করা উচিত। ইহাই স্মৃতির বিধান, ইহাই ধর্ম। ধর্মাচরণ না করা অপরাধ ও গৃহস্থকে তার শাস্তি অবশ্যই পেতে হয়। অতিথির অবমাননা করা অনুচিত ও পাপজনক। *হিতোপদেশের* মিত্রলাভের তৃতীয় কথায় তার উল্লেখ রয়েছে। উত্তমবর্ণের ঘরে নীচ বর্ণের অতিথি এলেও তাকে যথোচিত সৎকার করার কথা বলা হয়েছে। কারণ অতিথি যার ঘর থেকে ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে যান অতিথির সকল পাপ তাকেই দিয়ে যান।[৬] অতিথি অভ্যর্থনা সঠিকভাবে না করলে কিংবা অতিথির অনাদর করলে কেবল পরলোকে নরকযন্ত্রণা ভোগরূপ শাস্তি পেতে হয় এমন নয় সমাজেও নিন্দিত হতে হত। সমাজে তার সম্মানহানি ঘটতো। এমন ব্যক্তির গৃহে পুনরায় কেউ আসতো না। *শুকসপ্ততিকথার* অষ্টত্রিংশত্তমকথায় এই রূপ আশঙ্কার কথাই উল্লিখিত হয়েছে। অতিথি অভ্যর্থনা করলে এমন দুর্দিনের সম্মুখীন হতে হবে, সেই কারণে বণিক অতিথি ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করেছেন এবং তার স্ত্রী অতিথিকে রুষ্ট করেছে বলে তাকেও তিরস্কার

---

[৩] সুধাকর মালবীয়,পঞ্চ.,পৃ.১৮০

[৪] সিংহাসন.,পৃ.৭০

[৫] বালো বা যদি বা বৃদ্ধো যুবা বা গৃহমাগতঃ।
তস্য পূজা বিধিতব্যা সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।। সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী,হিতো.,পৃ.১০০

[৬] তদেব,পৃ.৭০

করেছেন।[৭] অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকে শাস্তিভোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী গৃহস্থ অতিথি সৎকার করবেন। গৃহস্থ তা না করলে অধর্মাচারণ করা হবে এবং তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। তাই এমন অপরাধ ও তার ফলে জাত পাপ যাতে তাকে স্পর্শ না করে তাই গৃহস্থ যথাসামর্থ্য বর্ণ-বয়স নির্বিশেষে অতিথি সমাদর করবেন। যদি তার দ্বারা অতিথির নিধন হয় তবে যে পাপের কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই এমন ব্রহ্মহত্যারূপ পাপজনিত কষ্ট তাকে ভোগ করতে হয়। *বেতালপঞ্চবিংশতি*র একটি উপাখ্যানে এমন বিধান দৃষ্ট হয়।[৮] আলোচ্য গ্রন্থটির ত্রয়োদশ উপাখ্যানে একজন গৃহস্থ ব্রাহ্মণের গৃহে এক বিপ্র অতিথি রূপে আগমন করেছেন। ক্ষুধার্ত ঐ অতিথি গৃহস্থের গৃহে বিষমিশ্রিত দুগ্ধ পান করায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অতিথির এই আকস্মিক মৃত্যুতে গৃহস্থ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং অতিথি নিধনরূপ অপরাধ কর্মের জন্য তার স্ত্রীকে দায়ী করে শাস্তি স্বরূপ তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করেন। কারণ খাদ্যদ্রব্য তার স্ত্রী প্রদান করেছিল। এক্ষেত্রে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বিচলিত হওয়া ও অতিথির মৃত্যু যার জন্য হয়েছে বিষমিশ্রিত দুগ্ধ প্রদানকারী স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ শাস্তিপ্রদান দ্বারা - অতিথির সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণস্থান ছিল তা বোঝা যায়। কারণ ব্রাহ্মণ যথোচিত অতিথি সৎকার না করতে পারায় পাপের ভয়ে ভীত হয়েছেন এবং অতিথির ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তি পরম আপনজন হওয়া সত্ত্বেও তাকে শাস্তিদান করেছেন। যদিও এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণী অজ্ঞতাবশতই বিষমিশ্রিত দুগ্ধ প্রদান করেছিল তাই ব্রাহ্মণ তাকে ত্যাগ করে অনুচিত কার্যই করেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণকর্তৃক ব্রাহ্মণীকে এই দণ্ডপ্রদান একথাই প্রমাণ করে যে অতিথির ক্ষতি যে কোনো ব্যক্তি করলেই সে দণ্ডার্হ। *পঞ্চতন্ত্রে*র মিত্রভেদের 'উষ্ট্র-কাক-সিংহ-দ্বীপ ও শৃগালের কথা'য় অতিথি হত্যাকারী ব্যক্তির ব্রহ্মহত্যার ন্যায় পাপ হয় এইরূপ বলা হয়েছে।[৯] *পঞ্চতন্ত্রে*র মিত্রসম্প্রাপ্তিতে 'হিরণ্যকতাম্রচূডকথা'য় যে ব্যক্তির অতিথির প্রতি যথোচিত আচরণ করেন না তার গৃহে কোনো ব্যক্তি গমন করলে সে নির্বুদ্ধিতা প্রাপ্ত

[৭] রমাকান্ত ত্রিপাঠী, শুক.,পৃ.১৬৫

[৮] দামোদর ঝা,বেতাল.,পৃ.১১১

[৯] পঞ্চ.,পৃ.২০১

হয় এইরূপ উক্তি দেখা যায়।[১০] অর্থাৎ অতিথি অবমাননাকারীর যে পাপ হয় তার জন্য তাকে যেমন পরলোকে শাস্তি পেতে হয় তেমনি জীবদ্দাশাতেও তার সমাজে গুরুত্বহানি ঘটে এবং তার সামাজিক অবস্থানের অবক্ষয় ঘটে।

২.আখ্যানের আলোকে বিশ্বাসঘাতকতা ও মিত্রদ্রোহ

বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যানে এমন অনেক ঘটনা চোখে পড়ে যেখানে বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি অপরকে ঠকিয়েছে। কোনো ব্যক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করাকে আখ্যান-উপাখ্যানে কেবল নিন্দা করা হয়েছে এমন নয় এটিকে একটি অপরাধ বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* প্রারম্ভিক অংশে বিশ্বাসঘাতকতাকারী ও মিত্রদ্রোহকারীর শাস্তি প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে। এমন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে শাস্তিস্বরূপ মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত নরকবাস করতে হয়।[১১] এখানে বিশ্বাসভঙ্গকারী ব্যক্তির পরলৌকিক শাস্তির কথা বলা হলেও *দশকুমারচরিতে*র অর্থপালচরিত থেকে এমন ব্যক্তির দণ্ডস্বরূপ মৃত্যদণ্ড হতে পারে তা জানা যায়। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির দৈবরোষে মৃত্যুদণ্ড হয় এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[১২] *পঞ্চতন্ত্রে*র মিত্রভেদে মনুর বচনকে স্মরণ করে বলা হয়েছে, কারো বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যদি কোনো ব্যক্তির প্রাণবিয়োগ ঘটে তবে তার হত্যার দায় ঐ বিশ্বাসভঙ্গকারীর হয়।[১৩] অর্থাৎ বিশ্বাসভঙ্গকারীকে হত্যাকারী অপেক্ষা অধিক দোষীরূপে গণ্য করা হয়েছে। যে কোনো সম্পর্কের ভিত্তি হল বিশ্বাস। বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করেই পরস্পর অচেনা দুটি ব্যক্তি মিত্রতার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। তাই মিত্রদ্রোহতাকে বিশ্বাসঘাতকতাই বলা সমীচীন। এছাড়াও যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে কারো আশ্রয় গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত হয় তার ক্ষতি করাও অপরাধ। *পঞ্চতন্ত্রে*র মিত্রভেদের 'সিংহ-শৃগালকথা'য় এইকারণেই সিংহ

---

[১০] পঞ্চ.,পৃ.৩৪৬

[১১] মলয়েন্দ্রকুমার সেন, সিংহাসন.,পৃ.১৯

[১২] তারাচরণ ভট্টাচার্য,দশ.,পৃ.২৭৫-২৭৬

[১৩] পঞ্চ.,পৃ.১৯৩

ক্ষুধায় প্রবল আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও, প্রকৃতির নিয়মে তার ভক্ষ্যস্থানীয় চতুরকের কোনো ক্ষতি করতে চায়নি। কারণ চতুরক তার শরণাগত ছিল ও তার সাথে সিংহের মৈত্রীভাব ছিল।[১৪] আলোচ্য আখ্যানটির কাহিনি বর্ণনাবসরে প্রাণপাত হলেও মিত্ররক্ষা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মিত্রহত্যাকারী কিংবা মিত্রের বিশ্বাসভঙ্গকারী ব্যক্তির যে পাপ হয় তা ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষা অধিক। কারণ ব্রহ্মহত্যা করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপস্খলন ঘটলেও, মিত্রদ্রোহকারীর পাপ কোনো প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করলেও তার স্খলন ঘটে না।[১৫] জীবদ্দশায় হয়তো কোনো ব্যক্তি বিচারালয়ে কারো দ্বারা অভিযুক্ত না হওয়ার কারণে বিশ্বাসভঙ্গকারী, মিত্রদ্রোহী হয়েও দণ্ডিত না হতে পারেন কিন্তু তার এমন অপরাধাচরণের জন্য তার পাপের শাস্তি তাকে মরণোত্তরকালে পেতে হয়।

৩.পিতা-মাতা ও পরিবারের প্রতি কর্তব্য ও উপেক্ষাজনিত অপরাধ

আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে কোনো ব্যক্তির তার পরিবার-পরিজনের প্রতি দায়বদ্ধতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিবারকে সকল কিছুর থেকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পরিবারের সকল সদস্যদের ভরণ-পোষণ তথা নিরাপত্তা প্রদান করাকে গৃহস্বামীর ধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি পরিবারের প্রতি তার এই ধর্মপালন করেন না কিংবা কর্তব্যে গাফিলতি করেন তাকে সমাজে নিন্দিত হতে হতো। আখ্যানে শত অন্যায় করেও পরিবার প্রতিপালন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* একাদশ উপাখ্যানে শত কুকার্য করেও বৃদ্ধ-পিতা-মাতা, সাধ্বী স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে পালন করার কথা বলা হয়েছে। এই বিধান স্বয়ং মনু করেছেন এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬] যিনি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পরিবারের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন না সেই ব্যক্তি অত্যন্ত নিকৃষ্ট। এমন ব্যক্তি সকলের দ্বারাই পরিত্যক্ত হন। *পুরুষপরীক্ষার*

[১৪] তদেব,পৃ.২৫৬

[১৫] তদেব,পৃ.১৯৩

[১৬] সিংহাসন.,পৃ.৪২

'কৃপণকথা'য় এমন এক কৃপণের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, যার কাছে প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাবে খাদ্যাভাবে তার স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যু ঘটেছে। পরিবারের মৃত্যুর কারণস্বরূপ এমন ব্যক্তিকে হত্যা করাকে আলোচ্য আখ্যানে পূর্ণকর্ম বলা হয়েছে এবং পরিশেষে তার মৃত্যুও হয়েছে।[১৭] পরিবারের রক্ষার্থে অর্থ ব্যয় করে না তাকে ঐ কৃপণ ব্যক্তির ন্যায় সমস্ত নগরবাসীদের দ্বারা তিরস্কৃত হতে হয়। তার অবস্থা এত শোচনীয় হয় যে মৃত্যুও তাকে স্পর্শ করে না, সকলের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে জীবদ্দশাতেই তাকে তার অপরাধের দণ্ডস্বরূপ নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আলোচ্য আখ্যানে এমন পাপী, অধর্মী ব্যক্তির হত্যাকে কেবল অনুমোদন করা হয়েছে এমন নয়, এমন কর্ম করলে পুণ্যলাভ হয় এমনও বলা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে পরিবারের দায়িত্ব উল্লঙ্ঘণ কোনো অপরাধের থেকে কম কিছু নয়, বরং ইহা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ বলেই বিবেচিত হয়েছে। *কথাসরিৎসাগরের* কথাপীঠ লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গের 'পাটলীপুত্রনগরের উৎপত্তির কাহিনি'তে তিন জন ব্রাহ্মণের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে যারা আপন আত্মীয়-পরিজনের প্রতি যত্নবান হননা, বিপদের দিনে যাদের কথা বিস্মৃত হন তাদের নৃশংস বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮]

পরিবারে সকলের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকলেও, পিতা-মাতার প্রতি ব্যক্তির দায়বদ্ধতা সবথেকে বেশি। তাই-তো এই সকল গল্প কাহিনিগুলিতে পিতা-মাতার প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সেবা করে না সে পাষণ্ড, পাপী। কারণ পিতা-মাতাই মানবরূপী দেবতা। *শুকসপ্ততিকথার* প্রথমকথায় বলা হয়েছে যে ব্যক্তি কারণে তার মাতা-পিতার অশ্রুপাত হয় সেই সন্তানের পতন অবশ্যম্ভাবী।[১৯] মাতা-পিতার প্রতি অন্যায় আচরণ করার জন্য সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই দণ্ড পেতে হয়। পূজনীয় মাতা-পিতাকে যথার্থ মান্যতা না দেওয়ার জন্য, সম্মান না করার জন্য ব্যক্তিকে সমাজে নিন্দিত হতে হয় এছাড়াও পরলোকে তার স্বর্গলাভ হয় না।[২০] *বেতালপঞ্চবিংশতির* একবিংশ উপাখ্যানে দেবতা ও গুরুজনদের যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা করে না

---

[১৭] ঝর্ণা ভট্টাচার্য,পুরুষ.,পৃ.২১

[১৮] হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস,কথা.,পৃ.৩২

[১৯] শুক.,পৃ.৩

[২০] শুক.,পৃ.৬

তাকে পাষণ্ড বলা হয়েছে। এমন ব্যক্তির সাথে বাক্যালাপও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমন ব্যক্তির জন্য মৃত্যুদণ্ডকেই শাস্তিরূপে ধার্য করা হয়েছে।[২১]

অর্থাৎ বিভিন্ন আখ্যানগুলি থেকে যে চিত্র আমরা পাই সেখানে পরিবারের দায়িত্ব উল্লঙ্ঘণকারী, পিতা-মাতার অবমাননাকারী সমাজের চোখে অপরাধী এবং এমন অপরাধের জন্য তাকে সর্বত্রই শাস্তিভোগ করতে হয়।

পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি স্নেহপ্রবণ হবেন ইহাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। পিতা-মাতাই সন্তানকে জগতের সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু কিছু আখ্যানে এমন কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেখানে পিতা-মাতাকেই সন্তানের প্রতি অন্যায় আচরণ করতে দেখা যায়। *দশকুমারচরিতে*র অর্থপালচরিতে একটি সদ্যোজাত শিশুর প্রতি অন্যায় হতে দেখা যায়। কামপাল ও কান্তিমতীর সন্তানকে সকলের থেকে গোপন করার জন্য রাতের অন্ধকারে শ্মশানে ফেলে রেখে আসা হয়েছে। এমন অন্যায় আচরণের কথা কামপাল নিজে স্বীকার করেছে এবং তাকে অনুশোচনাও করতে দেখা যায়।[২২] সদ্যোজাত একটি সন্তানকে শ্মশানে ফেলে রেখে আসার অর্থ হল শিশুটিকে মৃত্যুমুখে ফেলে রাখা। এক্ষেত্রে সন্তানটির পিতা-মাতা এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিল, তাদের সম্মতিতেই দাসী এমন কার্য করেছে। তাই তারাই অপরাধী। কারণ সন্তানকে রক্ষা পিতা-মাতারই কর্তব্য। আলোচ্য আখ্যানটিতে কামপালকে রাজা মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন তবে তা কন্যার স্বার্থে সংসর্গের জন্য নাকি শিশুপুত্রকে শ্মশানে ফেলে দিয়েছে তা স্পষ্ট নয়। *পঞ্চতন্ত্রে*র অপরীক্ষিতকারকের 'অন্ধক-কুব্জক-ত্রিস্তনীকথা'য় কন্যা বিকলাঙ্গ যুক্ত হওয়ায় রাজা তাকে ত্যাগ করতে চেয়েছেন। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে এক অন্ধের সাথে বিবাহ দিয়ে তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করেছেন।[২৩] রাজকন্যা অধিক অঙ্গবিশিষ্ট হওয়ায় তাকে বিকলাঙ্গ বলা হয়েছে। স্বাভাবিক না হওয়ায় তাকে অনেকবেশী নিরাপত্তা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু রাজা তার পিতা হয়েও যে কোনো

---

[২১] বেতাল.,পৃ.৯৮

[২২] দশ.,পৃ.২৬২

[২৩] পঞ্চ.,পৃ.৭৯০

ভাবে তাকে ত্যাগ করতে চেয়েছেন। এমনকি বিবাহ দেওয়ার সময়ও তিনি অন্ধ, বধির, চণ্ডাল যে কোনো ব্যক্তির সাথে কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছেন। পরে একজন অন্ধকে প্রচুর অর্থ প্রদান করে তার সাথে কন্যার বিবাহ দিয়ে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে অজানা কোনো দেশে প্রেরণ করেছেন। পিতার দায়িত্ব কন্যাকে নিরাপত্তা দেওয়া। তাকে লালন-পালন করা ও সৎপাত্রে পাত্রস্থ করা। রাজা এগুলির কোনোটাই করেননি। তিনি কন্যার প্রতি সামান্য স্নেহশীল হলেও এমন অমানবিক আচরণ করতে পারতেন না। তাই তিনি পিতার কোনো কর্তব্যই পালন করেননি, তাই তিনি দোষী। সন্তানকে হত্যা করা কিংবা তার ক্ষতির করা অপরাধ তা *কথাসরিৎসাগরের* লাবাণক লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গের 'সুন্দরকের কাহিনি'তে জানা যায়। আখ্যানটিতে নৃপতি আদিত্যপ্রভ ও কুবলয়াবতী তাদের পুত্র হত্যার কারণ হয়েছেন বলে তারা অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করেছেন।[২৪] এক্ষেত্রে রাজা ও রাণী নিজেদের অজান্তেই পুত্রহত্যার কারণ হয়েছেন তবুও নিজেদের অপরাধী বলে মনে করেছেন। অনুতাপানলে দগ্ধ হলেও নিজেদের এমন পাপ কর্মের জন্য বার বার বিলাপ করেছেন। শেষে নিজেরাই নিজেদের শাস্তির পথ বেছে নিয়েছেন। অগ্নিপ্রবেশ করে পাপস্খালনে ব্রতী হয়েছেন। পুত্র বিয়োগে কাতর রাজ দম্পতীর এই আচরণই প্রমাণ করে যে সন্তান হত্যা এক মহাপাপ ও অপরাধ।

এছাড়াও আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত আখ্যানে পাওয়া যায় যেখানে সন্তানকে পিতা-মাতার দ্বারা অত্যাচারিত হতে দেখা যায়। *দশকুমারচরিতের* কুমারোৎপত্তিতে সৎ-মা-কর্তৃক শিশুপুত্রকে নদীর জলে ফেলে দেওয়ার ন্যায় ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে।[২৫] আবার *কথাসরিৎসাগরের* কথামুখ লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গের 'চতুর বিকৃতাঙ্গ বালকের কাহিনি'তে দেখা যায় একজন সৎ-মা সুস্থ ছেলেকে দীর্ঘদিন যথোচিত আহার প্রদান না করে তার প্রতি আরও নানাবিধ অন্যায় আচরণ করে বিকলাঙ্গগ্রস্থ করে তুলেছেন।[২৬]

---

[২৪] কথা.,পৃ.১৮৮

[২৫] দশ.,পৃ.৩৬

[২৬] কথা.,পৃ.১২৪

শিশুমন কোমল, তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার তাদের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে তা যদি পিতা-মাতার থেকে প্রাপ্ত আঘাত অনেক ক্ষেত্রেই শিশুটিকে অপরাধপ্রবণও করে তোলে। আলোচ্য আখ্যানটি তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ। দীর্ঘদিন যাবৎ সৎ মায়ের অত্যাচারে শিশুটি কিশোরাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠেছে এবং তার মাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সে নানাবিধ অন্যায় আচরণও লিপ্ত হয়েছে। একজন কিশোরের কাছ থেকে যা কখনই কাম্য নয়। তাই সন্তানের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের জন্য পিতা-মাতার তার প্রতি স্নেহশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

৪.বেশ্যাদের অপরাধপ্রবণতা

বিভিন্ন আখ্যানগ্রন্থগুলির একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে বেশ্যা বৃত্তিধারী গণিকা, তার সহকারী কুট্টনী এদের নানাবিধ অপরাধমূলক কার্যকলাপের কথা বর্ণিত হয়েছে। আখ্যানগুলি থেকে গণিকা কিংবা এদের সাথে সংযুক্ত ব্যক্তি যেমন কুট্টনী, গণিকার মাতা, গণিকালয়ের পাহারাদার এদের অপরাধ প্রবণতা ও চারিত্রিক দোষের বিষয়ে জানা যায়। *দশকুমারচরিতে*র বেশ্যা বৃত্তির সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। অপহারবর্মাচরিতে গণিকার মাধ্যমে গণিকার মাতার অন্যায়ভাবে গণিকার প্রতি আকৃষ্ট জনের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া এদের অন্যান্য অন্যায্য আচরণগুলি হল- পরাধীন কোনো লোকের সঙ্গে কন্যার গান্ধর্বমতে মিলন হলেও অভিভাবকের কাছ থেকে জোরপূর্বক টাকা আদায় করা, আকৃষ্ট জন অর্থ না দিলে তাকে বিচারালয়ে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা, উপনায়কের ধন উপহাররূপে গ্রহণ করার পরও তার অবিশিষ্ট সম্পদ নানা উপায়ে অপহরণ করা, নির্ধন ব্যক্তিকে কটূ কথা বলে লোকসমাজে তাকে ছোট করা, মিথ্যা অভিযোগ করা ইত্যাদি। এই সকল অন্যায় আচরণ করে গণিকার মাতা অর্থ আদায় করেন।[২৭] *দশকুমারচরিতে* উল্লিখিত এই সকল অপরাধের দৃষ্টান্ত অন্যান্য আখ্যানগুলিতেও মেলে। যা এদের অপরাধ প্রবণতার বিষয়টি আর নিশ্চিত করে। *শুকসপ্ততিকথা*র সপ্তম কথায় একজন গণিকা ও তার

[২৭] দশ.,পৃ.১৩২-১৩৩

সহকারী কুট্টনী ছলনা করে গণিকালয়ে আগত একজন ব্রাহ্মণের দ্রব্যাদি অপহরণ করেছে। ব্রাহ্মণ গণিকার প্রাপ্য অর্থ প্রদান করা সত্ত্বেও রাজার কাছে তা অস্বীকার করে, তাকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে।[২৮] প্রাপ্য অর্থ পেয়েও অধিক অর্থের লোভে ব্যক্তির অর্থ অপহরণ করা, তার বিশ্বাস অর্জন করে তার অর্থের সন্ধান জেনে ছলনা করে সর্বস্ব আত্মসাৎ করা- এই সকল কর্মে এরা সিদ্ধ হস্ত ছিল। বিচারালয়ে গিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করতে এরা ভীত হতো না। তাদের এই সকল স্বভাবদোষের বিষয়টি সমাজেও পরিচিত ছিল। *দশকুমারচরিতে*র অপহারবর্মাচরিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা গণিকা কামমঞ্জরী ও তার মাতাকে বিচারসভায় ডেকে বিচারাধীন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও, তারা সকল বিষয় জানা সত্ত্বেও রাজাকে সত্য গোপন করেছে। রাজা তাদের চরিত্রসম্পর্কে অবগত থাকায় তিনি কামমঞ্জরী ও তার মাতাকে প্রভূত তিরস্কার করে এবং সত্যগোপন করার অপরাধে তাদের নাক-কান কেটে দেবেন- এরূপ ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে সত্য উদ্ঘাটন করেছেন।[২৯] বেশ্যাবৃত্তিধারী গণিকা ও তার অনুগামীগণ ইচ্ছাকৃতভাবেই গণিকালয়ে আগত ব্যক্তিদের সাথে কপটাচরণ করতো, ছলনাচরণ করতো। *শুকসপ্ততিকথা*র পঞ্চচত্বারিংশত কথায় কুট্টনী কপট ব্যবহার করে ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দেওয়ার স্বীকারোক্তি করেছে।[৩০] অর্থের প্রলুব্ধতা এদের চরিত্রের অন্যতম দোষ। কেবল গণিকালয়ে আগত ব্যক্তির সাথেই এরা কপটাচরণ করে অর্থ আদায় করতো কিংবা অপহরণ করতো এমন নয়, অর্থের বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, সত্য গোপন করাও এদের স্বভাবদোষ বলে দৃষ্ট হয়। *হিতোপদেশে*র মিত্রলাভের চতুর্থ কথায় এক কুট্টনীকে অর্থগ্রহণ করে শীলাবতীর অন্যায় আচরণ গোপন করতে দেখা যায়।[৩১] *শুকসপ্ততিকথা*র ত্রয়োবিংশতি সংখ্যক কথায় কুট্টনী ও বেশ্যার অপরাধের কথা বর্ণিত হয়েছে।[৩২]

---

[২৮] শুক.,পৃ.৫৫

[২৯] দশ.,পৃ.১৮১-১৮২

[৩০] শুক.,পৃ.১৯০

[৩১] হিতো.,পৃ.১১৩

[৩২] শুক.,পৃ.১৩২

এদের এই সকল কর্মের জন্য এরা যেমন বিচারালয়ে দণ্ডিত হত তেমনি নগরবাসীদের দ্বারাও নিন্দিত ও দণ্ডিত হত। অপরকে বঞ্চনা করার জন্য এদের কীরূপ শাস্তি দেওয়া হত তার একটি চিত্র *কথাসরিৎসাগরেও* পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থটির কথামুখ লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গের 'রূপনিকারকাহিনি'তে বঞ্চনাকারী কুট্টনীকে সকল নগরবাসীর সামনে কালিমা লিপ্ত করে বিকৃতবেশী রূপে সকলের সামনে লজ্জিত করা হয়েছে। বঞ্চনাকারী, শঠ ঐ কুট্টনীকে এরূপ শাস্তি দেওয়ার জন্য রাজা লৌহজঙ্ঘকে পটবন্ধদ্বারা পুরস্কৃত করেছেন।[৩৩] কেবল তাই নয় বিচারালয়ে কেউ এদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে অভিযোগ করলেও এরা রাজার দ্বারা যথাবিধি দণ্ডে দণ্ডিত হত। *হিতোপদেশের* সুহৃদ্ভেদে পঞ্চম কথায় একজন ব্রাহ্মণ তার সকল রত্ন কুট্টনী কর্তৃক ছলনা পূর্বক অপহৃত হয়েছে- রাজার কাছে এমন অভিযোগ করেছেন। প্রতরণার অভিযোগে রাজা তাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।[৩৪] অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তিধারী গণিকা ও তার সহকারীগণ তাদের অর্থলোভ, বঞ্চনা, শঠতার কারণেই সমাজে নিন্দিত হত এবং বিচারালয়ে তাদের এই অপরাধ প্রবণতার জন্য উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হত।

৫.আত্মহত্যা-মহাপাপ

কোনো কারণে অধিক বিচলিত হয়ে কিংবা নিতান্ত ব্যথিত হয়েও আত্মহনন করা ঠিক নয়। নিজেকে হত্যা করা , নিজের ক্ষতি করা যুক্তিযুক্ত কর্ম নয়। আমরা বয়ঃজ্যেষ্ঠদের মুখে প্রায়শই শুনে থাকি 'আত্মহত্যা মহাপাপ' । তাদের এই নিষেধ বাণী নিছক কথার-কথা নয়, শাস্ত্রের কথার উপরে ভিত্তি করেই এই প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ চিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বরূপ আখ্যান-উপাখ্যান গ্রন্থেও এমন নিষেধ থাকবে- সেটাই স্বাভাবিক।

দশকুমারচরিতের অপহারবর্মাচরিতে দরিদ্রতায় ক্লিষ্ট ধনমিত্র নিজেকে হত্যা করতে উদ্যত হলে একজন সন্ন্যাসী তাকে বিরত করেছেন। আত্মহত্যার ন্যায় মহাপাপ আর নেই – তাকে

---

[৩৩] কথা.,পৃ.১০৮

[৩৪] হিতো.,পৃ.৭৮

এমন উপদেশ দিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের উপদেশ দিয়েছেন।[৩৫] বস্তুতঃ পক্ষে অর্থোপার্জনের বহু পথ আছে কিন্তু প্রাণ একবার চলে গেলে তা ফিরে পাওয়ার আর কোনো পথ নেই। তাই এমন অপকর্ম কখনই উচিত নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রদত্ত এই প্রাণ, তাই সেই প্রাণসংহার করার অধিকার কেবল ঈশ্বরেরই আছে। *কথাসরিৎসাগরের* মদনমঞ্জুকা লম্বকের সপ্তম তরঙ্গের 'রাজা প্রসেনজিৎ ও ধনবঞ্চিত দ্বিজের কাহিনি'তেও আত্মহত্যার নিষেধ করা হয়েছে। আলোচ্য আখ্যানটিতে একজন দ্বিজের সকল ধনরাশি অপহৃত হয়ে যাওয়ায় তার কাছে সমস্ত জগৎ শূন্য প্রতীত হওয়ায় সে অনাহারে প্রাণত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজা এমন সংবাদ পেয়ে তাকে বিরত করেছেন।[৩৬] দ্বিজের আত্মহত্যার খবর পেয়ে স্বয়ং রাজা তার ধন অন্বেষণ করতে তৎপর হয়েছেন এবং যে কোনো মূল্যে তাকে আত্মহননের পথ থেকে বিরত করেছেন। রাজা বিচক্ষণ, জ্ঞানী- আত্মহত্যা গুরুতর পাপ শাস্ত্রের এই বিধান সম্পর্কে তিনি অবগত থাকবেন ইহাই স্বাভাবিক তাই তিনি দ্বিজকে এমন অপকর্ম থেকে বিরত করেছেন। নিজের রাজ্যে এমন পাপকর্ম ঘটতে বাধা দিয়েছেন। দ্বিজের অর্থ না পাওয়া গেলে তিনি রাজকোষ থেকে অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু ঐ দ্বিজকে কোনো ভাবেই আত্মহত্যা করতে দেবেন না এমন সংকল্প করেছেন। তার রাজ্যে এমন পাপকর্ম ঘটলে রাজ্যের ক্ষতির সম্ভাবনা হতে পারে কিংবা ঐ পাপ তাকেও স্পর্শ করতে পারে কারণ তিনি সকলের রক্ষাকর্তা। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে সে মহাপাপ পঙ্কে নিমগ্ন হয় কেবল তাই-ই নয় যার কারণে কোনো ব্যক্তি আত্মহননের পথ বেছে নেয় তারও শাস্তি প্রাপ্য। কারো মৃত্যুর কারণস্বরূপ ঐ ব্যক্তিও দণ্ডার্হ। কারণ সেক্ষেত্রে যিনি আত্মহত্যা করেছেন তিনি স্বেচ্ছায় এমন পথ বেছে নিয়েছেন এমন নয়, নিতান্ত বাধ্য হয়েই নিজেকে হত্যা করেছে। *কথাসরিৎসাগরের* মদনমঞ্জুকা লম্বকের অষ্টমতরঙ্গের 'নৃপতি ইন্দ্রদত্তের কাহিনি'তে রাজা পরস্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বলপ্রয়োগ করে তাকে স্পর্শ করতে উদ্যত হলে ঐ স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন। কিছু দিন পর এই পাপের কারণে দৈবযোগে রাজার মৃত্যু হয়েছে।[৩৭] আত্মহত্যার পূর্বেও ঐ স্ত্রী রাজাকে

---

[৩৫] দশ.,পৃ.১৩৮

[৩৬] কথা.,পৃ.১৬৩

[৩৭] কথা.,পৃ.১৬৯

বিরত হওয়ার কথা বলেছিলেন এবং নৃপতির কারণে সে আত্মহত্যা করলে রাজার লোকাপবাদ হবে ও পাপ হবে এমন কথাও তাকে বলতে শোনা যায়। কারো আত্মহত্যার জন্য যে দায়ী হন সে ব্যক্তি জনমানসে দুষ্ট বলে বিবেচিত হয়। বিচারালয়ে তার শাস্তি না হলেও বিধাতার বিচারে সে শাস্তি ভোগ করে।

৬.সাধু-সজ্জনদের দুরাচার

যারা সংসার জীবনের সকল মোহ মায়া ত্যাগ করেছেন, যারা সন্ন্যাস ধর্ম যাপন করেন তারা আমাদের কাছে সম্মাননীয়-পূজনীয়। ষড় রিপুকে তারা জয় করেছেন, জাগতিক বিষয়ে তাদের কোনো বাসনা না থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আখ্যানগুলিতে এমন কিছু কাহিনির দেখা মেলে যেখানে এই তথাকথিত সজ্জন ব্যক্তিদেরও অন্যায় কার্য করতে দেখা যায়। *কথাসরিৎসাগরের* লাবাণক লম্বকের প্রথম তরঙ্গের 'ভণ্ডসন্ন্যাসীর কথা'য় এমনই এক দুরাচারী সন্ন্যাসীর কথা বর্ণিত হয়েছে। সন্ন্যাসী হয়েও সে শিষ্যের কন্যার প্রতি কামপরবশ হয়ে, শিষ্যকে নানাবিধ ভ্রান্ত উপদেশ দিয়ে ঐ বালিকাকে ভোগ করার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করেছে। পরে তার এই কার্যের জন্য রাজপুত্রের দ্বারা সে দণ্ডিত হয়েছে এবং তার শিষ্যগণের কাছে উপহাসের পাত্র হয়েছেন।[৩৮] এই গ্রন্থেরই কথামুখ লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গের 'রুরুর কাহিনি'তেও একজন ঋষির নিজের অপরাধের স্বীকারোক্তি শোনা যায়। সেই কারণে অভিশপ্ত হয়ে তার অধঃপতন হয়েছে এবং সর্পের জীবন কাটাতে হয়েছে।[৩৯] এই সকল সজ্জন ব্যক্তি সাধারণ মানুষের কাছে পূজনীয়। তাদের চরিত্র-স্বভাব সকলের কাছে অনুকরণীয় ও দৃষ্টান্তস্বরূপ। কারণ তারাই সাধারণ জনগণকে ধর্মের পথ দেখান। তাই তাদের এই সকল দোষ ক্ষমার অযোগ্য। ঋষি অন্যায় করায় দৈব দ্বারা শাপিত হয়েছেন আবার রাজপুত্র কামপরবশ সন্ন্যাসীর নাক-কান ছেদন করে, সকলের কাছে তাকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করে তাকে যোগ্য শাস্তি দিয়েছেন। *পঞ্চতন্ত্রের*

---

[৩৮] কথা.,পৃ.১২৭

[৩৯] কথা.,পৃ.১২৪

অপরীক্ষিতকারকের 'ক্ষপণককথা'য় জৈন ভিক্ষুগণ লোভের বশবর্তী হওয়ায় তাদের করুণ পরিণতি হয়েছে। বিষ্ণুশর্মা একটি শ্লোকের মাধ্যমে ভিক্ষুগণের লোভের নিন্দা ও পরিহাস করেছেন।[৪০] আলোচ্য আখ্যানটিতে জৈনভিক্ষুগণকে তাদের লোভের কারণে অনুশোচনাবিদ্ধ হতে দেখা যায়। লোভের বশবর্তী হয়ে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ায় হাহাকার করে তাদের অনুতাপ করতে হয়েছে। তাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যুও ঘটেছে। *শুকসপ্ততিকথার* পঞ্চবিংশতি কথায় সাধুজনের ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে অন্যায় আচরণে লিপ্ত থাকার একটি কাহিনি উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আখ্যানটিতে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অপর একজন জৈন সন্ন্যাসীর প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েন। জৈন সন্ন্যাসী লোকপ্রসিদ্ধ হওয়ায় তার নিন্দা রটানোর জন্য তার গৃহে একজন বেশ্যাকে প্রেরণ করে তাকে লোকনিন্দায় নিন্দিত করায় প্রয়াসী হয়েছেন। তার চরিত্রকে কলুষিত করার চেষ্টা করেছেন।[৪১] যিনি ষড়রিপু জয় করেছেন এমন ব্যক্তির ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়া নিতান্তই অন্যায়। ঈর্ষার কারণে অপর একজন সন্ন্যাসীর চরিত্রদোষ প্রচারের জন্য এমন ঘৃণ্য আচরণকে অপরাধ বলাই সঙ্গত। *পঞ্চতন্ত্রের* কাকোলূকীয়ম্-এর 'মূষিকাবিবাহ' আখ্যানটিতে মুনিদের স্বরূপ কীরূপ হওয়া উচিত তা ব্যক্ত করা হয়েছে। সাধুপুরুষগণ শত্রু ও মিত্র, পাষাণ ও সোনার মধ্যেও সমান ভাগ দেখান। তাঁর কাছে দেখা-অদেখা, শোনা-নাশোনা সমান, তাদের কোনো প্রকার লোভ এবং কারও প্রতি শত্রুভাব রাখা উচিত নয়। আখ্যানটিতে একজন তপস্বী একপক্ষীকে পাথর দ্বারা আঘাত করায় তার নিন্দা করা হয়েছে। মুনিগণের কখনই কাউকে আঘাত করা উচিত নয়- এমন উপদেশ বাক্যও কথিত হয়েছে।[৪২] তপস্বীগণ যে সকল কারণে অন্যায় আচরণে লিপ্ত হন এখানে সেগুলিরই উল্লেখ করা হয়েছে। লোভবর্জিত হলে, সকলের প্রতি সমানভাবাপন্ন হলে এবং জাগতিক সকল বিষয়ে উদাসীন হলে তবেই তারা কোনো অপরাধে লিপ্ত হবেন না।

---

[৪০] একাকী গৃহসন্ত্যপ্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ।

সোঽপি সংবাজ্যতে লোকে তৃষ্ণয়া পশ্য কৌতুকম্।। পঞ্চ.,পৃ.৭১৪

[৪১] শুক.,পৃ.১৬৬

[৪২] পঞ্চ.,পৃ.১৬৫

৭.রাষ্ট্রদ্রোহ-অপরাধ প্রসঙ্গ

ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা রাষ্ট্রস্বার্থ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের ক্ষতি করাকে সর্বোচ্চ অপরাধ বলা হয়। রাজার আজ্ঞা পালন না করা, রাজ্যবাসীর ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ করা, রাজার কাজে বাধা দেওয়াকে রাষ্ট্রদ্রোহ বলা হয়েছে। আখ্যানে রাষ্ট্রদ্রোহকারীকে শাস্তি দিয়ে দমন করার কথা বলা হয়েছে। *কথাসরিৎসাগরের* মদনমঞ্জুকা লম্বকের প্রথম তরঙ্গের প্রথম আখ্যানটিতে রাজা রাজ্যের ক্ষতি করতে উদ্যত বণিকপুত্রকে নির্বিচারে বধদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।[৪৩] রাজার ক্ষতি করাকেও রাষ্ট্রদ্রোহ বলা হয়েছে। একই অপরাধ সাধারণ ব্যক্তির প্রতি করলে যে শাস্তি পেতে হয়, রাজার প্রতি করলে সেই একই অপরাধে অনেকবেশি দণ্ড পেতে হয়।[৪৪] রাজাকে অবহেলা, রাজাজ্ঞা অগ্রাহ্য করলে তার অপরাধে কঠিন দণ্ড পেতে হয়। *পঞ্চতন্ত্রের* কাকোলূকীয়ম্ এর 'হৈমহংসকথা' আখ্যানটি থেকে এমন কথাই জানা যায়।[৪৫]

৮.একটি সামাজিক অপরাধরূপে দ্যূতাসক্তি

দ্যূতক্রীড়াকে স্মৃতিতে ব্যসনরূপে উল্লেখ করা হলেও আখ্যানে ইহাকে একটি অপরাধরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকায়* দ্যূতক্রীড়াকে চৌর্য অপরাধের সমতুল্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চৌর্য অপরাধে যেমন অপরাধী ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ডরূপ শাস্তি হয় দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিরও দ্যূতক্রীড়ার ফলস্বরূপ প্রাণসংহার ঘটে এবং মৃত্যুর পর নরক গমন হয়।[৪৬] আখ্যানে জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর দ্যূতাসক্ত ব্যক্তির শাস্তির প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হওয়ায়, একথা স্পষ্ট যে আলোচ্য কাহিনির বিচারে দ্যূতক্রীড়া একটি অপরাধ। *শুকসপ্ততিকথায়* দ্যূতক্রীড়াকে অপরাধরূপে

---

[৪৩] কথা.,পৃ.৯০

[৪৪] শুক.,পৃ.২৩২

[৪৫] পঞ্চ.,পৃ.৫১৯

[৪৬] সিংহাসন.,পৃ.৮০

উল্লেখ করা না হলেও এটিকে একটি দুষ্কর্ম বলে গণ্য করা হয়েছে।[৪৭] আখ্যানে প্রাপ্ত চিত্র অনুযায়ী একথা বলা যায় যে, দ্যূতক্রীড়া একটি হীনকর্ম, যা আচরণে দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিকে আমৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তীতেও শাস্তি ভোগ করতে হয়। তবে ইহা চিত্ত বিনোদন অবধি সীমাবদ্ধ থাকলে তা সংগত হবে কি না কিংবা আসক্তি পর্যায়েই তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে- এমন সদুত্তর আখ্যানে মেলে না।

৯.নিরপরাধ স্ত্রীপরিত্যাগ ও অন্যায় আচরণ

সচ্চরিত্রা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার স্বামীর। তা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ কিংবা গৃহ থেকে বহিষ্কার করাকে অন্যায় ও অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। কেবল তাই নয় এই কর্মকে ধর্মের পরিপন্থী বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। *কথাসরিৎসাগরের* লাবাণক লম্বকের প্রথম তরঙ্গের 'উন্মাদিনীর কাহিনি'তে রাজা একজন বণিককে বিনা কারণে পতিব্রতা স্ত্রীকে ত্যাগ করলে ধর্মলোপ ঘটে, এমন উপদেশ দিয়েছেন।[৪৮] এইরূপ একটি আখ্যান *বেতালপঞ্চবিংশতি*তেও দৃষ্ট হয়। গ্রন্থটির সপ্তদশ উপাখ্যানে রাজা বণিক পত্নীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় বণিক তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছেন, যাতে রাজা তাকে গ্রহণ করলে রাজাকে পাপস্পর্শ না করে। আলোচ্য আখ্যানটিতেও রাজা বণিককে পতিব্রতা স্ত্রীকে বিনা কারণে পরিত্যাগ না করার উপদেশ দিয়েছেন। পতিব্রতা স্ত্রীকে ত্যাগ করলে ধর্মহানি ঘটবে তাই বণিককে এমন অন্যায় কর্ম থেকে বিরত করেছেন। তবে, সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা যে কেবল অধর্ম ও পাপাচরণ নয়, দণ্ডনীয় অপরাধও তাও এই আখ্যানটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা বণিককে ধর্মের কথা বলে সতর্ক করার পর, পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীকে বিনা কারণে ত্যাগ করলে বণিককে উপযুক্ত দণ্ড পেতে হবে তাও নিশ্চিত করেছেন।[৪৯] অর্থাৎ সচ্চরিত্রা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলে ব্যক্তির ধর্মনাশ ঘটার কারণে তাকে মৃত্যুপরবর্তী যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় এবং জীবদ্দশাতেও রাজদণ্ডে

---

[৪৭] শুক.,পৃ.২

[৪৮] কথা.,পৃ.১২৯

[৪৯] বেতাল.,পৃ.১৫৬

দণ্ডিত হতে হয়। বিনা দোষে স্ত্রীকে পরিত্যাগকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর হয়- আখ্যানে তা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয়েছে। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* অষ্টাদশ উপাখ্যানে গুরুতর দোষ না করলে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। শাস্ত্রের বচন স্মরণপূর্বক আজ্ঞাপালনকারী, গৃহকর্মে সুদক্ষা, সচ্চারিত্রা স্ত্রীকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করাকে শাস্ত্র বিরোধী বলা হয়েছে। যিনি এমন অন্যায় আচরণ করেন তার অক্ষয় নরকবাস হয়।[৫০] বিনা দোষে স্ত্রীকে পরিত্যাগ যেমন দণ্ডনীয় অপরাধ তেমনি বিনা কারণে স্ত্রীকে আঘাত, প্রহার ইত্যাদিও অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছে। *বেতালপঞ্চবিংশতি* গ্রন্থের ত্রয়োদশ উপাখ্যানে ব্রাহ্মণ বিনা দোষে তার স্ত্রীকে প্রহার করেছে, তিরস্কার করে তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করেছে। নিরপরাধ সহধর্মিণীকে আঘাত ও পরিত্যাগ করার জন্য বেতাল ও রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচারে তাকে দোষী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৫১] গ্রন্থটির আলোচ্য কাহিনিটিতে এমন অপরাধী ব্যক্তির কীরূপ দণ্ড প্রাপ্য তা উল্লিখিত না হলেও, এই গ্রন্থের তৃতীয় উপাখ্যানে বিনা কারণে স্ত্রীকে আঘাতকারী ব্যক্তির শাস্তির প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে। রাজার স্ত্রীকে শস্ত্র দ্বারা আঘাতের অপরাধে স্বামীকে শূল বিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।[৫২]

স্ত্রী সচ্চরিত্রা, পতিব্রতা হলে তাকে ত্যাগ অন্যায় – আখ্যানে যেমন এমন দৃশ্য পাওয়া যায় তেমনি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অধিকারও প্রদত্ত হয়েছে। কিংবা অনিবার্য কারণে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার দৃষ্টান্ত ও তার সমর্থনও দেখা যায়। *শুকসপ্ততিকথার* চতুর্থ কথায় দুঃখদায়িনী, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত এরূপ বলা হয়েছে।[৫৩] *কথাসরিৎসাগরের* নরবাহনদত্তজনন লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গের 'সিংহপরাক্রমের কাহিনি'তে পীড়া প্রদানকারী স্ত্রীকে সিংহপরাক্রম ত্যাগ করেছেন। সদ্ভাব না থাকায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ

---

[৫০] সিংহাসন.,পৃ.৫৭

[৫১] বেতাল.,পৃ.১১২

[৫২] তদেব,পৃ.৩২

[৫৩] শুক.,পৃ.২৮

করলেও তিনি স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেছেন।[৫৪] আলোচ্য আখ্যানটিতে তার এই আচরণকে ন্যায় সঙ্গত বলে সমর্থন করা হয়েছে। অর্থাৎ আখ্যানে কারো প্রতি অন্যায় করতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে তেমনি ব্যক্তিসুখের প্রতিও নজর দেওয়া হয়েছে। দুশ্চরিত্রা স্ত্রী কিংবা যার সাথে সদ্ভাব নেই এমন স্ত্রীর সাথে জীবন-যাপন সুখকর নয়, তাই ব্যক্তিস্বার্থে তাকে ত্যাগ করাকে সঙ্গত বলা হয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেওয়া স্বামীর নৈতিক কর্তব্য – এমনটাই আখ্যানে দৃষ্ট হয়।

[৫৪] কথা.,পৃ.৩২

উপসংহার

উপসংহার

বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অন্যতম অংশ হল আখ্যানসাহিত্য। মানুষ এবং পশু-পক্ষী আদি তীর্যক প্রাণীদের নিয়ে রচিত নানা চিত্তাকর্ষক কাহিনিতে সমৃদ্ধ সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্য। আখ্যানগুলির একটি বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে নানাবিধ ন্যায়-অন্যায়, প্রেম-প্রীতি ও অপরাধের কাহিনি। সেখানে অপরাধীর শাস্তিবিধিও দৃষ্ট হয়। আসলে অপরাধ চিরকালই ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিফলন সাহিত্যে স্থান পায়। আখ্যানগুলিতে পশু-পক্ষীদের পাত্র-পাত্রীরূপে নির্বাচন করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের মাধ্যমে মানুষের আসলে প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভ সমূহকেই প্রকাশ করা হয়েছে। বস্তুতঃ মানুষের ঈপ্সিত লক্ষে যদি কোনো বাঁধা সামনে আসে, তখন তাঁর মনে নানাধরণের অন্তর্দ্বন্দ্ব, অতৃপ্তি, ক্ষোভ, হিংসা-প্রতিহিংসা বা অন্যান্য নেতিবাচক প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সেই অতৃপ্তি চরিতার্থ করতেই অস্বাভাবিক অনৈতিক বা আইন বিরোধী পথে পরিচালিত হয়। জন্ম হয় অপরাধের, এক একজন অপরাধীর।

সংস্কৃত আখ্যানগুলিতে বিভিন্ন বিবাদের দৃষ্টান্ত, বিবাদ নিরসন পদ্ধতি, দণ্ডবিধি, বিচারক ও বিচারকার্যে সহায়তাকারী ব্যক্তিগণের যোগ্যতা, অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রভূত তথ্যাদি পাওয়া যায়। বিচারকরূপে রাজাই ছিলেন প্রধান তবে রাজা কর্তৃক নিযুক্ত প্রাড্বিবাকও বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারতেন। স্মৃতিতে যেমন বিচারে রাজার সহায়করূপে সভাসদগণের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে আখ্যানগুলিতেও বিচারকালে রাজার পাশে সভাসদগণকে অধিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। যারা নানাবিধ পরামর্শ দ্বারা রাজাকে সিদ্ধান্ত নিরূপণে সহায়তা করেছেন। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা* গ্রন্থের একত্রিংশ উপাখ্যানটি রাজা ও সভাসদগণর্কতৃক পরিচালিত সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থার একটি সার্থক প্রতিরূপ। বিচারকের আবশ্যিক গুণাবলীর বিষয়েও আখ্যানে স্পষ্ট নির্দেশিকা দেখা যায়। অর্থাৎ কোন কোন গুণে সমৃদ্ধ হলে কেউ বিচারকের পদাসীন হতে পারেন তা উল্লিখিত হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রের* 'শশকপিঞ্জলকথায়' বিচারককে অবশ্যই ধার্মিক, ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ও বয়ঃবৃদ্ধ হতে হবে এমনটা বলা হয়েছে। বিবাদ নির্ণয়কালে সভায় উপস্থিত সভ্যগণ রাজাকে সঠিক উপদেশ দিয়ে বিচারব্যবস্থাকে সঠিক দিশায় পরিচালিত করবেন। তবে রাজা সকল ক্ষেত্রেই তাদের

মতামত গ্রহণ করতেন এমন নয়। রাজা বিচারকালে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নিলে সভ্যগণ নিষেধ করবেন, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত করবেন- ইহাই তাদের কর্তব্য। তারা যদি রাজাকে বিরত না করেন তবে তাদেরই পাপ হয়।[১]

স্মৃতির এমন বিধানের দ্বারাই বিভিন্ন আখ্যানে সভ্যগণকেও চালিত হতে দেখা যায়। *কথাসরিৎসাগরের* 'অর্থলোভীর কাহিনি'তে সভ্যগণ রাজাকে বার বার সঠিক পরামর্শ দিয়ে বিচারকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকায়* 'শারদানন্দের কাহিনি'তে রাজাকে সভ্যগণ বারং বার সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও রাজা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং নিরপরাধী শারদানন্দকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। নির্দোষ ব্রাহ্মণকে হত্যার দায়ে রাজাকে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ স্পর্শ করবে তাই সভ্যগণ ঐ ব্রাহ্মণকে রক্ষা করেছেন। সভ্যগণ নিজেদের কর্তব্য পালন করে নিজেকে এবং রাজাকে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। রাজার সাথে বিচারসভার সদস্যদেরও বিচারব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ ও সদ্ভাবে পরিচালনা করা কর্তব্য। যদি সভ্যগণ দেখেন যে রাজা ন্যায় পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন তবে তারা রাজাকে প্রিয় কথা না বলে সত্য কথা বলবেন। যদি সভ্য ও রাজা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে নির্বাহ করেন সত্যের অনুসরণ করেন তবে তারা দোষ থেকে মুক্ত হন।

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে, স্মৃতিকারগণ ও বিধি অনুসারে পরিচালিত বিচারব্যবস্থার যে নির্দেশ স্মৃতিতে দিয়েছেন আখ্যানেও তার প্রতিচ্ছবি মেলে। বিচারসভার সদস্যরা সুষ্ঠু বিচারের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। ব্যবহারদর্শন তারা কেবল বিধিসম্মতভাবে করবেন তাই নয় রাগ, দ্বেষ, লোভ বর্জন করে পক্ষপাতশূন্য ভাবে করবেন। বিচারকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ কীরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে কার্যটি সম্পাদন করবেন *পঞ্চতন্ত্রকার* বিষ্ণুশর্মা তা স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন। যদি তারা সত্য পথে চালিত না হয়ে বিচারকে বিপথে চালিত করেন তবে তারা অবশ্যই দণ্ডার্হ হবেন। তাঁর মতে, মান, লোভ, ক্রোধ কিংবা ভয়বশত যদি তারা ন্যায়ের অন্যথা করেন তবে তারা

---

[১] তত্র নিযুক্তানাং যথাবস্থিতার্থকথনেঽপি যদি রাজা অন্যথা করোতি তদসৌ নিবারণীয়ঃ, অন্যথা দোষঃ। মিতা.২.২

নরক গমন করবেন।[২] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়*ও সভ্যগণের উদ্দেশ্য এই একই সাবধান বাণী দেওয়া হয়েছে। তবে সেখানে সভ্যগণের এমন অপরাধের শাস্তি মৃত্যুপরবর্তী দণ্ড নয়, জাগতিক জীবনেই দণ্ড পেতে হবে এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৩] অর্থাৎ স্মৃতিকারগণ ও আখ্যানের রচয়িতাগণ সকলেই বিধিসম্মত সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন একথা স্পষ্ট।

আর্ত ব্যক্তি আপন পীড়ার কথা নিজ মুখে রাজার কাছে জানাবেন। রাজা তা শ্রবণ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তলব করবেন। উভয়ের সম্মুখে তাদের বক্তব্য শ্রবণ করে প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করে তিনি রায় দান করবেন। যার বক্তব্য প্রমাণিত হয় তিনি জয়লাভ করেন অন্য জন পরাজিত হন। এই হল সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থার চিত্র। এই ধাপ গুলি অনুসরণের করেই প্রকৃত দোষী কে তা নির্ধারণ করা হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে চতুষ্পাদ ব্যবহারের দ্বারা সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থার চিত্রটি পরিবেশিত হয়েছে। কেবল আর্ত ব্যক্তির বক্তব্য শুনে অভিযুক্তকে বক্তব্য পেশে সুযোগ না দিয়ে, কিংবা প্রমাণাদি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ পরীক্ষণ না করেই যে বিচার কার্য সম্পাদিত হয় তা আদর্শ বিচারব্যবস্থা নয়। গল্পগুলিতে দণ্ডপ্রণয়ন ব্যবস্থার যে চিত্রটি দেখা যায় সেখানে কিন্তু স্মৃতি বিহিত চতুষ্পাদ ব্যবহারের দ্বারা বিবাদ নিরসনের একাধিক দৃষ্টান্ত মেলে। *কথাসরিৎসাগরের* 'উপকোশার বৃত্তান্ত', *পঞ্চতন্ত্রের* 'লৌহতুলা-বণিকপুত্রকথা', *কথাসরিৎসাগরের* 'দেবস্মিতার কাহিনি' ইত্যাদি গল্পগুলি আদর্শ বিচারব্যবস্থার প্রতিরূপ। তবে যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে নেয় সেখানে বিচারপ্রক্রিয়ায় চতুষ্পাদের আবশ্যিকতা থাকে না। দ্বিপাদেই বিচার সম্মপন্ন হয়। *কথাসরিৎসাগরের* 'খঙ্গদ্রংষ্ট্রার কাহিনি' এমনই একটি বিচারক্রিয়ার দৃষ্টান্তস্বরূপ। যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবহার অধ্যায়ের অসাধারণ ব্যবহারমাতৃকা প্রকরণে কয়েকটি বিবাদের উল্লেখ করেছেন যে গুলির ক্ষেত্রে রাজা কাল বিলম্ব করবেন না।[৪] বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনের ক্ষেত্রে এমন নির্দেশ *কথাসরিৎসাগরের*

---

[২] মানাদ্বা যদি বা লোভাৎ ক্রোধাদ্বা যদি বা ভয়াৎ।
যো ন্যায়মন্যথা ব্রুতে স যাতি নরকম্।। পঞ্চ.,১০৮

[৩] রাগাল্লোভাদ্ ভয়াদ্ বাপি স্মৃত্যপেতাদিকারিণঃ।
সভ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ দণ্ড্যা বিবাদাদ্ দ্বিগুণং দমম্।। যাজ্ঞ.২.৪

[৪] সাহসস্তেয়পারুষ্যগোঽভিশাপাত্যয়ে স্ত্রিয়াম্।

'নৃপতিবিক্রমসিংহের কাহিনি'তেও মেলে। সেখানেও সাহস-স্তেয়-পারষ্য- এর ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে দিয়ে কালবিলম্ব না করে উত্তর দেওয়াতে দেখা যায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থার চিত্র চোখে পড়লেও ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও কয়েকটি চোখে পড়ে। যেখানে রাজা বিচারের সঠিক পদ্ধতিটি অনুসরণ করেননি। যেমন *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* চতুর্বিংশতি আখ্যানটিতে শালিবাহন অভিযুক্ত হলে তাকে বক্তব্যপেশের সুযোগ না দিয়েই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। *দশকুমারচরিতে*র অর্থপালচরিতেও কামপালকে বিনা বিচারেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং মৃত্যুদণ্ড নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম সাধক হল প্রমাণ। প্রমাণ ব্যতিরেকে ন্যায়প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। স্মৃতিতে বিধিসম্মত বিচারপ্রক্রিয়ার যে রূপরেখাটি অঙ্কিত হয়েছে তার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে প্রমাণের আলোচনা দেখা যায়। আখ্যান-উপাখ্যানগুলির সরস কাহিনিগুলিতেও বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রমাণকে অন্যতম সহায়করূপে উল্লেখ করা হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রে*র 'ধর্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধি কথায়' সকল প্রকার প্রমাণের উল্লেখ দেখা যায়। শুধু তাই নয় বিচার পরিচালনায় কোন প্রমাণ কখন প্রয়োগ করা উচিত তার সবিশেষ নির্দেশও মেলে। সেখানে বলা হয়েছে বিবাদে সর্বপ্রথমে লেখ্যপ্রমাণ, তদভাবে সাক্ষী প্রমাণ, তদভাবে দিব্য প্রমাণ গ্রাহ্য করা হবে।[৫] তবে এখানে লেখ্য, সাক্ষী প্রমাণের কথা উল্লেখ করা হলেও এই দুই প্রমাণের অনুপস্থিতিতে ভুক্তি প্রমাণের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু আলোচ্য গল্পগ্রন্থটিরই অপর একটি গল্পে ভুক্তিপ্রমাণের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। *পঞ্চতন্ত্রে*র 'শশকপিঞ্জলকথা' আখ্যানটিতে ভুক্তিপ্রমাণের গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে এবং কখন কোন ভোগ প্রমাণ বলে বিবেচিত হবে, কখন হবে না তার বর্ণনা করা হয়েছে।[৬] *কথাসরিৎসাগরে*র 'শিব ও মাধবের কাহিনি'তে লেখ্যপত্র দ্বারা বিবাদের নিষ্পত্তি হতে

বিবাদয়েৎ সদ্য এব কালোঽন্যত্রেচ্ছয়া।। যাজ্ঞ.২.১২

[৫] বিবাদেঽন্বিষ্যতে পত্রং তদভাবেঽপি সাক্ষিণঃ।
সাক্ষ্যভাবাত্তত্তো দিব্যং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।। পঞ্চ.৪৩৬

[৬] প্রত্যক্ষং যস্য যদ্ ভুক্তং ক্ষেত্রাদ্যং দশ বৎসরান্।
তত্র ভুক্তিঃ প্রমাণং স্যান্ন সাক্ষী নাক্ষরাণি বা।।

দেখা যায়। *শুকসপ্ততিকথার* 'বিমলের আখ্যানে' সাক্ষীপ্রমাণের দ্বারা বিচার ক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে। এছাড়াও একাধিক আখ্যানগুলিতে লেখ্য, সাক্ষী ও ভুক্তি প্রমাণের প্রামাণিকতার ভিত্তিতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হতে দেখা যায়। *দশকুমারচরিতের* উপহারবর্মাচরিতে অগ্নিস্পর্শ করে সততার পরিচয় দিতে দেখা যায়। স্মৃতিতে একপ্রকার দিব্য প্রমাণরূপে অগ্নির উল্লেখ দেখা যায়। *হিতোপদেশের* মিত্রলাভে বলা হয়েছে কেউ অন্যায় করলে তার পাপের ফলস্বরূপ সে তিন বছর, তিন মাস, তিন পক্ষের মধ্যেই দৈবক্রমে শাস্তি পাবে।[৭] অন্যায় আচরণ করলে দিব্যপ্রমাণের প্রভাবে কিছুদিন পর অপরাধীর শাস্তি প্রাপ্তির এই উল্লেখ স্মৃতিতে কোশপান দিব্য প্রসঙ্গেও দেখা যায়। সেখানে বলা হয়েছে অপরাধী ব্যক্তি কোশপানের দুই বা তিন সপ্তাহের মধ্যে তার অথবা তার নিকটাত্মীয়ের মারাত্মক কিছু ঘটবে।[৮] *হিতোপদেশের* সুহৃদ্ভেদের অন্য একটি আখ্যানে বলা হয়েছে সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, জল, হৃদয়, যম, দিন-রাত্রি, সন্ধ্যা ও ধর্ম এগুলি মানুষের সকল কর্মকাণ্ডই জানে। গ্রন্থকারের এই উক্তি স্পষ্ট করে যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি মানুষের কৃতকর্মের প্রমাণস্বরূপ।[৯] এগুলি দিব্যশক্তি সম্পন্ন। *পঞ্চতন্ত্রের* 'ধর্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধিকথা'য় বৃক্ষদেবতাকে প্রমাণরূপে নির্বাচন করতে দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য স্মৃতিতে দিব্যপ্রমাণরূপে এগুলির মধ্যে কেবল অগ্নি ও জলকেই প্রমাণরূপে স্বীকার করা হয়েছে। উপরের এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় স্মৃতিতে যেমন বিবাদ নিরসনে মানুষ প্রমাণরূপে লেখ্য, সাক্ষী, ভুক্তি ও বিভিন্ন দিব্যপ্রমাণের উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজজীবনের দলিলস্বরূপ আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতেও এই সকল প্রকার

মানুষাণাময়ং ন্যায়ো মুনিভিঃ পরিকীর্তিতঃ।
তিরশ্চাঞ্চ বিহঙ্গানাং যাবদেব সমাশ্রয়ঃ।। পঞ্চ.১৪,১৫

[৭] ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অভ্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে।। হিতো.৮৪

[৮] ইদং ময়া ন কৃতমিতি ব্যাহরন্ দেবতাভিমুখঃ।
যস্য পশ্যেদ্দ্বিসপ্তাহাত্ ত্রিসপ্তাহাদথাপি বা।।
রোগোঽগ্নির্জ্জ্বতিমরণং রাজাতঙ্কমথাপি বা।
তমশুদ্ধং বিজানীয়াত্তথা শুদ্ধং বিপর্যয়ে।। বি.ধ.সূ.,১৪.১-২

[৯] আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্মশ্চ জানাতি নস্য বৃত্তম্।। হিতো.১১০

প্রমাণের দৃষ্টান্ত মেলে। তবে, প্রমাণের উল্লেখ থাকলেও প্রমাণের প্রয়োগে আখ্যানে কোথাও কোথাও স্মৃতির ব্যতিক্রম দৃশ্য চোখে পড়ে। মনু ব্যবহারদর্শনে স্ত্রীলোকের সাক্ষী নিষেধ করেছেন। কাত্যায়ন আবার কেবল স্ত্রী-দের বিবাদে স্ত্রী-দের সাক্ষী হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু *শুকসপ্ততিকথার* তৃতীয় কথায় পুরুষের বিবাদে স্ত্রীজাতির সাক্ষ্য গৃহীত হয়েছে এবং এই সাক্ষ্য প্রমাণের উপরে ভিত্তি করেই বিবাদের নিরসন ঘটেছে।

যেসকল আখ্যানগুলিতে সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা বিবাদ নির্ণয় করা হয়েছে, সেখানে কোথাও একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে আবার কোথাও একাধিক জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে রায়দান করা হয়েছে। যেমন *কথাসরিৎসাগরের* 'সুন্দরকের কাহিনি'তে রাজা একাধিক জনের সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে বিচার নিরসন করেছেন। এই গ্রন্থেরই কদলীগর্ভার কাহিনীতে একজন নাপিতের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। *বেতালপঞ্চবিংশতির* তৃতীয় আখ্যানে একজন চোরের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিবাদ নির্ণয় হতে দেখা যায়। *কথাসরিৎসাগরের* উপকোশার বৃত্তান্তটিতে উপকোশা দিন জনকে রাজার সামনে সাক্ষীরূপে পেশ করেছে- এমনটা দেখা যায়। যদিও চোর, নাপিত এরা সাক্ষ্যদানে উপযুক্ত নয় তবুও বিচারের স্বার্থে এদের সাক্ষীরূপে নির্বাচন করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, আখ্যানে সত্য প্রতিষ্ঠার তাগিদ বা চেষ্টা ছিল সর্বাগ্রগণ্য। সাক্ষী প্রমাণের মাপকাঠিতে সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ অধিকারী হলে সকল বিবাদের নিরসন সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ, দাস-দাসী, চোর-নাপিত এদের বিচরণ স্থল সর্বত্র, এমনকি অন্তঃপুরেও। তাই এদের অগোচর কিছুই থাকে না। আপন জীবিকার জন্য এরা যখন-তখন নানা স্থলে গমন করে তাই অত্যন্ত গোপনে কৃত অপরাধ বা দুষ্কর্মেরও এরা সাক্ষী হয়ে থাকে। অন্ত্যজ শ্রেণীর এই সকল ব্যক্তিদের প্রমাণের আওতাভুক্ত না করলে অনেক বিবাদেরই নিরসন সম্ভব নয়। তাই লোকব্যবহারের প্রয়োজনেই সম্ভবতঃ আখ্যানের রচয়িতাগণ প্রমাণরূপে এদের গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করেছেন। আখ্যানের এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানের সাদৃশ্যতা চোখে পড়ে।

তিনি পরস্ত্রী সংগ্রহণ, চৌর্য, বাক্পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য ও সাহসের ক্ষেত্রে গুণ, জাতি, সাক্ষীর সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনা না করে সকলকেই সাক্ষীরূপে নির্বাচন করতে বলেছেন।[১০]

কথার ছলে যে সকল অপরাধের দৃষ্টান্ত গুলি পাওয়া যায়, সেই সকল অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য বিহিত শাস্তিগুলিকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পর্যালোচনা করলে আখ্যানে দণ্ডব্যবস্থা তথা বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে কতগুলি ধারণা জন্মায়। অর্থাৎ বিচারব্যবস্থাটি কখনো কঠোর কখনো উদার-নমনীয়। সেখানে নানাবিধ অভিনব শাস্তি পদ্ধতি দেখা যায়। কোথাও দোষীকে নিয়তির দণ্ডবিধির উপরে ছেড়ে দিতে দেখা যায়। কোথাও অন্যায় অন্যায্য আচরণকে পাপ বলে সম্বোধিত করা হয়েছে। ইহজগতে কিংবা মৃত্যুপরবর্তীতে পাপের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী এরূপ দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

শুধুমাত্র দণ্ডব্যবস্থা নয়, বিচার প্রক্রিয়ার অভিনবত্বও কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়। বিচার শুধুমাত্র বিচারসভার চার দেওয়ালের মধ্যেই সর্বদা সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিচারালয়ের কক্ষের বাইরেও বিবাদের নিষ্পত্তি হতে দেখা যায়। *কথাসরিৎসাগরের* 'দেবস্মিতার কাহিনি'তে দেবস্মিতা রাজার কাছে আবেদন জানিয়েছে- তার বিবাদটি যেনো পুরজন সমক্ষে বিচার করা হয়। রাজাও তার আর্জি মেনে সকল পুরবাসীগণকে একত্রিত করে, সভাসদদের নিয়ে জনসমক্ষে বিচার করেছেন। *শুকসপ্ততিকথার* পঞ্চদশকথায় একজন নারী অসতী বলে অভিযুক্ত হওয়ায় সকলকে একত্রিত করে সকলের সামনে আপন সতীত্বের প্রমাণ দিয়েছে।[১১] *কথাসরিৎসাগরের* 'শবরাধিপতির কাহিনি'তে শবরজাতির সকলে নিজেদের বিচারসভায় শবরপত্নীর বিচার করেছে। *শুকসপ্ততিকথার* চতুর্থ কথায় গ্রামাধীপকে বিচার করতে দেখা যায়। এই গ্রন্থের ষট্-ত্রিংশত্তমকথায় গ্রামসভার উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে গ্রামণী বিচারসভায় গ্রাম সাংসদদের নিয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। অর্থাৎ বিচার সর্বদা রাজা করতেন এমনটা নয়। অরণ্যবাসীরা, গ্রামবাসীরা নিজ নিজ

---

[১০] সর্বঃ সাক্ষী সংগ্রহণে চৌর্যপারুষ্যে সাহসে। যাজ্ঞ.২.৭২

[১১] রমাকান্ত ত্রিপাঠী,শুক.,পৃ.৯০

বিবাদের নির্ণয় করতে পারতেন। তারা নিজেদের রীতি ও ঐতিহ্য মেনে বিবাদের নির্ণয় নিজ নিজ বর্গের পঞ্চায়েতে করাতে পারতেন।

ধর্মশাস্ত্রকার গৌতমও বলেছেন যে, কৃষক-ব্যাপারী-মহাজন-পশুপালক-শিল্পী প্রভৃতি ব্যক্তিরা নিজ নিজ বর্গে বিবাদের সম্বন্ধে অধিকারী হবেন।[১২] যাজ্ঞবল্ক্যও আঞ্চলিক এই সকল বিচারসভার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি ব্যবহার নিরীক্ষণের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে চারটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল রাজার দ্বারা অধিকৃত বিচারসভা, দ্বিতীয়টি পূগ, তৃতীয়টি শ্রেণী ও চতুর্থটি হল কুল।[১৩] রাজা পরিচালিত বিচারসভার স্থান সর্বোচ্চ হলেও আঞ্চলিক এই সকল বিচারসভার উপস্থিতি ও তার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল এই কথা সহজেই বোঝা যায়।

বিচারব্যবস্থার কঠোর দিকটিও কোনো কোনো আখ্যানে দৃষ্ট হয়। যেখানে অপরাধীকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং শাস্তির ভয়াবহতাকে সকলের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ স্থাপন করা হয়েছে। *শুকসপ্ততিকথা*র পঞ্চম আখ্যানটিতে এক চোর শস্য চুরি করতে গিয়ে রক্ষীপুরুষের হাতে ধৃত হয়েছে। দণ্ডস্বরূপ তাকে গলায় শস্য ঝুলিয়ে নগরের সর্বত্র পরিভ্রমণ করা হয়েছে। *দশকুমারচরিতে*র অপহারবর্মা চরিতে সম্ভ্রান্ত বণিক অপরাধী বলে বিবেচিত হলে রাজা তাকে পুরজন সমক্ষে শাস্তির আদেশ দিয়েছেন। আবার রাজবাহনচরিতে সকলের সামনে রাজদ্বারে হস্তিপদপিষ্ঠ করে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অর্থপালচরিতে সকলের সমানে দোষী ব্যক্তির অপরাধটি তিন বার ঘোষণা করে চক্ষু উৎপাটন করে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে। সকলের সম্মুখে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্য হল একটি সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি করা। যাতে নগরের অন্যান্য ব্যক্তিরা শাস্তির ভয়াবহতা বা নৃশংসতা দেখে এমন আচরণ থেকে বিরত হয়। আবার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সকলের সামনে দণ্ড দেওয়ার দ্বারা নগরবাসীকে এমন বার্তা দেওয়া যে, কেউ-ই দণ্ডের ঊর্দ্ধে নয়। *কথাসরিৎসাগরে*র 'রূপনিকার কাহিনি'তে রূপনিকার মাতা দুষ্টা, পাপিয়সী

---

[১২] কর্ষকবণিক্পশুপালককুসীদককারবঃ স্বে স্বে বর্গে। গৌ.ধ.সূ.২.২.২১

[১৩] নৃপেণাধিকৃতা পূগাঃ শ্রেণয়োঽথ কুলানি চ।
পূর্বং পূর্বং গুরুর্জ্ঞেয়ং ব্যবহারবিধৌ নৃণাম্।। যাজ্ঞ.২.৩০

হওয়ায় তাকে মস্তক মুণ্ডন করে, কালি-সিঁদুর লিপ্ত করে, বিকৃত বেশভূষায় সজ্জিত করে সকল জনসাধারণের সামনে অপদস্থ করা হয়েছে। অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড কেবল শারীরিক কিংবা আর্থিক হত এমন নয়, তার সামাজিক অবস্থানের অবনতি ঘটিয়ে সমাজ থেকে বহিষ্কার ইত্যাদি দণ্ডেরও প্রচলন দেখা যায়। *বেতালপঞ্চবিংশতি*র দশম উপাখ্যানের শির মুণ্ডন করিয়ে, গর্দভে চড়িয়ে দেশ থেকে বহিষ্কারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বিচারব্যবস্থাটি কেবল কঠোর ছিল এমন নয়, বিভিন্ন গল্পে বিচারব্যবস্থার নমনীয়তারও চিত্র পাওয়া যায়। যেখানে রাজা প্রথম অপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ দিয়েছেন। গুণী ব্যক্তিকে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার পথ খুলে দিয়েছেন। দণ্ডিত ব্যক্তিরও শেষ আর্জি শুনেছেন। *দশকুমারচরিতে*র অর্থপালচরিতে পূর্ণভদ্র মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তার বীরত্ব দেখে তাকে সম্মানজনক জীবন কাটানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত অকাজ-কুকাজ বাদ দিয়ে সৎ পথে উপার্জন করে জীবন অতিবাহিত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।[১৪] আবার *কথাসরিৎসাগরে*র 'বণিকপুত্রের কাহিনি'তে বণিকপুত্রকে তার বয়স অল্প হওয়ায় তার প্রথম অন্যায় হওয়ায় রাজা রাজসভায় ডেকে কেবল সাবধান করে দিয়েছেন। বণিকপুত্র ধর্মের পথে চালিত না হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে – রাজার এমন সাবধানবাণী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে-ও অন্যায় পথ হতে ধর্মপথে চালিত হয়েছে।[১৫]

*বেতালপঞ্চবিংশতি*র তৃতীয় আখ্যানে এক ব্যক্তি নিরপরাধী হওয়া সত্ত্বেও রাজার ভুল সিদ্ধান্তের কারণে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছিল। তাই রাজা পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাকে মুক্ত করেছেন। আপন ভুলের জন্য তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছেন এবং তাকে বহু পারিতোষিক দান করে তুষ্ট করেছেন। নিজের ভুলের কারণে অপরাধীকে তার হেনস্থার জন্য রাজা ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। রাজার এমন আচরণ উদারতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ।

*কথাসরিৎসাগরে*র 'খঙ্গদ্রংষ্ট্রার কাহিনি'তে খঙ্গদ্রংষ্ট্রা আপন অপরাধ স্বীকার করে নেওয়ায় অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও তাকে মুক্ত করা হয়েছে। অপরাধী ভুলবশতঃ অপরাধ করায় এবং

---

[১৪] তারাচরণ ভট্টাচার্য,দশ.পৃ.৭৬

[১৫] জগদীশলাল শাস্ত্রী,কথা.,পৃ.১৯২-১৯৪

আপন অপরাধ স্বীকার করে নেওয়ায় তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। যে পূর্বে ভালো কাজ করেছে এমন ব্যক্তি যদি পরে কোনো অন্যায় কার্যে লিপ্ত হয় তবে তার ভালো কর্মের জন্য তার দণ্ড প্রাপ্তি থেকে মুক্তি ঘটে। *দশকুমারচরিতে*র দ্বিজোপ্রকৃতি চরিতে মাতঙ্গ তার জীবদ্দশায় অনেক খারাপ কাজ করা সত্ত্বেও একজন ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করেছিল। তার এই সৎকর্মের জন্য মৃত্যুপরবর্তীতে যমরাজের সভায় তাকে নরকের শাস্তির দৃশ্যগুলি দেখিয়ে পুনর্জন্মের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, নরক যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হয়নি। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* চতুর্থ উপাখ্যানে দেবদত্ত অপরাধী জেনেও তার পূর্বকৃত ভালো কাজের জন্য রাজা তাকে কোনো দণ্ড দেননি। তাকে পুনরায় সাধারণ জীবন যাপনে অধিকার দিয়েছেন।

দণ্ডনীতির উদ্দেশ্য কেবল শাস্তির সংকীর্ণ বেড়াজালে আবদ্ধ নয়। বস্তুতঃ এর উদ্দেশ্য হল মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন। আখ্যানগুলিতে সেই কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টাই দৃষ্ট হয়। মানসিক বিকারগ্রস্থ, মত্ত, উন্মত্ত, রোগগ্রস্থ ব্যক্তিরা অপরাধী হলেও তাদের শাস্তি বিহিত হয়নি। *শুকসপ্ততিকথায়* এই সকল ব্যক্তিদের প্রতি সর্বদা ক্ষমাশীল হতে বলা হয়েছে।[১৬] আখ্যানগুলির বিচারব্যবস্থার উদারতা ও নমনীয়তার পাশাপাশি কোনো কোনো আখ্যানে বিচারব্যবস্থার সংকীর্ণতার দিকটিও ফুটে উঠেছে। যেখানে দণ্ডব্যবস্থাকে বর্ণব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখা যায়। অর্থ দ্বারা বিচারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। নিয়মবহির্ভূতভাবে বিচার করা হয়েছে।

শুকসপ্ততিকথার সপ্তপঞ্চাশত্তমকথায় ব্রাহ্মণের উচ্চবর্ণের হওয়ার কারণে অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও তাকে দণ্ড প্রদান করা হয়নি। *বেতালপঞ্চবিংশতি*র প্রথম উপাখ্যানে ব্রাহ্মণ অপরাধ করলেও বধার্হ নয় এমনটা বলা হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রে*র মিত্রলাভের চতুর্থ গল্পটিতে বলা হয়েছে, হত্যার ন্যায় গুরুতর অপরাধে অপরাধী হলেও ব্রাহ্মণ অবধ্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য স্মৃতিগ্রন্থগুলিতেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্যতার এই চিত্র দেখা যায়। হত্যার অপরাধে আখ্যানে ও স্মৃতিতে বধদণ্ডের

---

[১৬] মুর্খাণাং মদ্যপানাং চ নারীণাং রোগিণামপি।
মত্তপ্রমত্তভীরুণাং ক্ষুধার্থানাং বিশেষতঃ।
সুকৃতং স্খলিতং চার্যা ন গৃহ্নন্তি ক্ষমান্বিতা।। শুক.,৩৩৪

বিধান দেওয়া হলেও ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে তা নিষেধ করা হয়েছে। ধর্মসূত্রকার বিষ্ণু পুরুষ, স্ত্রী যে কেউ-ই কাউকে হত্যা করলে বধদণ্ড পাবে এমনটা বললেও ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে বধদণ্ডের নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল বর্ণের বধকারীর বধদণ্ড প্রাপ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণকে দৈহিক দণ্ড দেওয়া যাবে না। তার ললাটে পাপকর্ম অঙ্কিত করে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।[১৭] এই একই কথা মনুও বলেছেন। তিনি ব্রাহ্মণ হত্যাকারী হলে তাকে প্রাণদণ্ড না দিয়ে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে বলেছেন (মনু.৯.২৪১)। *নারদস্মৃতি*তেও ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে এই একই বিধান চোখে পড়ে (নারদ.,১৬.১০)।

বিচারপ্রক্রিয়াটি সৎপথে সঠিকভাবে পরিচালিত হলে তবেই আর্ত ব্যক্তি ন্যায় প্রাপ্ত হয়। বিচারক কিংবা বিচারকার্যে সংযুক্ত ব্যক্তিগণের সর্বদা এই প্রচেষ্টাই করা উচিত যাতে অন্যায়ের শাস্তি হয়। অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের দ্বারা কেবল পীড়িত ব্যক্তি ন্যায় প্রাপ্ত হয়, সমাজে সুস্থিতি বজায় থাকে। কারণ রাজা যদি দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিদের প্রতি অনলসভাবে দণ্ডবিধান না করেন তাহলে শূলে বিদ্ধ করে যেমন মাছ পাক করা হয়, সেইভাবে বলশালী লোকেরা দুর্বল লোকেদের উৎপীড়িত করে।[১৮] রাজা সঠিকভাবে দণ্ডবিধান না করলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মনু সপ্তম অধ্যায়ে দণ্ড প্রণয়নে সঠিকভাবে না করা হলে যে বিরূপ প্রভাব পড়ে সে বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। বিচারব্যবস্থা যদি সঠিকভাবে চালিত না হয় তবে সামাজিক অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। তবে আখ্যানগুলিতে এমন কতগুলি দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেখানে বিচারক্রিয়াটি অর্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে কিংবা মিথ্যাপ্রমাণ পেশ করে বিচারকে কলুষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। *কথাসরিৎসাগরের* 'হরিশর্মাদ্বিজের কাহিনি'তে রাজা রাজপ্রাসাদে চুরি হলে চোরকে ধরার জন্য একজন ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছেন। যিনি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে সমাজে নিজের পরিচয় দিলেও বাস্তবে একজন ভণ্ড ছিল, কোনো অলৌকিক ক্ষমতা তার ছিল না। সে ভণ্ডামি করে চোরকে অন্বেষণ করেছে। আবার 'সুন্দরকে কাহিনি'তে সুন্দরকের গুরুপত্নী তার

---

[১৭] ন শারীরো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ। স্বদেশাদ্ ব্রাহ্মণং কৃতাঙ্কং বিবাসয়েৎ। বিষ্ণু.ধ.সূ.,৫.২-৩

[১৮] যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেষ্বতন্দ্রিতঃ।

শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন্ দুর্বলান্ বলবত্তরাঃ।। মনু.,৭.২০

সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ করলে, কোনো প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও একজন স্ত্রী অভিযোগ করেছে তাই তার কথা সত্য মেনে নিয়ে সুন্দরককে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছে। 'জীমূতবাহনের আখ্যানে' দস্যু, হত্যাকারী শবরাধীপতিকে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে জীমূতবাহন প্রাণদণ্ড থেকে রক্ষা করেছে- এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায়। *দশকুমারচরিতে*র সোমদত্তচরিতে এক সংকীর্ণ বিচারব্যবস্থার চিত্র দেখা যায়। যেখানে বিনা অপরাধে একজন শাস্তি ভোগ করেছে। বিচারসভায়ই কেবল ন্যায় ভূ-লুণ্ঠিত হত এমন নয়, বিচারসভার বাইরেও সত্যকে ফাঁকি দেওয়ার প্রচেষ্টা কয়েকটি আখ্যানে মেলে। যেমন *কথাসরিৎসাগরে*র 'প্রাণধর ও তার ভাইয়ের কাহিনি'তে দুই ভাই রাজকোষে চুরি করে, দেশের বাইরে পলায়ন করেছে। দেশে থাকলে রাজা তাদের প্রাণদণ্ড দেবেন। কিন্তু বিদেশে চলে গেলে তা পারবেন না- তাই তারা বিদেশে গমন করেছে। তাদের দোষী বলে চিহ্নিত করতে সক্ষম হলেও রাজা তাদের দণ্ড দিতে অসমর্থ হয়েছেন। আবার *কথাসরিৎসাগরে*র 'বণিকদ্বয়ের কাহিনি'তে দেখা যায় রাজার কাছে অভিযোগ করতে উদ্যত বণিকদের দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করে বিচারালয়ের বাইরেই সমঝোতা করা হয়েছে। বণিকরাও অর্থের বিনিময়ে চৌর্যবৃত্তিধারী বেশ্যাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেনি। বস্তুতঃ দণ্ড প্রণীত না হওয়ায় অপরাধী নিষ্কৃতি পেয়েছে। যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ শাস্তি না পেলে অপরাধীর অপরাধের প্রবণতা বন্ধ হয় না বরং বৃদ্ধি পায়। যা সমাজের অবক্ষয় ডেকে আনে। তাই সামাজিক স্থিরতার কারণে সঠিক বিচারব্যবস্থা সঠিক দণ্ডব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য আখ্যানে বিচারব্যবস্থার সংকীর্ণতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত থাকলেও আদর্শ ও সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থার চিত্রটি বৃহৎ।

আখ্যানসাহিত্যে সর্বত্রই যে বার্তাটি দেওয়া হয়েছে তা হল- অপরাধ করলে তার শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে। সকল অপরাধের বিচারসভায় নিষ্পন্ন হয়েছে এমনটা না হলেও, যে সকল আখ্যানে অপরাধের দৃষ্টান্ত আছে সেখানে অপরাধের নিন্দা করা হয়েছে। অন্যায় আচরণকে পাপ বলে সম্বোধিত করা হয়েছে। পাপের ফলস্বরূপ ইহলোকে কিংবা পরলোকে অপরাধীকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় কিংবা পরজন্মে যন্ত্রণাভোগের দ্বারা তার পাপ হতে মুক্তি ঘটে। অর্থাৎ আখ্যানগ্রন্থগুলির বিচার অপরাধীর নিস্তার নেই। কেউ কোনো অন্যায় করলে তার শাস্তি নিশ্চিত। কোথাও অপরাধী বিচারালয়ে বিচারকের দ্বারা দণ্ডিত হয়েছে কোথাও বিধির অমোঘ বিধানের দ্বারা

ন্যায়দণ্ড নেমে এসেছে। *কথাসরিৎসাগরে* বলা হয়েছে, মনুষ্যদের তাদের কুকর্মের শাস্তি অবশ্যই পেতে হয়- এজন্মে কিংবা পরজন্মে। এছাড়াও কয়েকটি আখ্যানে এমন দৃশ্য পরিবেশিত হয়েছে যেখানে অপরাধীকে পূর্বজন্মের ফল ভোগ করতে দেখা যায়। *কথাসরিৎসাগরের* 'বিদ্যুৎপ্রভা বিদ্যাধরীর কাহিনি'তে এবং 'রাক্ষসবৃত্তান্ত'তে বিদ্যাধরী ও রাক্ষস উভয়েই পূর্বজন্মের কৃতকর্মের শাস্তি পরজন্মে ভোগ করেছে। অপরাধী বিচারালয়ে উপস্থিত না হলে বিচারকের পক্ষে দণ্ড দেওয়া সম্ভব নয়। সব ক্ষেত্রে অপরাধী অভিযুক্ত হয়ে ন্যায়ালয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং দণ্ডিত হয়েছে এমনটা নয় – তবে কি অপরাধী তার কৃতকর্মের থেকে নিস্তার লাভ করবে এমন ধারণা হতেই পারে। কিন্তু আখ্যানে এমন ধারণাকে সহজেই নস্যাৎ করা হয়েছে। সেখানে উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে নিয়তির অমোঘ নিয়ম- কাউকে আঘাত করলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। রোগ, শোক, পরিতাপে মানুষকে প্রায়শই জর্জিরিত হতে দেখা যায়।

গল্পসাহিত্যানুযায়ী মানুষ এই সকল কষ্টে পীড়িত হয় তার কর্মদোষে। বিধির বিধানে দণ্ডিত হয়ে তারা জীবদ্দশাতেই অপরাধের ফোলভোগ করে। *হিতোপদেশের* মিত্রলাভে গ্রন্থকার একটি শ্লোকের মাধ্যমে কর্মফলের স্বরূপটি তুলে ধরেছেন। সেখানে অপরাধকে একটি বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তিনি রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন, বিপদ-এগুলিকে মানুষের নিজের করা অপরাধবৃক্ষের ফল বলে সম্বোধিত করেছেন।[১৯]

সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যে অপরাধের চিত্র যেমন আছে তেমন অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের প্রয়াসও চোখে পড়ে। বিচারব্যবস্থার নির্দিষ্ট পথে আর্ত বা পীড়িতকে ন্যায় পাইয়ে দেওয়ার একাধিক দৃষ্টান্ত গল্পগুলিতে বিদ্যমান। বিচারসভায় সভ্যগণের সাথে আসীন বিচারক দ্বারা ন্যায় প্রতিষ্টা করা হয়েছে। অপরাধ তথা অপরাধীর নিন্দা, শাস্তি, ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সবের উর্দ্ধে আখ্যানে যে বাণীটি উচ্চারিত হয়েছে তা হল শান্তির বাণী। বিভিন্ন আখ্যানে জীবহিংসা নিষেধ করা হয়েছে। প্রাণের বিনিময়ে হলেও বিবাদ রুখে দেওয়ার আর্তি

---

[১৯] রোগশোকপরিতাপবন্ধনব্যবসনানি চ।

আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্।। হিতো.,৪১

জানানো হয়েছে। কখনো কোনো কারণে বিবাদে লিপ্তি হতে নিষেধ করা হয়েছে। *হিতোপদেশে* বিগ্রহ বিভাগটিতে একটি শ্লোকের মাধ্যমে বলা হয়েছে প্রয়োজনে শত-অর্থ ব্যায় করবে বিবাদ কখনো নয়। অকারণে বিবাদ মূর্খের লক্ষণ।[২০] *কথাসরিৎসাগরে* ব্যক্তিকে সর্বদা ক্রোধ শূন্য হতে বলা হয়েছে। কারণ অতিমাত্রায় ক্রোধ হিংসা ও অপরাধের দিকে চালিত করে। ধ্বংস ডেকে আনে। ক্রোধের জন্যই অপরাধ হয়।[২১] সমাজে মানুষ একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত না হলে কেউ কারো দ্বারা পীড়িত হবে না, কেউ দণ্ডনীয় হবে না। সর্বত্র শান্তির বাতাবরণ বিরাজ করবে। অপরাধমুক্ত ও হিংসামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার স্বার্থে আখ্যানের এই বার্তা আমাদের সকলের অবশ্য পালনীয়।

---

[২০] শতং দদ্যান্ন বিবদেদিতি বিজ্ঞস্য সংয়তম্।
বিনা হেতুমপি দ্বন্দ্বমেতন্মূর্খস্য লক্ষণম্।। তদেব,৩১

[২১] হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস,কথা.,পৃ.২৬৩,১৬৩ (২য় খণ্ড)

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

Aiyangar, Kumbakonam Viraraghava Rangaswami. *Vṛhaspatismṛti* (Reconstructed). Baroda: Baroda Oriental Institute, 1941. Print.

Altekar, A. S. *State and Government in Ancient India*. Delhi: Motilal Banarsi Dass Publishers, 2009 . Rpt.

Apte,Vaman Shivram. *The Student's Sanskrit English Dictionary : Containing Appendices on Sanskrit Prosody and Important Literary and Geographical Names in the Ancient History of India*. Delhi: MLBD, 2015(13th ed.rpt.). Print.

Bandyopadhyaya, Ashok Kumar, (Ed.) *Ūnaviṃśati Saṃhitā*. Comp. and Trans. Panchanan Tarkaratna. Kolkata: SPB,1407 BS. Print.

Bandyopadhyaya, Haricharan. *Baṅgīya Śabdakoṣ(a)*, Vol. I and II. New Delhi: Sahitya Academy, 2016.Print.

Bandyopadhyay, Manabendu. *Manusaṃhitā.* Kolkata: SPB, 1416 BY (2nd Ed.). Print.

Basu, Ratna. *Methodology and Sanskrit Research*. Calcutta: Rabindra Bharati University, 1998. Print.

Basu, Sumita. *Dharma-Artha-Nītiśāstrasamīkṣā: A Critical Survey of Dharmaśāstra and Nītiśāstra*. Kolkata: Sadesh, 2006. Print.

-.-.-. *Yājñavalkyasaṃhitā: Vyavahārādhyāya:A book of Ancient Indian law*. Kolkata: SPB, 1407 BS. Print.

Bhattacharjee, S.N. *Administration of law and Justice in India*. Burdwan: The University of Burdwan, 1982. Print.

Bhattacharyya, Haridas Sidhantavagis. (Ed.) Beng. Trans. With com. *Mahābhārataṃ*. Calcutta: Viswavani Prakasani, 1400 BS.Print.

Bhattacharyya, Bhabotosh. *Studies in Dharmaśāstra*. Calcutta: Indian Studies, 1964. Print.

Biswas, Sailendra, Comp. *Samsad Bengali English Dictionary*. Kolkata: Sahitya Samsad, 2000. Print.

Tripathi, Ramakanta. (Ed. with com.) *Śukasaptati*. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Series Office, 2002. Print.

Das, Keshab Chandra. *Methodology in Sanskrit*. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 1992. Print.

Jibananda, Ed. *Dharmaśāstra Saṃgraha: Atri, Viṣṇu, Yājñavalkya, Uśanā, Aṅgirā, Kātyāyana, Bṛhaspati, Parāśara, Vyāsa, Śaṅkha Likhita, Dakṣa, Gautama, Śātātapa, Vasiṣṭha. Calcutta:* Sanskrit College, 1876.PDF.

Kane, Pandurang Vaman. *History of Dharmaśāstra: Ancient and Mediaeval Religious and Civill law, Vol. I & III. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute*, 1930. PDF.

.-.-.-.*Kātyāyanasmṛti on Vyavahāra.* Text. (Reconstructed), Trans. Bombay: Sanskrit Sahitya Parisad, 1933. Print.

Kale, M.R. (Ed. with com.) *Hitopadeśa of Nārāyaṇaśarmā*. Delhi/Varanasi/Patna: Motilal Banarasidas Publishers (Pvt. Ltd.). 2014. Rpt.

-.-.-.- *Pañcatantra of* Viṣṇuśarmā. Delhi/Varanasi/Patna: MLBD Publishers (Pvt. Ltd.), 2008.Rpt.

Kangle, R.P. (Ed. &. Eng.trns). *The Kautilīya-Arthaśāstra* (Vol. I-III). Delhi: MLBD Publishers (Pvt. Ltd.),2006. Rpt.

Keith, A. B. *A History of Sanskrit Literature*. Great Britain: Oxford University Press, 1928. Print.

Jha, Ganganath. *Manusmṛti,* (Ed. & Trans) Vol.VI. with the 'Manubhāṣya' of Medhātithi. English Translation, Part-IV, Discourse-VIII. Delhi: MLBD, 1999 (2nd ed.), (1st ed. 1920-39). Print.

Jha, Damodar. *Vetālapañchaviṃśati of* Śibadāsa. Ed. With com. Varanasi: Chowkhamba Vidyabhawan, 1968. Print.

Jolly, Julius. Ed. *Mānava Dharma-Śāstra: The Code of Manu*. Original Sanskrit Text critically edited according to the standard Sanskrit commentaries, with critical notes. London: Trubner and Co.,1887.PDF.

Joshi, K.L.(Ed). *Viṣṇusmṛtiḥ*. Trans. Manmatha Nath Dutt (Shastri). Delhi: Parimal Publications, 2012. Print.

-.-.-.- *Yājñavalkyasaṃhitā.* Trans. Manmatha Nath Dutt (Shastri). *Yājñavalkyasmṛti.* With original Sanskrit Text, Literal Prose English Translation. Delhi: Parimal Publications, 2005. Print.

Mandlik, V.N.(Ed). *Mānava Dharma-Śāstra: Institute of Manu,* with the commentaries of Medhātithi, Sarvajñanārāyaṇa, Kullūka, Rāghavānanda, Nandana and Rāmchandra. New Delhi: MMPPL, 1992. Print.

Malabiya, Sudhakar (Ed.) *Pañcatantra of* Viṣṇuśarmā. Varanasi: Chowkhamba Krishnadas Academy.2015.

Olivelle, Patrick. *Dharmasūtras: The Law Codes of Āpastamba, Gautama, Baudhāyana.* Delhi: MLBD, (Pvt.Ltd.), 2000. Print.

__. *Pañcatantra the book of India's Folk wisdom.* Newyork: Oxford university press, 1997. Print.

__. *A Sanskrit Dictionary of Law and Statecraft.* Delhi: Primus Books, 2015. Print.

Pancānan Tarkaratna. (Ed.) *Biṣṇ̣purāṇ̣am*. Kolkata: Navabharat Publishers, 1417 BS.

-.-.-.-. *Matsyapurāṇ̣am*. Kolkata : Navabharat Publishers,1988.

-.-.-. *Rāmāyaṇ̣aṃ*. Kolkata: Benimadhab Sil Library, 2012. Rpt.

-.-.-.*Padmapurāna.* Sr̥ṣṭikāṇ̣da. Calcutta: 1919.Print.

Pandeya, U. (Ed. with com.) *The Gautamadharmasūtraṃ*. Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Sansthan, 2005 (4th Ed.).

Peterson, P. (Ed.) *Hitopadeśa*. Delhi: Bharatiya Book Corporation, 1986.Rpt.

Ray, Kumud Ranjan(Ed). *Yājñavalkyasaṃhitā: Vyavahārādhyāya.* Calcutta: SPB, 1964. Print.

Sastri, Jagadishs Lal. *Kathāsaritsāgara of* Somdeva Bhaṭṭa. Ed. Varanasi: Poona: Patna: MLBD Publishers, 2008.Rpt.

Sternbach, L. *Juridical Studies in Ancient Indian Law* (Vol. II). Delhi: Varanasi: Patna: MLBD Publushers (Pvt. Ltd.), 1987.Print.

Swain, Braja Kishore. *Dharmasūtra: A link between Tradition and Modernity*. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Bhawam, 2003.Print.

-.- .-. Ed. & Trans. *Nāradasmriti.* Varanais: Chaukhamba Sanskrit Bhawan, 2006. Print.

Telang, N.Kanta Nath Sastry and Braj Bihari Chaubey. *The New Vedic Selection*. Varanasi: Prachya Bharati Prakashan, 1965. Print.

Vaidya.P.L.(ed). *Jātakamālā*. Darbhanga:The Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning,1959.Print.

Winternitz, M.A. *A History of Indian Literature* (Vol. I, Part I & Part II). Eng. Trans. S. Ketkar. Calcutta: University of Calcutta, 1962 & 1963. Print.

William, Monier. *A Sanskrit – English Dictionary*. Delhi: MLBD Publishers (Pvt.Ltd.), 1993.Rpt.

বাংলা গ্রন্থ

কুণ্ডু, পুরীপ্রিয়া. *চৌর্যসমীক্ষা.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২১ (বঙ্গাব্দ).

গোপ, যুধিষ্ঠির. *বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২ (পুন.মু.).

ঘোষ, ঈশানচন্দ্র. *জাতককথা.* কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৫ (বঙ্গাব্দ), পুন.মু.

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ. *(*সম্পা. ও অনু.*)হিতোপদেশ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১২ (৩য় সং.). মুদ্রিত.

চাকী, জ্যোতিভূষণ. *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার* (৭ম. খণ্ড). কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২.

ধর্মপাল, রোহিণী. *অপরাধ ও অপরাধীর পুরোনতুন কাহিনী.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০২০.

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ. *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৩ (পুন.মু.).

বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি. *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৩ (৩য়.সং.).

---. *বৈদিক পাঠসংকলন.* কলকাতা: সদেশ, ১৪১৮ (৪র্থ.মু.).

বিশ্বাস, হীরেন্দ্রলাল (সম্পা. ও অনু.)*কথাসরিৎসাগর..* কলকাতা: একাডেমিক পাবলিসার্স, ১৯৫৭.

বিশ্বনাথ. *সাহিত্যদর্পণ* (১ম খণ্ড). সম্পা. যোগেশ্বর দত্তশর্মা পরাশর. দিল্লী: নাগ পাবলিসার্স, ১৯৯৯ (১ম.সং.).

----.---- (২য় খণ্ড). সম্পা. যোগেশ্বর দত্তশর্মা পরাশর. দিল্লী: নাগ পাবলিসার্স, ২০০০ (১ম.সং.).

ভট্টাচার্য, ভবানীপ্রসাদ এবং তারকনাথ অধিকারী. *বৈদিক সংকলন* (১ম ও ২য় খণ্ড). কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৯.

ভট্টাচার্য, ঝর্ণা. *পুরুষপরীক্ষা.* সম্পা. ও অনু.. কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৫.

মণ্ডল, দেবদাস. *গল্পে গল্পে রাজনীতির হাতেখড়ি.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৮.

সাহা, বিশ্বরূপ. *ধর্মার্থশাস্ত্র পরিচয়.* কলকাতা: সদেশ, ২০০৯.

সেন, মলয়েন্দ্রকুমার. *বত্রিশসিংহাসন.* কলকাতা: ক্যালকাটা পাবলিকেশনস্, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ.

******